

# আল মুল্ক

৬৭

## নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতাংশ **تَبْرَكَ الَّذِي بَيَّنَهُ الْمُلْكُ** এর আল মুল্ক শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

## নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি কোন সময় নাযিল হয়েছিলো তা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় না। তবে বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সূরাটি মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

## বিষয়বস্তু

এ সূরাটিতে একদিকে ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে যেসব লোক বেপরোয়া ও অমনোযোগী ছিল তাদেরকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে সজাগ করে দেয়া হয়েছে। মক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের বৈশিষ্ট হলো, তাতে ইসলামের গোটা শিক্ষা ও রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুয়া সাল্লামকে নবী করে পাঠানোর উদ্দেশ্য সরিস্তারে নয় বরং সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে তা ক্রমাবয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনায় বদ্ধমূল হয়েছে। সেই সাথে মানুষের বেপরোয়া মনোভাব ও অমনোযোগিতা দূর করা, তাকে ভেবে চিন্তে দেখতে বাধ্য করা এবং তার ঘৃন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রথম পাঁচটি আয়তে মানুষের এ অনুভূতিকে জাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, যে বিশ্বলোকে সে বাস করছে তা এক চমৎকার সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় সাম্রাজ্য। হাজারো তালাশ করেও সেখানে কোন রকম দোষ-ক্রটি, অসম্পূর্ণতা কিংবা বিশৃঙ্খলার সন্ধান পাওয়া যাবে না। এক সময় এ সাম্রাজ্যের কোন অস্তিত্ব ছিল না। যদ্বান আল্লাহই একে অস্তিত্ব দান করেছেন, এর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও শাসনকার্যের সমন্ত ইখতিয়ার নিরংকুশভাবে তৌরেই হাতে। তিনি অসীম কুদরতের অধিকারী। এর সাথে মানুষকে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, এ পরম জ্ঞানগত ও যুক্তিসংজ্ঞ ব্যবস্থার মধ্যে তাকে উদ্দেশ্যান্বিতভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এখানে তাকে পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছে। তার শুধু সংক্রম দ্বারাই সে এ পরীক্ষায় সফলতা লাভ করতে সক্ষম।

আবেরাতে কুফরীর যে তয়াবহ পরিগাম দেখা দেবে ৬ থেকে ১১ নং আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তার নবীদের পাঠিয়ে এ দুনিয়াতেই সে তয়াবহ পরিগাম সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন। এখন তোমরা যদি এ পৃথিবীতে নবীদের কথা মেনে নিয়ে নিজেদের আচরণ ও চাল-চলন সংশোধন না করো তাহলে আবেরাতে তোমরা নিজেরাই একথা শীকার করতে বাধ্য হবে যে, তোমাদের যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তোমরা তার উপযোগী।

১২ থেকে ১৪ নং আয়াতে এ পরম সত্যটি বুঝানো হয়েছে যে, স্টো তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারেন না। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য প্রত্যেকটি কাজ ও কথা এমন কি তোমাদের মনের ক্রন্তসমূহ পর্যন্ত অবগত। তাই নৈতিকতার সঠিক ভিত্তি হলো, মন্দ কাজের জন্য দুনিয়াতে পাকড়াও করার মত কোন শক্তি থাক বা না থাক এবং ঐ কাজ দ্বারা দুনিয়াতে কোন ক্ষতি হোক বা না হোক, মানুষ সবসময় অনুশ্য আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ভয়ে সব কক্ষ মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে। যারা এ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবে আবেরাতে তারাই বিরাট পুরুক্ষ ও ক্ষমালাভের যোগ্য বলে গণ্য হবে।

১৫ থেকে ২৩ নং আয়াতে পরপর কিছু অবহেলিত সত্যের প্রতি ইঁধিত দিয়ে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার আহবান জানানো হয়েছে। এগুলোকে মানুষ দুনিয়ার নিত্য নৈমিত্তিক সাধারণ ব্যাপার মনে করে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখে না। বলা হয়েছে, এ মাটির প্রতি লক্ষ্য করে দেখো। এর ওপর তোমরা নিচিস্তে আরামে চলাফেরা করছো এবং তা থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় রিয়িক সংগ্রহ করছো। আল্লাহ তাঁ'আলাই এ যমীনকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। তা না হলে যে কোন সময় এ যমীনের ওপর ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে তা তোমাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারে। কিংবা এমন বড়-বড় আসতে পারে যা তোমাদের সবকিছু লগতও করে দেবে। যাথার ওপরে উড়ন্ট পাখীগুলোর প্রতি লক্ষ করো। আল্লাহই তো ওগুলোকে শুন্যে ধরে রাখেন। নিজেদের সমস্ত উপায়-উপকরণের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করে দেখো। আল্লাহ যদি তোমাদের শাস্তি দিতে চান তাহলে এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে? আর আল্লাহ যদি তোমাদের রিয়িকের দরজা বন্ধ করে দেন, তাহলে এমন কে আছে, যে তা খুলে দিতে পারে? তোমাদেরকে প্রকৃত সত্য জানিয়ে দেয়ার জন্য এগুলো সবই প্রস্তুত আছে। কিন্তু এগুলোকে তোমরা পশ্চ ও জীব-জন্মের দৃষ্টিতে দেখে থাকো। পশ্চরা এসব দেখে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মানুষ হিসেবে আল্লাহ তোমাদেরকে যে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তা ও বোধশক্তি সম্পর্ক মন্তিক দিয়েছেন, তা তোমরা কাজে সাগাও না। আর এ কারণেই তোমরা সঠিক পথ দেখতে পাও না।

২৪ থেকে ২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, অবশ্যে একদিন তোমাদেরকে নিচিতভাবে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। নবীর কাজ এ নয় যে, তিনি তোমাদেরকে সেদিনটির আগমনের সময় ও তারিখ বলে দেবেন। তার কাজ তো শুধু এতটুকু যে, সেদিনটি আসার আগেই তিনি তোমাদের সাবধান করে দেবেন। আজ তোমরা তার কথা মানছো না। বরং ঐ দিনটি তোমাদের সামনে হাজির করে দেখিয়ে দেয়ার দাবী করছো। কিন্তু যখন তা এসে যাবে এবং তোমরা তা চোখের সামনে হাজির দেখতে পাবে তখন তোমরা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে।

২৮ ও ২৯ নং আয়াতে মক্কার কাফেরদের কিছু কথার জবাব দেয়া হয়েছে। এসব কথা তারা নবী সাল্লাহুর্রাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী-সাথীদের বিরুদ্ধে বলতো। তারা নবী সাল্লাহুর্রাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিশাপ দিতো এবং তাঁর ও ঈমানদারদের ধৰ্মস হয়ে যাওয়ার জন্য বদ দোয়া করতো। তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে সৎপথের দিকে আহবানকারীরা ধৰ্মস হয়ে যাক বা আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুক তাতে তোমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন কি করে হবে? তোমরা নিজের জন্য চিন্তা করো। আল্লাহর আয়াব যদি তোমাদের উপর এসে পড়ে তাহলে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে? যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং যারা তাঁর উপরে তাওয়াক্কুল করেছে তোমরা মনে করেছো, তারা গোমরাহ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এমনই এক সময় আসবে যখন প্রকৃত গোমরাহ করা তা প্রকাশ হয়ে পড়বে।

অবশ্যে মানুষের সামনে একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছে এবং সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে বলা হয়েছে : মরজ্ঞি ও পর্বতময় আরবভূমিতে যেখানে তোমাদের জীবন পুরোটাই পানির উপর নির্ভরশীল, পানির এসব ঝরণা ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে। এসব জায়গায় পানির উৎসগুলো যদি ভূগর্ভের আরো নীচে নেমে উধাও হয়ে যায় তাহলে আর কোনু শক্তি আছে, যে এই সংজীবনী-ধারা তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারে?

আয়াত ৩০

রুক্ত ২

## সূরা আল মুল্ক-মঙ্গী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

تَبَرَّكَ الَّذِي بَيَّنَ لِلْمُلْكِ وَهُوَ أَكْبَرُ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ<sup>۱</sup> إِنَّمَا<sup>۲</sup>  
 خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ إِنْ كُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ<sup>۳</sup>  
 إِنَّمَا<sup>۴</sup> خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ  
 تَفْوِيتٍ<sup>۵</sup> فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فَطُورٍ<sup>۶</sup>

অতি মহান ও প্রেষ্ঠ<sup>১</sup> তিনি যাঁর হাতে রায়েছে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের কর্তৃত্ব।<sup>২</sup> তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতা রাখেন।<sup>৩</sup> কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন।<sup>৪</sup> আর তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশালীও।<sup>৫</sup> তিনিই শরে শরে সাজিয়ে সাতটি আসমান তৈরী করেছেন।<sup>৬</sup> তুমি রহমানের সৃষ্টিকর্মে কোন প্রকার অসংগতি দেখতে পাবে না।<sup>৭</sup> আবার চোখ ফিরিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাছ কি?

১. تَبَرَّكَ شব্দ থেকে আধিক্য অর্থে গৃহীত। ব্রক্ত শব্দটি প্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, বৃদ্ধি, আধিক্য, স্থায়ত্ব, দৃঢ়তা এবং অধিক পরিমাণে কল্যাণ ও নেকী অর্থ প্রকাশক। এর থেকে আধিক্য অর্থ প্রকাশক শব্দ গঠন করে ত্বরক করা হলে তার অর্থ হয় তিনি অত্যধিক সম্মানিত ও মহান, নিজের সন্তা, শুণাবলী ও কাজ-কর্মে অন্য সবার চেয়ে শেষ, তাঁর সন্তা থেকে অশেষ ও অগণিত কল্যাণের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এবং তাঁর পূর্ণতা চিরস্থায়ী। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৪৩; আল মু'মিনুন, টীকা ১৪; আল ফুরকান, টীকা ১ ও ১১)।

২. شَدِّ الْمُلْكُ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে এর কোন সীমিত অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না। সুতরাং নিচিতভাবে এর অর্থ দীঢ়ায় গোটা বিশ্ব-জাহানের ওপর রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকার অর্থ এটা নয় যে, দৈহিক অংগ হিসেবে তাঁর কোন হাত আছে। বরং বাকরীতি অনুসারে শব্দটি অধিকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষার মত আমাদের ভাষাতেও যখন বলি যে, সব ক্ষমতা

অমুকের হাতে তখন তার অর্থ হয় সে-ই সব ক্ষমতার মানিক, অন্য কারো সেখানে কোন কর্তৃত্ব নেই।

৩. অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি কোন কাজ করতে চাইবেন অথচ করতে পারবেন না কোন কিছুই তাকে এরূপ অক্ষম করে দেয়ার মত নেই।

৪. অর্থাৎ তিনি পৃথিবীতে মানুষের জীবন ও মৃত্যুর এ ধারাবাহিকতা চালু করেছেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য, কোন মানুষটির কাজ বেশী ভাল তা দেখার জন্য। এ সংক্ষিপ্ত বাকাটিতে বেশ কিছু সত্ত্বের প্রতি ইঁধিত দেয়া হয়েছে। প্রথম হলো, মৃত্যু এবং জীবন তাঁরই দেয়া। আর কেউ জীবনও দান করতে পারে না, মৃত্যুও না। দ্বিতীয় হলো, মানুষ একটি সৃষ্টি, তাকে ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকার কাজ করার শক্তি দেয়া হয়েছে। তার জীবন বা মৃত্যু কোনটিই উদ্দেশ্যহীন নয়, মষ্ট তাকে এখানে সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষার জন্য। জীবন তার জন্য পরীক্ষার সময় বা অবকাশ মাত্র। মৃত্যুর অর্থ হলো, তার পরীক্ষার সময় ফুরিয়ে গেছে। তৃতীয় হলো, এ পরীক্ষার জন্য মষ্ট সবাইকে কাজের সুযোগ দিয়েছেন। নে ভাল মানুষ না খারাপ মানুষ, এ পৃথিবীতে কাজের মাধ্যমে সে যাতে তার প্রকাশ ঘটাতে পারে সে জন্য সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেককে কাজের সুযোগ দিয়েছেন। চতুর্থ হলো, কার কাজ ভাল এবং কার কাজ খারাপ প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তাই তার ফায়সালা করবেন। কাজের ভাল-মন্দ বিচার করার মানদণ্ড নির্ধারণ করা পরীক্ষার্থীর কাজ নয়, বরং পরীক্ষা গ্রহণকারীর কাজ। তাই যারাই পরীক্ষায় সফল হতে চাইবে, তাদেরকে জানতে হবে পরীক্ষা গ্রহণকারীর দৃষ্টিতে ভাল কাজ কি? পঞ্চম বিষয়টি পরীক্ষা কথাটির মধ্যেই নিহিত। তা হলো, যার কাজ যেমন হবে তাকে সে অনুপাতেই প্রতিফল দেয়া হবে। কারণ ফলাফলই যদি না থাকে তাহলে পরীক্ষা নেয়ার আদৌ কোন অর্থ হয় না।

৫. এর দু'টি অর্থ এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি হলো, তিনি মহা পরাক্রমশালী এবং সবার ওপর পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও নিজের সৃষ্টির প্রতি তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল, তাদের প্রতি জালেম ও কঠোর নন। দ্বিতীয়টি হলো, দুর্কর্মকারীদের শাস্তি দেয়ার পূরো ক্ষমতা তাঁর আছে। এতো শক্তি কারো নেই যে তাঁর শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু যারা লজ্জিত হয়ে দুর্কর্ম'পরিত্যাগ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের সাথে তিনি ক্ষমাশীলতার আচরণ করে থাকেন।

৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ৩৪; আর রা'দ, টীকা ২; আল হিজর টীকা ৮; আল হাজ্জ, টীকা ১১৩; আল মু'মিনুন, টীকা ১৫; আস সাফাফাত, টীকা ৫ এবং আল মু'মিন, টীকা ১০।

৭. মূল আয়তে **نَفَّعْتُ** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হলো সামঝস্যহীনতা। এক বন্ধুর সাথে আরেকটি বন্ধুর মিল না হওয়া, অমিল হওয়া বা খাপ না খাওয়া। সূতরাং এ কথাটির অর্থ হলো, গোটা বিশ্ব-জাহানের কোথাও তোমরা বিশ্বখলা, অবিন্যস্ততা ও অসংগতি দেখতে পাবে না। আল্লাহর সৃষ্টি এ পৃথিবীতে কোন জিনিসই সামঝস্যহীন ও খাপছাড়া নয়। এর প্রত্যেকটি অংশ পরম্পর বাঁধা এবং সেগুলোর মধ্যে পুরো মাত্রায় সামঝস্য বিদ্যমান।

ثُمَّ أَرْجِعُ الْبَصَرَ كَمَا تَيِّنَ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ<sup>৩</sup>  
 وَلَقَلِ زِينًا السَّمَاءُ الَّذِي نَيَّا بِمَصَابِيرِ وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيْطَنِينَ  
 وَأَعْتَنَّ نَالَهُمْ عَنْ أَبِ السَّعِيرِ<sup>৪</sup> وَلِلَّذِي نَيَّنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَنْ أَبِ جَهَنَّمِ  
 وَبِئْسَ الْمُصِيرُ<sup>৫</sup>

তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখ, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে।

আমি তোমাদের কাছের আসমানকে<sup>১</sup> সুবিশাল প্রদীপমালায় সজ্জিত করেছি।<sup>১০</sup> আর সেগুলোকে শয়তানদের মেরে তাড়ানোর উপকরণ বানিয়ে দিয়েছি।<sup>১১</sup> এসব শয়তানের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জুলন্ত আগুনের শাস্তি।

যেসব লোক তাদের রবকে অস্বীকার করেছে<sup>১২</sup> তাদের জন্য রয়েছে জাহানামের শাস্তি। সেটি অত্যন্ত খারাব জায়গা।

৮. মূল ব্যবহৃত শব্দটি হলো - ফ্লেট - এর অর্থ ফাটল, ছিদ্র, চিড়া, ভাঙা চোরা। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব-জাহানের বাঁধন এতো মজবুত এবং পৃথিবীর একটি অণু থেকে বিশালকায় নীহারিকা ঘণ্টী পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু এমন সুদৃঢ় বক্সে আবক্ষ যে, বিশ্ব-জাহানের কোথাও শৃঙ্খলার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। তোমরা যতই অনুসরান চালাও না কেন এর কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা দেখা যাবে না। (বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা কুফ, চীকা ৮)।

৯. কাছের আসমান অর্থ সে আসমান যার তারকারাজি এবং গ্রহসমূহকে আমরা খালি চেয়ে দেখতে পাই। এর চেয়েও দূরে অবস্থিত যেসব কস্তুরে দেখতে যত্নের সাহায্য নিতে হয় তা হলো দূরের আসমান। আর যন্ত্রপাতির সাহায্যেও যা দেখা যায় না তা হলো অধিক দূরবর্তী আসমান।

১০. মূলত مَصَابِيرَ শব্দটি এখানে অনিদিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অনিদিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এসব প্রদীপের সুবিশাল হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়। কথাটির অর্থ হলো, আমি এ বিশ্ব-জাহানকে অঙ্ককারাচ্ছন্ন ও জনমানবহীন করে সৃষ্টি করিনি। বরং তারকারাজি দ্বারা খুব সুন্দর করে সাজিয়েছি। রাতের অঙ্ককারে মানুষ যার জীকজমক ও দীক্ষিয়তা দেখে বিশ্বে অভিভূত হয়ে যায়।

১১. এর অর্থ এটা নয় যে, এসব তারকাকেই শয়তানদের দিকে ছুঁড়ে মারা হয়। আবার এ অর্থও নয় যে, শুধু শয়তানদেরকে মারার জন্যই উক্তার পতন ঘটে। বরং এর অর্থ হলো তারকারাজি থেকে যে অসংখ্য উক্তাপিণ্ড নির্গত হয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিশ্ব-জাহানের সর্বত্র ঘূরে বেড়ায় এবং এরা অগণিত সংখ্যায় প্রতি মুহূর্তে ভৃপৃষ্ঠের দিকে ছুটে আসে,

إِذَا الْقَوَافِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَمِيقاً وَهِيَ تَفُورٌ ۚ تَكَادُ تَمِيزُ مِنَ الْغَيْظِ كَلِمَاتِ أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَالِمٌ خَرَّتْهَا الْمَرْيَاتِكْرَنِيرٌ ۚ قَالُوا بَلِّي قَدْ جَاءَ نَانِنِيرٌ ۖ فَكَلَّ بِنَا وَقْلَنَا مَا نَرَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنْ أَنْتَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٌ ۚ وَقَالُوا لَوْكَنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كَنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرٍ ۝

তাদেরকে যখন সেখানে নিষ্কেপ করা হবে তখন তারা তার ভয়ানক গর্জনের শব্দ শুনতে পাবে<sup>১</sup> এবং তা টগবগ করে ফুটতে থাকবে। অত্যধিক রোমে তা ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। যখনই তার মধ্যে কোন দলকে নিষ্কেপ করা হবে তখনই তার ব্যবস্থাপকরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সাবধানকারী আসেনি<sup>২</sup> তাৰা জবাব দেবে, হঁ আমাদের কাছে সাবধানকারী এসেছিলো। কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিলাম এবং বলেছিলাম আল্লাহ কিছুই নায়িল করেননি। তোমরাই বরং বিরাট ভূলের মধ্যে পড়ে আছো<sup>৩</sup> তাৰা আরো বলবে : আহা! আমরা যদি শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতাম,<sup>৪</sup> তাহলে আজ এ জুল্স্ট আগন্তে সাজাপ্রাণ্ডদের মধ্যে গণ্য হতাম না।

সেগুলো পৃথিবীর শয়তানদের উর্ধ জগতে ওঠার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে। তারা ওপরে ওঠার চেষ্টা করলেও এ উষ্ণ পিণ্ডগুলো তাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। এ বিষয়টি বলার প্রয়োজন এ জন্য যে, গণকদের সম্পর্কে আরবের লোকেরা এ ধারণা পোষণ করতো যে, শয়তানরা তাদের অনুগত বা শয়তানদের সাথে তাদের যোগাযোগ আছে। এসব শয়তানের মাধ্যমে তারা গায়েবের ঘবর পেয়ে থাকে এবং সঠিকভাবে মানুষের ভাগ্য গণনা করতে পারে। গণকরা নিজেরাও এ দাবী করতো। তাই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, শয়তানদের উর্ধ জগতে ওঠা এবং সেখান থেকে গায়েবের ঘবর অবহিত হওয়ার আদৌ কোন সংজ্ঞাবনা নেই। অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন : তাফহীমুল কুরআন, আল হিজর, টীকা ৯ থেকে ১২; আস সাফ্ফাত; টীকা ৬-৭।

এখন একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, এ উষ্ণগুলো আসলে কি? এ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান চূড়ান্ত অনুসন্ধান ও গবেষণালক কোন সিদ্ধান্ত দিতে এখনো অক্ষম। তা সত্ত্বেও আধুনিককালে যেসব তত্ত্ব ও বাস্তব অবস্থা মানুষের জ্ঞানের আওতায় এসেছে এবং ভূগঠে পতিত উষ্ণাপিণ্ডসমূহের পর্যবেক্ষণ থেকে যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তার তিনিটে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় তত্ত্ব হলো : এসব উষ্ণাপিণ্ড কোন রহে বিক্ষেপণের কারণে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মহাশূন্যে ছুটে বেড়াতে থাকে এবং কোন এক পর্যায়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতায় এসে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। (দেখুন ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ১৯৬৭ইং সংস্করণ, ১৫ খণ্ড, শব্দ—Meteorites)

১২. অর্থাৎ মানুষ হোক কিংবা শয়তান যারাই তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে, এটাই হয়েছে তাদের পরিণাম। (রবের সাথে কুফরী করা বিষয়ে বিশ্লারিত জানতে হলে দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ১৬১; আন নিসা, টীকা ১৭৮; আল কাহফ, টীকা ৩৯; আল মু'মিন, টীকা ৩)।

১৩. মূল ইবারতে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা গাধার ডাকের মত আওয়াজ বুবানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ বাক্যের অর্থ এও হতে পারে যে, এটা খোদ জাহানামের শব্দ। আবার এও হতে পারে যে, জাহানাম থেকে এ শব্দ আসতে থাকবে, ইতিঘণ্টেই যেসব লোককে জাহানামে নিষ্কেপ করা হয়েছে তারা জোরে জোরে চিন্কার করতে থাকবে। সূরা হৃদের ১০৬ আয়াত থেকে দ্বিতীয় অর্থটির সমর্থন পাওয়া যায়। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ দোষবীরা দোষের মধ্যে হাঁপাতে, গোঙ্গাতে এবং হাঁসফাস করতে থাকবে। আর সূরা ফুরকানের ১২ আয়াত থেকে প্রথমোক্ত অর্থটির সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, দোষের দিকে যাওয়ার পথে এসব লোক দূরে থেকেই তার ক্ষেত্রে ও প্রচণ্ড উত্তেজনার শব্দ শুনতে পাবে। এসবের প্রেক্ষিতে সঠিক অর্থ দৌড়ায় এই যে, এটি খোদ জাহানামের ক্ষেত্রের শব্দ ও জাহানামবাসীদের চিন্কার-ক্ষণিত।

১৪. এ প্রশ্নের ধরন আসলে প্রশ্নের মত হবে না এবং তাদের কাছে কোন সতর্ককারী এসেছিল কিনা। জাহানামের কর্মচারীরা তাদের কাছে তা জানতেও চাইবে না। বরং এর উদ্দেশ্য হবে তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ের স্বীকারোক্তি আদায় করা যে, জাহানামে নিষ্কেপ করে তাদের প্রতি কোন বেইনসাফী করা হচ্ছে না। তাই তারা তাদের মুখ থেকেই এ মর্মে স্বীকৃতি আদায় করতে চেষ্টা করবেন যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে বেখবর রাখেননি। তিনি তাদের কাছে নবী পাঠিয়েছিলেন, সত্য কি ও সঠিক পথ কোনটি তা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং এ সত্য ও সঠিক পথের বিপরীত পথে চলার পরিণাম স্বরূপ যে তাদের এ জাহানামের ঝুলানি হতে হবে সে সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। আজ সে জাহানামেই তাদেরকে নিষ্কেপ করা হয়েছে। কিন্তু তারা নবীদের কথা মানতে অঙ্গীকৃতি জানিয়েছে। সুতরাং তাদেরকে এখন যে শান্তি দেয়া হচ্ছে তারা আসলে তার উপযুক্ত।

কুরআন মজীদে এ বিষয়টি বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ একটি পরীক্ষার জন্য মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। পরীক্ষাটি নেয়ার পদ্ধতি এমন নয় যে, মানুষকে সে সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনবহিত রেখে সঠিক পথে সে চলে কিনা তা দেখা হচ্ছে। বরং তাকে সঠিক পথ চিনিয়ে দেয়ার জন্য যে সম্ভাব্য সর্বাধিক যুক্তিসংজ্ঞিত ব্যবস্থা ছিল মহান আল্লাহ তা পুরোপুরিভাবে সম্পূর্ণ করেছেন। সে ব্যবস্থা অনুযায়ী নবী-রসূল পাঠানো হয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাবসমূহ নায়িল করা হয়েছে। মানুষ আয়িয়া আলাইহিমুস সালামকে এবং তাঁরা যেসব কিতাব এনেছেন সেগুলোকে মেনে নিয়ে সঠিক পথে চলবে, না তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের প্রবৃত্তি ও মনগড়া ধ্যান-ধারণার পেছনে ছুটবে, এখন তাদের সমস্ত পরীক্ষা এ একটিমাত্র বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নবুওয়াত মহান আল্লাহর একটি প্রমাণ। এভাবে তিনি মানুষের সামনে তাঁর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটা মানা বা না মানার ওপরে মানুষের ভবিষ্যত নির্ভর করছে। নবী-রসূলদের আগমনের পর কোন ব্যক্তি প্রকৃত অবস্থা না জানার ওজর পেশ করতে পারে

فَاعْتَرِفُوا بِنِيْمِهِ فَسَكَّا لِإِصْبَابِ السَّعِيرِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ  
رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ وَأَسْرَوْا قُولَكْمَ أَوْاجْهَرَوْا بِهِ  
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِنَاتِ الصَّلَوَرِ ۝ أَلَا يَعْلَمُ مِنْ خَلْقٍ ۝ وَهُوَ الْطِيفُ الْخَبِيرُ ۝

এভাবে তারা নিজেদের অপরাধ<sup>১</sup> স্বীকার করবে। এ দোষথবাসীদের ওপর আল্লাহর লানত।

যারা না দেখেও তাদের রবকে ভয় করে,<sup>১৮</sup> নিচয়ই তারা লাভ করবে ক্ষমা এবং বিরাট পুরুষার,<sup>১৯</sup> তোমরা নীচু স্থানে চুপে চুপে কথা বলো কিংবা উচ্ছবেরে কথা বলো (আল্লাহর কাছে দু'টোই সমান) তিনি তো মনের অবস্থা পর্যন্ত জানেন।<sup>২০</sup> যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানবেন না?<sup>২১</sup> অর্থ তিনি সৃষ্টিদশী<sup>২২</sup> ও সব বিষয় তালিভাবে অবগত।

না। তাকে না জানিয়ে অলঙ্কেই এতো বড় পরীক্ষা নেয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এখন বিনা অপরাধেই শাস্তি দেয়া হচ্ছে, এ ওজর তার ধোপে টিকিবে না। এ বিষয়টি এতো অধিকবার বিভিন্নভাবে কুরআন মজাদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার সংখ্যা নির্ণয় করাও কঠিন। উদাহরণ ব্রহ্মপ নিম্নবর্ণিত স্থানগুলোর উল্লেখ করা যায় : তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, আয়াত ২১৩, টীকা ২৩; আন নিসা, আয়াত ৪১-৪২, টীকা ৬৪, আয়াত ১৬৫, টীকা ২০৮; আল আন্দাম, আয়াত ১৩০-১৩১, টীকা ৯৮ থেকে ১০০; বনী ইসরাইল, আয়াত ১৫, টীকা ১৭, তাহা, আয়াত ১৩৪, আল কাসাস, আয়াত ৪৭, টীকা ৬৬, আয়াত ৫৯, টীকা ৮৩, আয়াত ৬৫; ফাতের, আয়াত ৩৭; আল মু'মিন, আয়াত ৫০, টীকা ৬৬।

১৫. অর্থাৎ তোমরা নিজেরাও বিভাস্ত আবার যারা তোমাদের ওপর ঈশ্বর এনেছে তারাও চরম বিভাসিতে দ্রুতে আছে।

১৬. অর্থাৎ আমরা যদি সত্যানুসর্কিংসু হয়ে নবীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম অথবা নবীগণ আমাদের সামনে যা পেশ করেছেন তা আসলে কি বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে তা বুবার চেষ্টা করতাম। এখানে শোনার কাজকে বুবার কাজের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ হলো, প্রথমে নবীর শিক্ষা আগ্রহ ও মনযোগ সহকারে শোনা (কিংবা তা যদি লিখিত আকারে থাকে তাহলে সত্যানুসর্কিংসু হয়ে তা পড়ে দেখা) হিদায়াত লাভ করার পূর্ব শর্ত। চিন্তা-ভাবনা করে তাঙ্গে উপলব্ধি করার পর্যায় আসে এর পরে। নবীর দিকনির্দেশনা ছাড়া নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে সরাসরি সঠিক পথ লাভ করা যায় না।

১৭. অপরাধ কথাটি এক বচনে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মানে যে কারণে তারা জাহানামের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে তা হলো রসূলগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা এবং তাঁদেরকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করা। অন্যসব অপরাধ এরি ডাল-পালা মাত্র।

১৮. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় এটিই হলো নৈতিকতার মূল। কেউ যদি খারাপ কাজ থেকে শুধু এ জন্য বিরত থাকে যে, তার নিজের বিবেক-বুদ্ধির বিচারে কাজটি খারাপ কিংবা সব মানুষ সেটিকে খারাপ মনে করে কিংবা তা করলে পার্থিব জীবনে কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে কিংবা এ জন্য কোন পার্থিব শক্তির তাকে পাকড়াও করার ভয় আছে তা হলে সেটি হবে নৈতিকতার একটি অঙ্গীয়া ভিত্তি। মানুষের ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা ভুলও হতে পারে। বিশেষ কোন মানসিক প্রবণতার কারণে সে একটি তাল জিনিসকে মন্দ এবং একটি মন্দ জিনিসকে তাল মনে করতে পারে। তাল ও মন্দ যাচাই করার পার্থিব মানদণ্ড প্রথমত এক রকম নয়। এ ছাড়াও তা সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়। দুনিয়ার নৈতিক দর্শনে কোন বিশ্বজ্ঞান ও স্থায়ী মানদণ্ড বর্তমানেও নেই অতীতেও ছিল না। পার্থিব ক্ষতির আশংকাও নৈতিকতার কোন স্বতন্ত্র মানদণ্ড নয়। দুনিয়ার জীবনে নিজের কোন ক্ষতি হতে পারে শুধু এ ভয়ে যে ব্যক্তি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, ক্ষতি হওয়ার আশংকাকা নেই, এমন অবস্থায় সে ঐ কাজ থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হবে না। একইভাবে কোন পার্থিব শক্তির কাছে জবাবদিহির আশংকাও এমন কিছু নয় যা একজন মানুষকে ভদ্র ও সৎ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। সবাই জানে, পার্থিব কোন শক্তিই দেখা ও না দেখা বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী নয়। তার দৃষ্টিতে বাইরে অসংখ্য অপরাধ সংয়োগ হতে পারে। যে কোন পার্থিব শক্তির পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য অসংখ্য কৌশল ও ফন্ডি-ফিক্রির অবলম্বন সম্ভব। এ ছাড়াও পার্থিব শক্তির রচিত আইন ব্যবস্থা সব রকমের অপরাধকে তার আওতাধীন করতে পারে না। বেশীর ভাগ অপরাধই এমন পর্যায়ের, পার্থিব আইন-কানুন যার ওপর আদৌ কোন হস্তক্ষেপ করে না। অথচ পার্থিব আইন ব্যবস্থা যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে সেগুলোর চেয়ে তা জঘন্য। তাই ইসলামী জীবন বিধান নৈতিকতার প্রাসাদ এমন একটি বুনিয়াদের ওপর নির্মাণ করেছে যার ভিত্তিতে অদৃশ্য আগ্নাহর তয়ে সব খারাপ কাজ বর্জন করতে হয়। যে আগ্নাহ সর্বাবস্থায় মানুষকে দেখছেন, যার হস্তক্ষেপ ও পাকড়াও থেকে নিজেকে রক্ষা করে মানুষ কোথাও যেতে সক্ষম নয়। যিনি মানুষকে তাল ও মন্দ যাচাইয়ের জন্য একটি সার্বিক, বিশ্বজ্ঞান এবং পূর্ণাঙ্গ মানদণ্ড দিয়েছেন, শুধু তাঁর ভয়ে মন্দ ও অকল্যাণকে বর্জন করা এবং তাল ও কল্যাণকে গ্রহণ করা এমন একটি কল্যাণকর নীতি যা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান। এ কারণটি ছাড়া যদি অন্য কোন কারণে কোন মানুষ অন্যায় না করে কিংবা বাস্তিকভাবে যেসব কাজ নেকীর কাজ বলে গণ্য হয় তা করে তাহলে তার এ নৈতিকতা আখেরাতে কোন মূল্য ও মর্যাদালাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। কারণ তা হবে বালির স্তুপের ওপর নির্মিত প্রাসাদের মতো।

১৯. অর্থাৎ না দেখে আগ্নাহকে তয় করার দু'টি অনিবার্য ফল আছে। এক, মানবিক দুর্বলতার কারণে মানুষের যে অপরাধ ও ত্রুটি-বিচুতি হয় তা মাফ করে দেয়া হবে। তবে তা এ শর্তে যে, তার গভীরে ও উৎসমূলে আগ্নাহভীতির অনুপস্থিতি যেন কার্যকর না থাকে। দুই, এ আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষ যেসব নেক আশল করবে তার জন্য সে বিরাট প্রস্তাব পাবে।

২০. একথাটি কাফের ও মু'মিন নির্বিশেষে গোটা মানব জাতিকে লক্ষ করে বলা হয়েছে। এতে মু'মিনের জন্য শিক্ষা হলো, দুনিয়ায় জীবন যাপনকালে তাকে তার মন-মগজে এ অনুভূতি কার্যকর রাখতে হবে যে, তার গোপন ও প্রকাশ্য সব কথা ও কাজই

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلِكُلَا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُّا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّسُورُ<sup>১৩</sup> إِمْتِنَرْ مِنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ<sup>১৪</sup> إِمْتِنَرْ مِنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَرِسِّلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَةً فَسْتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَلِي<sup>১৫</sup>

## ২. রংকৃ

তিনিই তো সেই মহান সত্তা যিনি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। তোমরা এর বুকের ওপর চলাফেরা করো এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও।<sup>১৬</sup> আবার জীবিত হয়ে তোমাদেরকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।<sup>১৭</sup> যিনি আসমানে আছেন<sup>১৮</sup> তিনি তোমাদের মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেবেন এবং অকস্মাত ভূপৃষ্ঠ জোরে ঝীকুনি খেতে থাকবে, এ ব্যাপারে কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী হাওয়া পাঠাবেন<sup>১৯</sup>—এ ব্যাপারেও কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার সাবধানবাণী কেমন? <sup>২০</sup>

গুরু নয় তার নিয়ত ও ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত কোন কিছুই আল্লাহর অজানা নয়। আর কাফেরের জন্য এতে সাবধানবাণী হলো এই যে, আল্লাহকে ভয় না করে সে নিজ অবস্থানে থেকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কিন্তু তার কোন একটি ব্যাপারও আল্লাহর কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপের আওতা বহির্ভূত নয়।

২১. এর আরেকটি অনুবাদ হতে পারে—তিনি কি তাঁর সৃষ্টিকেই জানবেন না? মূল ইবারতে মুন্হ খ্লাঁ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে “যিনি সৃষ্টি করেছেন”ও হতে পারে। আবার শ্বাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন”ও হতে পারে। উভয় অবস্থায় মূল অর্থ একই থাকে। এটি ওপরের আয়াতাঙ্গে উল্লেখিত বজ্রবের প্রমাণ। অর্থাৎ স্মষ্টি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর থাকবেন তা কি করে সত্ত্ব? খোদ সৃষ্টি নিজের সম্পর্কে বেখবর বা অস্ত থাকতে পারে। কিন্তু স্মষ্টি তার সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারেন না। তোমাদের প্রতিটি শিরা-উপশিরা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের হৃদপিণ্ড ও মন্তিক্ষের প্রতিটি স্নায়ুত্ত্বীও তাঁর সৃষ্টি। তোমাদের প্রতিটি নিশাস-প্রশাস তিনি চালু রেখেছেন বলেই তা চালু আছে। তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর ব্যবস্থাপনার অধীনে কাজ করছে। তাই তোমাদের কোন বিষয় তাঁর অঙ্গোচরে কি করে থাকতে পারে?

২২. আয়াতে **لطيف** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ হলো সূক্ষ্ম ও অনুভবযোগ্য নয় এমন পছায় কর্ম সম্পাদনকারী এবং আরেকটি অর্থ হলো গোপন তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী।

২৩. অর্থাৎ ভৃপৃষ্ঠ নিজে থেকেই তোমাদের অনুগত হয়ে যায়নি। আর যে খাবার তোমরা লাভ করছো তাও আপনা থেকেই এখানে সৃষ্টি হয়নি। বরং আল্লাহর তাঁর ইকমত ও কুদরত দ্বারা এ পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এখানে তোমাদের জীবন ধারণ সঙ্গে হচ্ছে এবং এ বিশাল গ্রহটি এমন শান্তিময় হয়ে উঠেছে যে, তোমরা নিচিতে এখানে চলাফেরা করছো। তোমাদের জন্য এটি এমন একটি নিয়ামতের ভাগীর হয়ে উঠেছে যে, তোমাদের জীবন যাপনের জন্য এখানে অসংখ্য উপকরণ বর্তমান আছে। যদি তোমরা গাফিল না হয়ে থাকো এবং কিছু বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে দেখো তাহলে জানতে পারবে, তু পৃষ্ঠকে তোমাদের জীবন ধারণের উপযোগী বানাতে এবং সেখানে রিয়িকের অফুরন্ট ভাগীর সৃষ্টি করতে কি পরিমাণ বুদ্ধি ও কৌশল কাজে লাগানো হয়েছে। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নামল, টীকা ৭৩, ৭৪ ও ৮১; ইয়াসীন, টীকা ২৯, ৩২; আল মু'মিন, টীকা ৯০, ৯১; আয় যুখুরুফ, টীকা ৭; আল জাসিয়া, টীকা ৭; কুফ, টীকা ১৮)

২৪. অর্থাৎ এ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করো এবং আল্লাহর দেয়া রিয়িক খাও। কিন্তু একথা ভূলে যেও না যে, একদিন তোমাদের আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে।

২৫. এর দ্বারা একথা বুঝায় না যে, আল্লাহর আসমানে থাকেন। বরং কথাটি এভাবে বলার কারণ হলো, মানুষ যখনই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চায় তখনই সে আসমানের দিকে তাকায়, দোয়া করার সময় আসমানের দিকে হাত উঠায়, কোন বিপদের সময় সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা ও অবলুপ্ত থেকে নিরাশ হয়ে গেলে আসমানের দিকে মুখ তুলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে। আকষ্মিকভাবে কোন বিপদ আপত্তি হলে বলে, এটি ওপর থেকে নায়িল হয়েছে। অবাভাবিকভাবে পাওয়া কোন জিনিস সম্পর্কে বলে এটি উর্ধ্ব জগত থেকে এসেছে। আল্লাহর প্রেরিত কিভাবসমূহকে আসমানী কিভাব বলা হয়। আবু দাউদে হয়রত আবু হুরাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি একটি কাল দাসীকে সাথে করে রস্তাল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললোঃ একজন ঈমানদার দাসকে মুক্ত করা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। আমি কি এই দাসীটিকে মুক্ত করতে পারি? নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসীটিকে জিজ্ঞেস করলেন : আল্লাহ কোথায়? সে আংশুল দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা করে দেখালো। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন : আমি কে? সে প্রথমে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে এবং পরে আসমানের দিকে ইশারা করলো। এভাবে তার উদ্দেশ্য বুঝা যাচ্ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : একে মুক্ত করে দাও, এ ঈমানদার। মুয়াত্তা, মুসলিম ও নাসায়ী হাদীসগ্রহেও অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হয়রত উমর (রা) হয়রত খাওলা বিনতে সালাবা সম্পর্কে একবার বলেন যে, তিনি এমন এক মহিলা যার আবেদন সাত আসমানের ওপর থেকে করুন করা হয়েছে। (সূরা মুজাদালার তাফহীমীরে ২৮ টীকায় আমরা এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছি।) এসব কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানুষ যখন আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করে তখন স্বত্বাবতই তার মন নিচে মাটির দিকে যায় না। বৰং ওপরে আসমানের দিকে যায়। এদিকে লক্ষ রেখেই এখানে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে (যিনি আসমানে

وَلَقَدْ كَنَبَ الَّذِينَ سِنْ قَبِيلُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ۝ أَوْ لَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ  
فَهُوَ قَمَرٌ صَفِيتٌ وَيَقِيبُضُنْ مَا يَمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ۝ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۝  
أَمْنَ هُنَّ الَّذِينَ هُوَ جَنْلُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ۝ إِنَّ الْكُفَّارَ  
إِلَّا فِي غَرْوَرٍ ۝ أَمْنَ هُنَّ الَّذِينَ يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ بِجَمَافِي  
عَتْوَوْنَفُورٌ ۝ أَفَمَنْ يَمْشِي مِكْبَابًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْلَى أَمْنَ يَمْشِي سُوِيَّا  
عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيرٍ ۝

তাদের পুর্বের লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। ফলে দেখো, আমার পাকড়াও কত কঠিন হয়েছিল।<sup>২৮</sup> তারা কি মাথার ওপর উড়ত পাখীগুলোকে ডানা মেলতে ও শুটিয়ে নিতে দেখে না? রহমান ছাড়া আর কেউ নেই যিনি তাদেরকে ধরে রাখেন।<sup>২৯</sup> তিনিই সবকিছুর রক্ষক।<sup>৩০</sup> বলো তো, তোমাদের কাছে কি এমন কোন বাহিনী আছে যা রহমানের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে?<sup>৩১</sup> বাস্তব অবস্থা হলো, এসব কাফেররা ধোকায় পড়ে আছে মাত্র। অথবা বলো, রহমান যদি তোমাদের রিযিক বন্ধ করে দেন তাহলে এমন কেউ আছে, যে তোমাদের রিযিক দিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এসব লোক বিদ্রোহ ও সত্য বিমুক্তায় বদ্ধপরিকর। ভেবে দেখো, যে ব্যক্তি মুখ নিচু করে পথ চলছে<sup>৩২</sup> সে-ই সঠিক পথপ্রাপ্ত, না যে ব্যক্তি মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে সমতল পথে হাঁটছে সে-ই সঠিক পথ প্রাপ্ত?

আছেন) কথাটি বলা হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে এক্সপ সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই যে, কুরআন আল্লাহ ত'আলাকে আসমানে অবস্থানকারী বলে ঘোষণা করছে। কি করে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে? এ সূরা মুলকেরই শুরুতে বলা হয়েছে, **الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا** (তিনি, স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাতটি আসমান সৃষ্টি করেছেন) সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে, **فَأَيْنَمَا تُولُوا فَئَمْ وَجْهُ اللَّهِ** তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও না কেন সেটিই আল্লাহর দিক।

২৬. এভাবে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, এ পৃথিবীতে তোমাদের ঢিকে থাকা এবং নিরাপত্তা লাভ করা সবসময় মহান আল্লাহর দয়া ও করণার ওপর নির্ভর করে। তোমরা আপন শক্তির জোরে এ পৃথিবীতে সূথের জীবন যাপন করছো না। তোমাদের জীবনের এক একটি মূহূর্ত, যা এখানে অতিবাহিত হচ্ছে, তার সবই আল্লাহর হিফায়ত ও তত্ত্বাবধানের

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِلَةَ، قَلِيلًا  
 مَا تَشْكِرُونَ<sup>৩৪</sup> قُلْ هُوَ الَّذِي فَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشِرُونَ<sup>৩৫</sup>  
 وَيَقُولُونَ مَتَى هُنَ الْوَعْدُ إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ<sup>৩৬</sup> قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْ دِيْنِ اللَّهِ  
 وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ<sup>৩৭</sup> فَلَمَّا رَأَهُ زُلْفَةَ سِيَّئَتْ وِجْهُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 وَقَيْلَ هُنَّا الَّذِي كَنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ<sup>৩৮</sup>

এদেরকে বলো, আল্লাহই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো।<sup>৩৩</sup>

এদেরকে বলো, আল্লাহই সেই সত্তা যিনি তোমাদের পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে।<sup>৩৪</sup> এরা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বলো এ ওয়াদা কবে বাস্তবায়িত হবে?<sup>৩৫</sup> বলো, এ বিষয়ে জ্ঞান আছে শুধু আল্লাহর নিকট। আমি স্পষ্ট সর্তরকারী মাত্র।<sup>৩৬</sup> তারপর এরা যখন ঐ জিনিসকে কাছেই দেখতে পাবে তখন যারা অঙ্গীকার করেছে তাদের চেহারা বিবরণ হয়ে যাবে।<sup>৩৭</sup> আর তাদেরকে বলা হবে, এতো সেই জিনিস যা তোমরা চাচ্ছিলে।

ফল। অন্যথায় তাঁর ইঁথগিতে যে কোন সময় এ পৃথিবীতে ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে এবং এ পৃথিবী স্নেমাদের জন্য মায়ের শ্রেহময় কোল না হয়ে কবরে পরিণত হতো। অথবা যে কোন সময় এমন ঝড় ঝঞ্চা আসতে পারে যা তোমাদের জনপদকে ধ্রংস করে ফেলবে।

২৭. সাবধানবাণী মানে রসূলগ্রাহ সাল্লালাইহি ওয়া সাল্লাম ও পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে যকার কাফেরদেরকে সাবধান করা। তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছিল, যদি তোমরা কুফরী ও শিরক থেকে বিরত না হও এবং তাওহীদের যে আহবান তোমাদের জানানো হচ্ছে তাতে সাড়া না দাও তাহলে আল্লাহর আয়াব তোমাদের পাকড়াও করবে।

২৮. ইতিপূর্বে যেসব কওম তাদের কাছে আসা নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করে আয়াবে নিপত্তি হয়েছিলো তাদের প্রতি ইঁথগিত করা হয়েছে।

২৯. অর্ধাত শূন্যে উড়স্ত প্রতিটি পাথি করণাময় আল্লাহর হিফায়তে থেকে উড়ে থাকে। তিনি প্রতিটি পাথিকে এমন দৈহিক কাঠামো দান করেছেন যার সাহায্যে তারা উড়ে

বেড়াবার যোগ্যতা লাভ করেছে। তিনিই প্রতিটি পাখিকে উড়তে শিখিয়েছেন। তিনিই বাতাসকে এমন সব নিয়ম-কানুনের অধীন করে দিয়েছেন যে কারণে বাতাসের চেয়ে তারী দেহের অধিকারী বস্তুসমূহের পক্ষেও বাতাসে তর দিয়ে উড়া সম্ভব। আর উড়তে সক্ষম প্রতিটি বস্তুকে তিনিই শুন্যে ধরে রাখেন। তা না হলে আগ্নাহ তাঁর হিফায়ত উঠিয়ে নেয়া মাত্রই তা মাটিতে পড়ে যেতো।

৩০. অর্থাৎ গুটিকয়েক পাখির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ পৃথিবীতে যা আছে তা সবই আগ্নাহের হিফায়ত করার কারণে ঢিকে আছে। প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন তা তিনিই যোগান দিচ্ছেন। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির কাছে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সামগ্রী ঠিকমত পৌছানোর ব্যবস্থা তিনিই করেন।

৩১. আরেকটি অনুবাদ হতে পারে, “রহমান ছাড়া এমন আর কে আছে যে তোমার সৈন্যবাহিনী হয়ে তোমাকে সাহায্য করবে?” আমি যে অনুবাদ করেছি তা পরের আয়তের সাথে সামঝস্যপূর্ণ। কিন্তু দ্বিতীয় অনুবাদটি পূর্বের বক্তব্যগুলোর সাথে সম্পৃক্ত।

৩২. অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ারের মতো মুখ নিচু করে ঐ একই পথে চলছে যে পথে কেউ তাদেরকে একবার চালিয়ে দিয়েছে।

৩৩. অর্থাৎ আগ্নাহ তোমাদের মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, জন্তু-জানোয়ার করে পাঠাননি। তোমাদের কাজ তো এ ছিল না যে, দুনিয়ায় যে গোমরাহী বিস্তারলাভ করে আছে তোমরা চোখ বক করে তাই মেনে চলবে, ভেবেও দেখবে না, যে পথে তোমরা চলছো তা সঠিক কিনা। কেউ যদি তোমাদের সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুবাতে চেষ্টা করে, তার কথা তোমরা কানেই তুলবে না এবং তোমাদের মন-মন্ত্রিকে আগে থেকে জেঁকে বসা অসত্য ও অন্যায়কে আঁকড়ে থাকবে এ উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে এ কান দেয়া হয়নি। এ চোখ তো এ জন্য দেয়া হয়নি যে, তোমরা অঙ্গের মতো অন্যের অনুসরণ করবে। যদীন থেকে আসমান পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা নির্দশনসমূহ আগ্নাহের রসূলের পেশকৃত তাওহীদের সাক্ষ দিচ্ছে কি না এ বিশ-জাহানের ব্যবস্থাপনা খোদাইন বা বহুবোদার পরিচালনাধীন হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে কিনা নিজের দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তোমরা তা দেখবে না এ জন্য এ চোখ তোমাদেরকে দেয়া হয়নি। এ মন-মন্ত্রিকও তোমাদের এ জন্য দেয়া হয়নি যে, তোমরা চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনার কাজ অন্যদের হাতে ছেড়ে দিয়ে দুনিয়াতে এমন সব নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে চলবে যা অন্য কেউ চালু করেছে। তোমরা বিবেক-বৃদ্ধি খাটিয়ে এতেটুকুও ভেবে দেখবে না যে, তা সঠিক না ভ্রান্ত। জ্ঞান ও বিবেক-বৃদ্ধি এবং শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির এ নিয়ামত আগ্নাহ তোমাদের দিয়েছিলেন ন্যায় ও সত্যকে চেনার জন্য। কিন্তু তোমরা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো। এসব উপকরণের মাধ্যমে তোমরা সব কাজই করছো। কিন্তু যে জন্য তা তোমাদের দেয়া হয়েছিলো সে একটি কাজই মাত্র করছো না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন; তাফহীমুল কুরআন, আন নাহল, টীকা ৭২-৭৩; আল মু'মিনুন, টীকা ৭৫-৭৬; আস সাজদা, টীকা ১৭-১৮; আল আহকাফ, টীকা ৩১)

৩৪. অর্থাৎ মৃত্যুলাভের পরে পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে পরিবেষ্টিত করে আনা হবে এবং আগ্নাহের সামনে হাজির করা হবে।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمِنْ مَعِيْ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُحِيرُ  
 الْكُفَّارِ مِنْ عَنَّ أَبِي الْيَمِيرِ<sup>৩৪</sup> قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمْ نَاهِيْهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا  
 فَسْتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ<sup>৩৫</sup> قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَرْتُمْ مَأْكُورًا  
 غُورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا إِمْبِينَ<sup>৩৬</sup>

তুমি এদেরকে বলো, তোমরা কখনো এ বিষয়টি তেবে দেখেছো কি যে, আগ্নাহ যদি আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ধ্বংস করে দেন কিংবা আমাদের ওপর রহম করেন তাতে কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে? <sup>৩৮</sup> এদেরকে বলো, তিনি অত্যন্ত দয়ালু, আমরা তাঁর ওপর ইমান এনেছি এবং তাঁরই ওপর নির্ভর করেছি। <sup>৩৯</sup> তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভাসির মধ্যে ডুবে আছে? এদেরকে বলো, তোমরা কি এ বিষয়ে কখনো চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছো যে, যদি তোমাদের কৃষাণুলোর পানি মাটির গভীরে নেমে যায় তাহলে পানির এ বহমান স্নেত কে তোমাদের ফিরিয়ে এনে দেবে? <sup>৪০</sup>

৩৫. এভাবে প্রশ্ন করে তারা কিয়ামতের সময় ও তার দিন তারিখ জানতে চাইতো না। তারা এ উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতো না যে, তাদেরকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সন, মাস, দিন ও সময় বলে দিলে তারা তা স্বীকার করে নেবে। বরং তারা মনে করতো কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব ও অযৌক্তিক। আর তা মিথ্যা সাব্যস্ত করার একটা বাহানা হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই এ প্রশ্ন তারা করতো। তাদের মূল বক্তব্য হলো, তুমি আমাদেরকে কিয়ামতের যে অন্ত কাহিনী শুনাছো, তা কখন আত্মপ্রকাশ করবে? কোন সময়ের জন্য তা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে? আমাদের চেয়ের সামনে এনে তা দেখিয়ে দিছো না কেন? দেখিয়ে দিলেই তো আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যেতো। এ বিষয়ে একটি কথা ভালভাবে উপলক্ষি করা দরকার যে, কেউ কিয়ামতের সত্যতা স্বীকার করলে বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারাই করতে পারে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের যুক্তি-প্রমাণ সরিস্তারে পেশ করা হয়েছে। এখন থেকে যায় কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার তারিখ সম্পর্কিত বিষয়টি। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আলোচনায় কোন অকাট্য মূহুই কেবল এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে। কারণ, দিন তারিখ বলে দিলেও তাতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। অস্বীকারকারী তখন বলবে, যখন তা তোমাদের দেয়া নির্দিষ্ট তারিখে সংঘটিত হবে, তখন মেনে নেবো। আজ আমি কি করে একথা বিশ্বাস করবো যে, তোমার দেয়া নির্দিষ্ট তারিখে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, লোকমান, টীকা ৬৩; আল আহ্যাব, টীকা ১১৬; সাবা, টীকা ৫-৪৮; ইয়াসীন, টীকা ৪৫)

৩৬. অর্থাৎ একথা তো আমার জানা যে, কিয়ামত অবশ্যই আসবে। আর তার আসার আগে মানুষকে সাবধান করে দেয়ার জন্য এতেটুকু জানাই যথেষ্ট। তবে কখন আসবে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। আমি সে সম্পর্কে কিছু জানি না। আর সাবধান করে দেয়ার জন্য সে বিষয়ে জ্ঞান থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এ বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে ভালভাবে বুঝা যেতে পারে। কোনু ব্যক্তি কখন মারা যাবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ তা জানে না। তবে আমরা এতেটুকু জানি যে, প্রত্যেককেই এক সময় মৃত্যুবরণ করতে হবে। এখন আমাদের এ জ্ঞানটুকু আমাদের কোন অসর্তক প্রিয়জনকে মৃত্যু সম্পর্কে সতর্কীকরণের জন্য যথেষ্ট। যাতে সে যথাযথভাবে তার স্বার্থের হিফায়ত করতে পারে। এতেটুকু সাবধান করে দেয়ার জন্য সে কোন্দিন মারা যাবে তা জানা জরুরী নয়।

৩৭. অর্থাৎ কোন অপরাধীকে ফাঁসিকাটে খুলানোর জন্য নিয়ে যাওয়ার মূহর্তে যে অবস্থা হয় তাদের অবস্থাও ঠিক তাই হবে।

৩৮. মক্কা নগরীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুয়া সাল্লামের আন্দোলনের সূচনা হলে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রগুলি ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করলো। এতে মক্কার প্রতিটি পরিবার থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে অভিশাপ দেয়া শুরু হলো। তাঁর বিরুদ্ধে যাদুটোনা বা তত্ত্বমন্ত্রের প্রয়োগ শুরু হলো, যাতে তিনি ধ্রংস হয়ে যান। এমনকি হত্যার পরিকল্পনা সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকলো। তাই এখানে বলা হয়েছে, এদের বলো, আমরা ধ্রংস হয়ে যাই বা আল্লাহর রহমতে বেঁচে থাকি তাতে তোমাদের কি সাড়? আল্লাহর আয়াব এলে তোমরা নিজেরা কিভাবে নিষ্কৃতি পাবে সে চিন্তা করতে থাকো।

৩৯. অর্থাৎ আমরা আল্লাহর ওপরে ঈমান এনেছি আর তোমরা তাঁকে অধীকার করে চলেছো। আমরা ভরসা করি একমাত্র আল্লাহর ওপর আর তোমরা ভরসা করো তোমাদের দল, পার্থিব উপায়-উপকরণ এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সব উপাস্য দেব-দেবীদের ওপর। তাই আমরাই আল্লাহর রহমত লাভের উপযুক্ত, তোমরা নও।

৪০. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এমন শক্তির অধিকারী আছে কি; যে এসব ঝণাধারা আবার প্রবাহিত করে দেবে? যদি না থাকে আর তোমরা ভাল করেই জানো যে, নেই। তাহলে ইবাদত লাভের যোগ্য আল্লাহ না তোমাদের উপাস্যরা যাদের ঐ ঝণাধারাগুলো প্রবাহিত করার কোন সামর্থ নেই। এখন তোমরা নিজের বিবেককে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে দেখো যে, যারা এক আল্লাহকে মনে তারাই গোমরাহ না যারা শিরকে নিশ্চ আছে তারাই গোমরাহ?

# আল কলম

৬৮

## নামকরণ

এ সূরাটির দু'টি নাম; সূরা 'নূন' এবং সূরা 'আল কলম'। দু'টি শব্দই সূরার শুরুতে আছে।

## নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এটিও মক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের অন্যতম। তবে এর বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট হয় যে, সূরাটি যে সময় নাযিল হয়েছিলো তখন মক্কা নগরীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিলো।

## বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এতে তিনটি মূল বিষয় আলোচিত হয়েছে। বিরোধীদের আপত্তি ও সমালোচনার জবাব দান, তাদেরকে সতর্কীকরণ ও উপদেশ দান এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দৈর্ঘ্যধারণ ও অবিচল ধাকার উপদেশ দান।

বক্তব্যের শুরুতেই রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, এসব কাফের তোমাকে পাগল বলে অভিহিত করছে। অর্থ তুমি যে কিভাব তাদের সামনে পেশ করছো এবং নৈতিকতার যে উচ্চ আসনে তুমি অধিষ্ঠিত আছো তা-ই তাদের এ মিথ্যার মুখোশ উন্মোচনের জন্য যথেষ্ট। শিখগিরই এমন সময় আসবে যখন সবাই দেখতে পাবে, কে পাগল আর কে বুদ্ধিমান। অতএব তোমার বিরুদ্ধে বিরোধিতার যে তাওব সৃষ্টি করা হচ্ছে তা দ্বারা তুমি কখনো প্রভাবিত হয়ো না। আসলে তুমি যাতে কোন না কোনভাবে প্রভাবিত হয়ে তাদের সাথে সমরোতা (Compromise) করতে রাজী হয়ে যাও, এ উদ্দেশ্যেই এ কাজ করা হচ্ছে।

অতপর সাধারণ মানুষকে চোখে আংশুল দিয়ে দেবিয়ে দেয়ার জন্য বিরুদ্ধবাদীদের মধ্য থেকে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির কার্যকলাপ তুলে ধরা হয়েছে। এ ব্যক্তিকে মকাবাসীরা খুব ভাল করে জানতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৃত-পবিত্র নৈতিক চরিত্রও তাদের সবার কাছে স্পষ্ট ছিলো। মকাব যেসব নেতা তাঁর বিরোধিতায় সবার অগ্রগামী তাদের মধ্যে কোন্ ধরনের চরিত্র সম্পর লোক শামিল রয়েছে তা যে কেউ দেখতে পারতো।

এরপর ১৭ থেকে ৩৩ আয়াত পর্যন্ত একটি বাগানের মালিকদের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। আল্লাহর নিয়ামত লাভ করেও তারা সে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। বরং তাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তিটির কথাও তারা যথাসময়ে মেনে নেয়নি। অবশেষে তারা সে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যখন তাদের সবকিছুই ধৰ্ম ও বরবাদ হয়ে গিয়েছে তখনই কেবল তাদের চেতনা ফিরেছে। এ উদাহরণ দ্বারা মকাবাসীকে এভাবে সাবধান করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রসূল করে পাঠানোর কারণে তোমরাও ঐ বাগান মালিকদের মতো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। তোমরা যদি তাঁকে না মানো তাহলে দুনিয়াতেও শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আর এ জন্য আবেরাতে যে শাস্তি ভোগ করবে তাতো এর চেয়েও বেশী কঠোর।

এরপর ২৪ থেকে ৪৭ আয়াত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কখনো সরাসরি তাদেরকে লক্ষ করে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। আবার কখনো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সরোধন করে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। আসলে সাবধান করা হয়েছে তাদেরকেই। এ সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে তার সার সংক্ষেপ হলো, আবেরাতের কল্পণ তারাই লাভ করবে যারা আল্লাহতীর উপর ভিত্তি করে দুনিয়াবী জীবন যাপন করেছে। আল্লাহর বিচারে গোনাহগার ও অপরাধীদের যে পরিণাম হওয়া উচিত আল্লাহর অনুগত বাস্তুরাও সে একই পরিণাম লাভ করবে এবং পুনরুৎসব ধ্যান-ধারণা একেবারেই বুদ্ধি-বিবেক বিরোধী। কাফেরদের এ ভাস্তু ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন যে, তারা নিজের সম্পর্কে যা ভেবে বসে আছে আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে অনুরূপ আচরণই করবেন। যদিও এ বিষয়ে তাদের কাছে কোন নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি নেই। আজ এ পৃথিবীতে যাদেরকে আল্লাহর সামনে মাথা নত করার আহবান জানানো হচ্ছে তারা তা করতে অঙ্গীকৃতি জানাচ্ছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তারা সিজদা করতে চাইলেও করতে সক্ষম হবে না। সেদিন তাদেরকে লাঙ্ঘনাকর পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। কুরআনকে অঙ্গীকার করে তারা আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। তাদেরকে যে অবকাশ দেয়া হচ্ছে তাতে তারা ধোকায় পড়ে গেছে। তারা মনে করছে এভাবে যিন্য প্রতিপন্থ করা ও অঙ্গীকৃতি সত্ত্বেও যখন তাদের উপর আযাব আসছে না তখন তারা সঠিক পথেই আছে। অথচ নিজের অজাত্তেই তারা ধৰ্মসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করার কোন যুক্তিসংজ্ঞত কারণ নেই। কারণ তিনি দীনের একজন নিঃস্বার্থ প্রচারক। নিজের জন্য তিনি তাদের কাছে কিছুই চান না। তারা দাবী করে একথাও বলতে পারছে না যে, তিনি রসূল নন অথবা তাদের কাছে তাঁর বক্তব্য যিন্য হওয়ার প্রমাণ আছে।

সবশেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে যে, চূড়ান্ত ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত দীনের প্রচার ও প্রসারের পথে যে দৃঢ়-কষ্টই আসুক না কেন, ধৈর্যের সাথে তা বরদাশত করতে থাকুন এবং এমন অধৈর্য হয়ে পড়বেন না যা ইউনুস আলাইহিস সালামের জন্য কঠিন পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

আয়াত ৫২

## সূরা আল কলম-মঙ্গী

রুক্ত ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

نَوَالْقَلْمَرْ وَمَا يَسْطُرُونَ ① مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمُجْنِزٍ ② وَإِنَّ لَكَ  
 لَأْجَرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ③ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ④ فَسْتَبْصِرْ وَلَبِصَرُونَ ⑤  
 بِإِيمَانِ الْمُفْتَوْنَ ⑥ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ⑦ وَهُوَ أَعْلَمُ  
 بِالْمُهْتَلِّينَ ⑧

নূন, শপথ কলমের এবং লেখকরা যা লিখে চলেছে তার।<sup>১</sup> তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি পাগল<sup>২</sup> নও। আর নিচিতভাবেই তোমার জন্য এমন পুরুষার রয়েছে যা কখনো ফুরাবে না।<sup>৩</sup> নিসন্দেহে তুমি নৈতিকতার অতি উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন।<sup>৪</sup> অচিরে তুমিও দেখতে পাবে এবং তারাও দেখতে পাবে যে, তোমাদের উভয়ের মধ্যে কারা পাগলামীতে নিষ্ঠ। তোমার রব তাদেরকেও ভাল করে জানেন যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্ছুত হয়েছে। আর তাদেরকেও ভাল করে জানেন যারা সঠিক পথ প্রাঞ্চ হয়েছে।

১. তাফসীরের ইমাম মুজাহিদ বলেন : কলম যানে যে কলম দিয়ে যিকর অর্থাৎ কুরআন মজীদ লেখা হচ্ছিলো। এ থেকে বুঝা যায়, যা লেখা হচ্ছিলো তা ছিল কুরআন মজীদ।

২. একথাটির জন্মই 'কলম' ও কিতাবের নামে শপথ করা হয়েছে। অর্থাৎ অহী লেখক ফেরেশতাদের হাত দিয়ে কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ হচ্ছে। কুরআন মজীদ ফেরেশতাদের হাতে লিপিবদ্ধ হওয়াই কাফেরদের এ অভিযোগ যিথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, নাউয়বিগ্রাহ, রসূলগ্রাহ সাগ্রাহার আলাইহি ওয়া সাগ্রাম পাগল। নূরওয়াত দাবী করার পূর্বে যক্কাবাসীরা নবী সাগ্রাহার আলাইহি ওয়া সাগ্রামকে কওমের সর্বশেষ মানুষ মনে করতো। তারা তাঁর দীনদারী, আমানতদারী, বিবেক-বৃদ্ধি ও দুরদশিতার ওপর আহ্বাশীল ছিলো। কিন্তু তিনি তাদের সামনে কুরআন মজীদ পেশ করতে শুরু করলে তারা তাঁকে পাগল বলে অভিহিত করতে লাগলো। এর সোজা অর্থ হলো, রসূলের (সা) প্রতি পাগল হওয়ার যে অপবাদ তারা আরোপ করতো তাদের দৃষ্টিতে তার মূল কারণ ছিলো কুরআন। তাই বলা

হয়েছে, কুরআনই এ অপবাদের অসারতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। তিনি পাগল হয়ে গিয়েছেন একথা প্রমাণ করা তো দূরে থাক অতি উচ্চমানের বিশুদ্ধ ও অলংকারপূর্ণ ভাষায় এরূপ উন্নত বিষয়বস্তু পেশ করাই বরং একথা প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানী বর্ষিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো বাহ্যিকভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোধন করে বক্তব্য পেশ করা হলেও মূল লক্ষ হলো কাফেরদেরকে তাদের অপবাদের জবাব দেয়া। অতএব, কারো মনে যেন এ সন্দেহ দানা না বাঁধে যে, এ আয়াতটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পাগল নন এ মর্মে তাকে সাল্লানা দেয়ার জন্য নাযিল হয়েছে। নবী (স) নিজের সম্পর্কে এমন কোন সন্দেহ পোষণ করতেন না যা নিরসনের জন্য তাঁকে এরূপ সাল্লানা দেয়ার প্রয়োজন ছিলো। বরং এর লক্ষ কাফেরদেরকে এতোটুকু জানিয়ে দেয়া যে, কুরআনের কারণে তোমরা কুরআন পেশকারীকে পাগল বলে আখ্যায়িত করছো। তোমাদের এ অভিযোগ যে যিথ্যা ও তিউহান খোদ কুরআনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। (আরো বেশী জানতে হলে দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা তৃতৃ, টীকা ২২)

৩. অর্থাৎ এ জন্য তাঁকে দেয়া হবে অগণিত ও চিরস্থায়ী নিয়ামত। কারণ আল্লাহর বান্দাদের হিদায়াতের জন্য তিনি চেষ্টা-সাধনা করছেন। বিনিময়ে তাঁকে নানা রকম কষ্টদায়ক কথা শুনতে হচ্ছে। এসব সত্ত্বেও তিনি তাঁর এ কর্তব্য পালন করে চলেছেন।

৪. এখানে এ আয়াতটির দু'টি অর্থ। একটি হলো, আপনি নৈতিক চরিত্রের সর্বোচ্চ মানের উপর অধিষ্ঠিত। তাই আপনি আল্লাহর বান্দাদের হিদায়াতের কাজে এতো দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করছেন। একজন দুর্বল নৈতিক চরিত্রের মানুষ এ কাজ করতে সক্ষম হতো না। অন্যটি হলো, কাফেররা আপনার প্রতি পাগল হওয়ার যে অপবাদ আরোপ করছে তা যিথ্যা হওয়ার আরেকটি সুস্পষ্ট প্রমাণ আপনার উন্নত নৈতিক চরিত্র। কারণ উন্নত নৈতিক চরিত্র ও মতিষ্ঠ বিকৃতি একসাথে একই ব্যক্তির মধ্যে থাকতে পারে না। যার বৃক্ষি-বিবেক ও চিন্তার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে এবং মেজাজে সমতা নেই সে-ই পাগল। পক্ষান্তরে মানুষের উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রমাণ করে যে, তার মতিষ্ঠ ও বিবেক-বৃক্ষি ঠিক আছে এবং সে সুস্থ ও স্বাতীবিক। তার মন-মানস ও মেজাজ অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈতিক চরিত্র কেমন তা মুক্তির লোকদের জানা ছিল না। তাই এদিকে শুধু একটু ইংগিত দেয়াই যথেষ্ট। এতেই মুক্তির প্রতিটি বিবেকসম্পর্ক মানুষ চিন্তা করতে বাধ্য হবে যে, তারা কতই নির্লজ্জ। নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে এতো উন্নত একজন মানুষকে তারা পাগল বলে আখ্যায়িত করছে। তাদের এ অর্থহীন কথাবার্তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নয় বরং তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর। কারণ শক্রতার আক্রমণে উন্মুক্ত হয়ে তারা তাঁর সম্পর্কে এমন কথা বলছিলো, যা কোন বিবেকবান ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারে না। এ যুগের জ্ঞান-গবেষণার দাবীদারদের ব্যাপারও ঠিক তাই। তারাও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মৃগী রোগগত্ব ও বিকৃত মতিষ্ঠ হওয়ার অপবাদ আরোপ করছে। দুনিয়ার সব জ্যায়গায় কুরআন শরীফ পাওয়া যায় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন বৃত্তান্ত সবিস্তারে লিপিবদ্ধ আছে। যে কোন লোক তা অধ্যয়ন করলেই বুঝতে পারবে যে, এ অনুপম গ্রন্থ পেশকারী এবং এরূপ উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী

فَلَا تُطِعُ الْمُكَلِّبِينَ<sup>৫</sup> وَدَوْالَوْتِلِهِنْ فِي لِهِنْوَنَ<sup>৬</sup> وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَافِ  
 هَمِّيْنِ<sup>৭</sup> هَمِّا زِمَّشَاءِ بِنِمِّيْرِ<sup>৮</sup> مَنَاعِ لِلخِيرِ مَعْتَلِ أَثِيْرِ<sup>৯</sup> عَتَلِ بَعْدَ ذَلِكَ  
 زِنِّيْرِ<sup>১০</sup> أَنْ كَانَ ذَامَالِ وَبِنِّيْنِ<sup>১১</sup> إِذَا تَتَلَى عَلَيْهِ أَيْتَنَا قَالَ أَسَاطِيرِ<sup>১২</sup>  
 الْأَوَّلِيْنِ<sup>১৩</sup> سَنِسِمَهُ عَلَى الْخَرْطُومِ<sup>১৪</sup>

কাজেই তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করো না। তারা তো চায় তুমি নমনীয়তা দেখালে তারাও নমনীয়তা দেখাবে।<sup>৫</sup> তুমি অবদিত হয়ো না তার দ্বারা যে কথায় কথায় শপথ করে, যে মর্যাদাহীন,<sup>৬</sup> যে গীবত করে, চোগল খোরী করে বেড়ায়, কল্যাণের কাজে বাধা দেয়,<sup>৭</sup> জুলুম ও বাড়াবাড়িতে সীমালংঘন করে, চরম পাপিষ্ঠ ঝাগড়াটে ও হিংস্ত<sup>৮</sup> এবং সর্বোপরি বজ্জাত,<sup>৯</sup> কারণ সে সম্পদশালী ও অনেক সভানের পিতা<sup>১০</sup> তাকে যখন আমার আয়তসমূহ শোনানো হয় তখন সে বলে এ তো প্রাচীনকালের কিস্সা-কাহিনী। শিগগীরই আমি তার শুরু দাগিয়ে দেবো।<sup>১১</sup>

মানুষটিকে মানসিক রোগী বলে আখ্যায়িত করে তারা শক্রতার অক্ষ আবেগে আক্রান্ত হয়ে কি ধরনের অর্থহীন ও হাস্যকর প্রলাপ বকে চলেছে।

রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈতিক চরিত্রের সর্বোক্তম সংজ্ঞা দিয়েছেন শ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা। তিনি বলেছেন :  
 كَانَ خَلْقَهَا الْقَرَانَ  
 كَرْأَنَاهِي ছিলো তাঁর চরিত্র। ইমাম আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী ও ইবনে জারীর সামান্য কিছু শাদিক তারতম্যসহ তাঁর এ বাণীটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। এর মানে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার সামনে শুধু কুরআনের শিক্ষাই পেশ করেননি। বরং তিনি নিজেকে তার জীবন্ত নমুনা হিসেবে পেশ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কুরআনে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে সবার আগে তিনি নিজে সে মোতাবেক কাজ করেছেন। এতে যেসব বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে তিনি নিজে তা সবার আগে বর্জন করেছেন। কুরআন মজীদে যে নৈতিক শুণাবলীকে মর্যাদার কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেসব শুণে তিনি ছিলেন সবার চেয়ে বেশী শুণানিত। আর কুরআন মজীদে যেসব বিষয়কে অপছন্দনীয় আখ্যায়িত করা হয়েছে তিনি নিজে ছিলেন তা থেকে সবচেয়ে বেশী মুক্ত। আরেকটি বর্ণনায় হ্যরত আয়েশা বলেন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোন খাদেমকে মারেননি, কোন নারীর গায়ে হাত তোলেননি, জিহাদের ক্ষেত্রে ছাড়া নিজ হাতে কখনো কাউকে হত্যা করেননি।<sup>১২</sup> তাঁকে কেউ কষ্ট দিয়ে থাকলে তিনি কখনো তার প্রতিশোধ নেননি। কেবল আল্লাহর হারাম করা বিষয়ে সীমালংঘন করলে

১. সীরাতে ইবনে হিশাম সংক্ষিপ্ত সংক্ষরণ বাংলা অনুবাদ পৃষ্ঠা-১৯২ দেখুন। (অনুবাদক)

১. তিনি তার শাস্তি দিয়েছেন। তাঁর নীতি ছিলো, কোন দু'টি বিষয়ের একটি গ্রহণ করতে হলে তা যদি গোনাহর কাজ না হতো তাহলে তিনি সহজতর বিষয়টি গ্রহণ করতেন। গোনাহর কাজ থেকে তিনি সবচেয়ে বেশী দূরে থাকতেন। (মুসনাদে আহমাদ) হয়রত আনাস বর্ণনা করেছেন, আমি দশ বছর যাবত রস্তাহার খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। আমার কোন কাজ সম্পর্কে তিনি কখনো উহ। শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। আমার কোন কাজ দেখে কখনো বলেননি : তুমি এ কাজ করলে কেন? কিংবা কোন কাজ না করলে কখনো বলেননি : তুমি এ কাজ করলে না কেন? (বুধারী ও মুসলিম)

৫. অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের কাজে তুমি কিছু শিখিলতা দেখালে এরাও তোমার বিরোধিতায় কিছুটা নমনীয়তা দেখাবে। কিংবা তাদের গোমরাহীকে প্রশ্ন দিয়ে যদি দীনের মধ্যে কিছুটা কাটছাট করতে রাজী হয়ে যাও তাহলে এরাও তোমার সাথে আপোষ রফা করে নেবে।

৬. মূল আয়তে **مَنْأَعْ لِلْخَيْرِ** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি নগণ্য, তুচ্ছ এবং নীচু লোকদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এটা কথায় কথায় শপথকারী ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট। সে কথায় কথায় কসম থায়। কারণ সে নিজেই বুঝে যে, লোকে তাকে মিথ্যাবাদী মনে করে। কসম না খাওয়া পর্যন্ত লোকে তাকে বিশ্বাস করবে না। তাই সে নিজের বিবেকের কাছে ইন এবং সমাজের কাছেও তার কোন মর্যাদা নেই।

৭. আয়তে **مَنْأَعْ لِلْخَيْرِ** ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় অর্থ-সম্পদ ও যাবতীয় ভাল কাজকেও ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাই শব্দটিকে যদি অর্থ-সম্পদ অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার মানে হবে সে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা এবং কৃপণ। কাউকে কানাকড়ি দেয়ার মত উদারতা এবং মন-মানসও তার নেই। আর যদি **خَيْر** শব্দটি নেকী ও ভাল কাজের অর্থে গ্রহণ করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তার একটি অর্থ হতে পারে, সে প্রতিটি কল্যাণের কাজে বাধা সৃষ্টি করে। আরেকটি অর্থ হতে পারে সে ইসলাম থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে অত্যন্ত তৎপর।

৮. আয়তে ব্যবহৃত মূল শব্দ হলো **عَنْلَى**। আরবী ভাষায় এন্টল বলা হয় এমন লোককে যে অত্যন্ত সুঠামদেহী ও অধিকমাত্রায় পানাহারকারী। অধিকতু চরম দুঃখিতি, ঝগড়াটো এবং হিস্ত ও পায়ণ।

৯. মূল আয়তে **رَبِّيْم** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবদের ভাষায় এ শব্দটি এমন অবৈধ স্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে পরিবারের লোক নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে অতরভুক্ত হয়ে গিয়েছে। সাইদ ইবনে জুবাইর এবং শা'বী বলেন : এ শব্দটি এমন লোকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যে তার অন্যায় ও দুঃক্ষেত্রের কারণে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

এসব আয়তে বর্ণিত বৈশিষ্টগুলো যে ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে তার সম্পর্কে মুফাস্সিরগণ তিনি তিনি মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন যে, সে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা। কেউ আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুসের নাম উল্লেখ করেছেন। কেউ আখনাস ইবনে শুরাইককে এই ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করেছেন। আবার কেউ কেউ অন্য কিছু ব্যক্তির প্রতিও ইঞ্চিত করেছেন। কিন্তু কুরআন মজিদে তার নাম উল্লেখ না করে শুধু বৈশিষ্টগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় এসব বৈশিষ্টের কারণে সে মকাব বেশ পরিচিত ছিল।

إِنَّا بِلُونَهُمْ كَمَا بِلُونَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذَا قُسِّمُوا لِيَصِرُّ مِنْهُمْ صِبَحِينَ<sup>১১</sup> وَلَا  
يَسْتَئْنُونَ<sup>১২</sup> فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُرَّ نَائِمُونَ<sup>১৩</sup> فَأَصْبَحَتْ  
كَالصَّرِيرِ<sup>১৪</sup> فَتَنَادَوْ أَصْبَحِينَ<sup>১৫</sup> أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كَنْتُمْ  
صَرِمِينَ<sup>১৬</sup> فَانْطَلَقُوا وَهُرِيتَخَافِنُونَ<sup>১৭</sup> أَنْ لَا يَلِ خَلْنَاهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ  
مِسْكِينِ<sup>১৮</sup>

আমি এদের (মক্কাবাসী)-কে পরীক্ষায় ফেলেছি যেভাবে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম।<sup>১২</sup> বাগানের মালিকদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা খুব তোরে গিয়ে অবশ্যি নিজেদের বাগানের ফল আহরণ করবে। তারা এ ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রমের সজ্ঞাবনা স্থীকার করছিলো না।<sup>১৩</sup> অতপর তোমার রবের পক্ষ থেকে একটা বিপর্যয় এসে সে বাগানে ঢাও হলো। তখন তারা ছিলো নিদ্রিত। বাগানের অবস্থা হয়ে গেলো কর্তিত ফসলের ন্যায়। তোরে তারা একে অপরকে ডেকে বললো : তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তাহলে সকাল সকাল ফসলের মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়ো।<sup>১৪</sup> সুতরাং তারা বেরিয়ে পড়লো। তারা নীচু গলায় একে অপরকে বলছিলো, আজ যেন কোন অভাবী লোক বাগানে তোমাদের কাছে না আসতে পারে।

তাই তার নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল না। এসব বৈশিষ্ট উল্লেখ করা মাত্র যে কোন লোক বুঝতে পারতো, কার প্রতি ইঁগিত করা হচ্ছে।

১০. এ আয়াতটির সম্পর্ক পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর সাথেও হতে পারে এবং পরের আয়াতের সাথেও হতে পারে। পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থ হবে, বিপুল অর্ধ-সম্পদ এবং অনেক সন্তান আছে বলে এ ধরনের লোকের দাপট ও প্রভাব-প্রতিপত্তি মেনে নিয়ো না। পরবর্তী আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অর্থ হবে, বিপুল অর্ধ-সম্পদ ও অনেক সন্তান থাকার কারণে সে অহংকারী হয়েছে। তাকে আমার আয়াত শুনলে সে বলে এসব তো প্রাচীনকালের কিস্মা কাহিনী মাত্র।

১১. সে যেহেতু নিজেকে খুব মর্যাদাবান মনে করতো তাই তার নাককে শুরু বলা হয়েছে। নাক দাগিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে লাক্ষ্মিত করা। অর্থাৎ আমি তাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গাতেই এমন লাক্ষ্মিত ও অপমানিত করবো যে, এ লাক্ষ্মনা ও অপমান থেকে সে কখনো নিঙ্কতি পাবে না।

وَغَلَّ وَأَعْلَى حَرْدِ قُدْرَيْنَ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لِضَالُونَ ۝ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلْمَرْأَقْلُ لَكُمْ لَوْلَا تَسِّحُونَ ۝ قَالَ لَمَّا سَبَخُنْ رَبِّنَا إِنَّا كَنَّا ظَلَمِينَ ۝ فَاقْبِلْ بِعِصْمِهِمْ عَلَى بَعْضِ يَتَّلَوْمُونَ ۝ قَالُوا يُوَلِّنَا إِنَّا كَنَّا طَغِيْنَ ۝ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يَبْلِغَنَا خِيرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ۝ كَنْ لِكَ الْعَزَّابُ وَلَعْنَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ مَلَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

তারা কিছুই না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে খুব ভোরে এমনভাবে দ্রুত<sup>১৫</sup> সেখানে গেল যেন তারা (ফল আহরণ করতে) সক্ষম হয়। কিন্তু বাগানের অবস্থা দেখার পর বলে উঠলো : আমরা রাস্তা ভুলে গিয়েছি। তাও না—আমরা বরং বঞ্চিত হয়েছি।<sup>১৬</sup> তাদের মধ্যকার সবচেয়ে ভাল লোকটি বললো : আমি কি তোমাদের বনিনি তোমরা 'তাসবীহ' করছো না কেন?<sup>১৭</sup> তখন তারা বলে উঠলো : আমাদের রব অতি পবিত্র। বাস্তবিকই আমরা গোনাহগার ছিলাম। এরপর তারা সবাই একে অপরকে তিরঙ্গার করতে লাগলো।<sup>১৮</sup> অবশেষে তারা বললো : "আমাদের এ অবস্থার জন্য আফসোস! আমরা তো বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিলাম। বিনিময়ে আমাদের রব হয়তো এর চেয়েও ভাল বাগান আমাদের দান করবেন। আমরা আমাদের রবের দিকে ঝুঁজু করছি।" আয়াব এরপই হয়ে থাকে। আখেরাতের আয়াব এর চেয়েও বড়। হায়! যদি তারা জানতো।

১২. এখানে সূরা কাহাফের পঞ্চম রূপকুরুর আয়াতগুলো সামনে রাখতে হবে। সেখানেও একইভাবে উপদেশ দেয়ার জন্য দুই বাগান মালিকের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

১৩. অর্থাৎ নিজেদের ক্ষমতা ও যোগ্যতার ওপর তাদের এমন আস্থা ছিল যে, শপথ করে দ্বিধাহীন চিন্তে বলে ফেললো, কালকে আমরা অবশ্যই আমাদের বাগানের ফল আহরণ করবো। আগ্নাহর ইচ্ছা ধাকলে আমরা এ কাজ করবো এতটুকু কথা বলার প্রয়োজনও তারা বোধ করেনি।

১৪. এখানে ক্ষেত শব্দ ব্যবহার করার কারণ সংজ্ঞবত এই যে, বাগানে বৃক্ষরাজির ফাঁকে ফাঁকে কৃষিক্ষেতও ছিলো।

১৫. আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হলো **عَلَى حَرْدٍ**। আরবী ভাষায় **شَدَّ** বাধা দান করা এবং না দেয়া বুঝাতেও বলা হয়, ইচ্ছা এবং সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত বুঝাতেও বলা হয় এবং তাড়াহড়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সূতরাং শব্দটি অনুবাদ করতে আমরা তিনটি অর্থের প্রতিই সক্ষ রেখেছি।

إِنَّ لِلْمُتَقِينَ عِنْدَ رِبِّهِمْ جَنَّتٌ النَّعِيرُ ۝ أَفَنْجَلَ الْمُسْلِمِينَ  
 كَالْمَجْرِيِّينَ ۝ مَا لَكُمْ تَقْرِيقٌ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ أَلَا كُمْ كِتَابٌ فِيهِ  
 تَدْرِسُونَ ۝ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَهَا تَخْرِيفٌ ۝ أَلَا كُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْغَةٍ إِلَى  
 يَوْمِ الْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَهَا تَحْكُمُونَ ۝ سَلَّمُوا يَهُمْ بِنِ لَكَ زَعِيمٌ ۝ أَلَا لَهُمْ  
 شَرَكَاءٌ فَلِيَا تُوَبِّشُ كَائِنُهُمْ إِنْ كَانُوا صِرْقِينَ ۝

## ২ রুক্তি

নিশ্চিতভাবে<sup>১৯</sup> মুত্তাকীদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে নিয়ামত ভরা জান্নাত। আমি কি অনুগতদের অবস্থা অপরাধীদের মতো করবো? কি হয়েছে তোমাদের? এ ক্ষেত্রে বিচার তোমরা করছো?<sup>২০</sup> তোমাদের কাছে কি কোন কিতাব<sup>২১</sup> আছে যাতে তোমরা পাঠ করে থাকো যে, তোমাদের জন্য সেখানে তাই আছে যা তোমরা পছন্দ করো। তোমাদের সাথে কি আমার কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন চুক্তি আছে যে, তোমরা নিজের জন্য যা চাইবে সেখানে তাই পাবে? তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো এ ব্যাপারে কে দায়িত্বশীল<sup>২২</sup>? কিংবা তাদের স্বনিয়োজিত কিছু অংশীদার আছে কি (যারা এ বিবরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে)? তারা তাদের সেসব অংশীদারদের নিয়ে আসুক। যদি তারা সত্যবাদী<sup>২৩</sup> হয়ে থাকে।

১৬. অর্থাৎ বাগান দেখে প্রথমে তারা বিশ্বাসই করতে পারেনি যে, সেটিই তাদের বাগান। তাই তারা বলেছে, আমরা পথ ভুলে হয়েতো অন্য কোথাও এসে পৌছেছি। পরে চিন্তা করে যখন তারা বুঝতে পারলো সেটি তাদের নিজেদেরই বাগান তখন চিন্কার করে বলে উঠলো : আমাদের কপাল পুড়ে গেছে!

১৭. এর মানে যখন তারা শপথ করে বলছিলো যে, আগামী দিন আমরা অবশ্যই বাগানের ফল আহরণ করবো তখন এ ব্যক্তি তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলো। সে বলেছিলো, তোমরা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছো। তোমরা ইনশাআল্লাহ বলছো না কেন? কিন্তু তারা সে কথায় কর্ণপাতও করলো না। পুনরায় যখন তারা দৃষ্ট ও অসহায়দের কিছু না দেয়ার জন্য সলাপরামর্শ করছিলো তখনো সে তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বললো : আল্লাহর কথা শ্রবণ করো এবং এ খারাপ মনোভাব পরিত্যাগ করো। কিন্তু তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল রইলো।

১৮. অর্থাৎ তারা একে অপরকে এই বলে দোষারোপ করতে শুরু করলো, আমরা অমুকের প্ররোচনায় আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলাম এবং এ কুমতলব এঁটেছিলাম।

يَوْمَ أَيْكُشْفُ عَنِ سَاقٍ وَيَلْعُونَ إِلَى السَّجْدَةِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ<sup>৪৮</sup> خَائِشَةً  
 أَبْصَارُهُمْ تَرْهِقُهُمْ ذَلَّةٌ وَقَلْ كَانُوا يَلْعُونَ إِلَى السَّجْدَةِ وَهُرَسِّلُونَ<sup>৪৯</sup>  
 فَلَرْزِيٍّ وَمِنْ يَكْنِبْ بِهِنَّ الْحَلِيْثِ سَنْسَتِلْ رِجْهَمِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ<sup>৫০</sup>  
 وَأَمْلَى لَهُمْ إِنْ كَيْلَى مِتْيَنَ<sup>৫১</sup>

যেদিন কঠিন সময় এসে পড়বে<sup>৪৮</sup> এবং সিজদা করার জন্য লোকদেরকে ডাকা হবে। কিন্তু তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি হবে অবনত। হীনতা ও অপমানবোধ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এর আগে যখন তারা সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলো তখন সিজদার জন্য তাদেরকে ডাকা হতো (কিন্তু তারা অঙ্গীকৃতি জানাতো)।<sup>২৫</sup>

তাই হে নবী! এ বাণী অঙ্গীকারকারীদের ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দাও।<sup>২৬</sup> আমি ধীরে ধীরে এমনভাবে তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো যে, তারা বুঝতেই পারবে না।<sup>২৭</sup> আমি এদের রশি চিলে করে দিছি। আমার কৌশল<sup>২৮</sup> অত্যন্ত মজবুত।

১৯. মকার বড় বড় নেতারা মুসলমানদের বলতো, আমরা দুনিয়াতে যেসব নিয়ামত লাভ করছি তা প্রমাণ করে যে, আমরা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আর তোমরা যে দুর্দশার মধ্যে ডুবে আছো তা প্রমাণ করে যে, তোমরা আল্লাহর কাছে অভিশঙ্গ। তোমাদের বক্তব্য অনুসূতে আখ্রোত যদি হয়ও তাহলে সেখানেও মজা লুটবো আমরা। আয়াব তোগ করলে তোমরা করবে, আমরা নই। এ আয়াতগুলোতে একথারই জবাব দেয়া হয়েছে।

২০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অনুগত ও অপরাধীর মধ্যে কোন পার্থক্য করবেন না, এটা বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী। বিশাল বিশ্ব-জাহানের স্তুষ্টা এমন বিচার-বুদ্ধিহীন হবেন, এটা তোমরা ধারণা করলে কিভাবে? তোমরা মনে করে নিয়েছো, এ পৃথিবীতে কারা তাঁর হকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান মেনে চললো এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকলো আর কারা তাঁর তোয়াক্তা না করে সব রকমের গোনাহ, অপরাধ এবং জুনুম-অত্যাচার চালালো তা তিনি দেখবেন না। তোমরা ইমানদারদের দুর্দশা ও দূরবহু এবং নিজেদের স্বাচ্ছন্দ ও সচ্ছলতা দেখতে পেয়েছো ঠিকই কিন্তু নিজেদের এবং তাদের নৈতিক চরিত্র ও কাজ-কর্মের পার্থক্য তোমাদের নজরে পড়েনি। তাই আগাম বলে দিয়েছো যে, আল্লাহর দরবারেও এসব অনুগতদের সাথে অপরাধীদের ন্যায় আচরণ করা হবে। কিন্তু তোমাদের মত পাপীদের দেয়া হবে জানাত।

২১. অর্থাৎ আল্লাহর পাঠানো কিতাব।

২২. مُلْ أَوْيَاتِهِ زَعِيمٌ شَدِيدٌ بَرَّ بَرَّ بَرَّ بَرَّ  
ব্যক্তিকে যে কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল কিংবা কোন গোষ্ঠী বা দলের মুখ্যপাত্র। কথাটার মানে হলো, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কি এমন দাবী করে যে, সে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে এ বিষয়ে প্রতিশ্রূতি আদায় করে নিয়েছে?

২৩. أَرْثَاءِ نِجَادِهِ رَمَرَأَةِ بَلَّهِ تَوَمَّرَةِ  
বিবেক-বৃক্ষিকেও পরিপন্থী। আল্লাহর কোন কিতাবে এরপ লেখা আছে বলেও তোমরা দেখাতে পারবে না। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ এরপ দাবীও করতে পারে না। এ মর্মে আল্লাহর নিকট থেকে কোন রকম প্রতিশ্রূতি লাভ করেছে বলেও তোমাদের মধ্য থেকে কেউ দাবী করতে পারে না। কিংবা তোমরা যদেরকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছো তাদের কাউকে দিয়ে একথাও তোমরা বলতে পারবে না যে, সে আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদেরকে জানাত দেয়ার দায়িত্ব ও ক্ষমতা লাভ করেছে। এসব সত্ত্বেও তোমরা কি করে এ ভাস্ত ধারণার শিকার হলে?

২৪. مُلْ أَوْيَاتِهِ زَعِيمٌ عَنْ سَاقٍ يُكْشَفُ  
“যেদিন পায়ের গোছা অনাবৃত করা হবে।” সাহাবা ও তাবেরীগণের এক দলের মতে একথাটি প্রচলিত প্রবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী প্রবাদে দুর্দিনের আগমনকে “পায়ের গোছা অনাবৃত করা” বলে বুঝানো হয়। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাসও কথাটির একই অর্থ বর্ণনা করেছেন। আরবী ভাষা থেকে তিনি এর ব্রহ্মক্ষে প্রমাণও পেশ করেছেন। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস এবং রাবী ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত অপর একটি ব্যাখ্যায় ‘পায়ের গোছা অনাবৃত’ করার অর্থ করা হয়েছে সত্যকে আবরণ মুক্ত করা। এ ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থ হবে, যেদিন সব সত্য উন্মুক্ত হবে এবং মানুষের সব কাজ কর্ম স্পষ্ট হয়ে সামনে আসবে।

২৫. এর মানে হলো দুনিয়াতে কে আল্লাহ তা�'আলার ইবাদাত করতো আর কে তার বিরোধী ছিলো কিয়ামতের দিন প্রকাশ্যে তা দেখানো হবে। এ উদ্দেশ্যে লোকদেরকে আল্লাহ তা�'আলার সামনে সিজদাবন্ত হওয়ার আহবান জানানো হবে। যারা দুনিয়াতে আল্লাহর ইবাদাত করতো তারা সাথে সাথে সিজদায় পড়ে যাবে। কিন্তু দুনিয়াতে যারা আল্লাহকে সিজদা করেনি তাদের কোমর শক্ত ও অনমনীয় হয়ে যাবে। তাদের পক্ষে ইবাদাতগুজার বাদ্য হওয়ার মিথ্যা প্রদর্শনী করা সম্ভব হবে না। তারা জাঞ্জিত ও অপমানিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

২৬. أَرْثَاءِ تَادِهِ بُرْخَابَدَّا كَرَّارَ  
অর্থাত তাদের সাথে বুর্খাপড়া করার চিন্তা করো না। তাদের সাথে বুর্খাপড়া করা আমার কাজ।

২৭. أَرْجَلَاتِسَارِ কাউকে খৎসের দিকে ঠেলে দেয়ার পছ্ন্য হলো ন্যায় ও সত্যের দুশ্মন এবং জালেমকে এ পৃথিবীতে অধিক পরিমাণে বিলাস সামগ্ৰী, স্বাস্থ্য, অর্থ-সম্পদ, সত্ত্বান-সন্তুতি ও পার্থিব সাফল্য দান করা যাতে সে ধোকায় পড়ে যায় এবং মনে করে বসে যে, সে যা করছে ঠিকই করছে। তার কাজে কোন ত্রুটি-বিচুতি নেই। এভাবে সে ন্যায় ও সত্যের সাথে শক্রতা এবং জ্লুম-অত্যাচার ও সীমালংঘনের কাজে অধিক মাত্রায় মেতে ওঠে এবং বুঝেই উঠতে পারে না যে, যেসব নিয়ামত সে লাভ করছে তা পূরক্ষার নয়, বরং খৎসের উপকরণ মাত্র।

٦٣) أَتَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مُغْرِيْمٍ إِمْتَقْلُونَ ٦٤) أَمْ عِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتَبُونَ  
فَأَصْبِرْ لِحَكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحَوْنَ مِإِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ٦٥)  
لَوْلَا أَنْ تَدْرِكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنْيَنَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مُلْمَ مُوَأْ ٦٦) فَاجْتَبِهِ رَبِّهِ  
فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٦٧) وَإِنْ يَكُادُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَيْزَ لَقُولَكَ بِأَبْصَارِهِمْ  
لَمَا سَمِعُوا الَّذِينَ كَرُوْيَقُولُونَ إِنَّهُ لِمَجْنُونٌ ٦٨) وَمَا هُوَ إِلَّا ذَكْرٌ لِلْعَلَمِينَ

তুমি কি এদের কাছে কোন পারিথমিক দাবী করছো যে, সে জরিমানার বোবা তাদের কাছে দুর্বহ হয়ে পড়েছে? <sup>১৯</sup> তাদের কি গায়েবের বিষয় জানা আছে, যা তারা নিখে রাখছে? <sup>২০</sup> অতএব তোমার রবের চূড়ান্ত ফায়সালা পর্যন্ত ধৈর্যসহ অপেক্ষা করো<sup>২১</sup> এবং মাছওয়ালার (ইউনুস আলাইহিস সালাম) মতো<sup>২২</sup> হয়ো না, যখন সে বিশাদ ভারাক্রান্ত<sup>২৩</sup> হয়ে ডেকেছিলো। তার রবের অনুগ্রহ যদি তার সহায়ক না হতো তাহলে সে অপমানিত হয়ে খোলা প্রান্তরে নিষ্কিঞ্চ হতো। <sup>২৪</sup> অবশেষে তার রব তাকে বেছে নিলেন এবং নেক বাল্দাদের অত্তরভুক্ত করলেন।

এ কাফেররা যখন উপদেশবাণী (কুরআন) শোনে তখন এমনভাবে তোমার দিকে তাকায় যেন তোমার পদ্মযুগল উৎপাটিত করে ফেলবে<sup>৩৫</sup> আর বলে যে, এ তো অবশ্যি পাগল। অথচ তা সারা বিশ্ব-জাহানের জন্য উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৮. আয়াতে **কী** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো কারো বিরুদ্ধে গোপনে ব্যবহৃত গ্রহণ করা। কাউকে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হলে তা বুব খারাপ কাজ। অন্যথায় এরূপ কাজে কোন দোষ নেই। বিশেষ করে কোন ব্যক্তি যদি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে এরূপ করার বৈধতা সৃষ্টি করে নিজেকে এর উপর্যুক্ত বানিয়ে নেয়।

୨୯. ଏଥାନେ ଦୃଶ୍ୟତ ରମ୍ଭଲ୍ଲାହ ସାନ୍ତ୍ରାହ ଆଲାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରା ହଛେ । ତବେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ ସେବା ଲୋକ ଯାରା ତୌର ବିରୋଧିତାର କ୍ଷେତ୍ରେ ସୀମାଲଂଘନ କରାଇଲୋ । ତାଦେରକେ ବଲା ହଛେ: ଆମର ରମ୍ଭ କି ତୋମାଦେର କାହେ କୋନ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦାବୀ କରାଇନ ଯେ କାରଣେ ତୋମରା ଏତଟା ବିଗଡ଼େ ଗିଯେଛେ? ତୋମରା ଜାନୋ, ତିନି ଏକଜନ ନିଷ୍ଠାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି । ତିନି ତୋମାଦେର କାହେ ଯା ପେଶ କରାଇନ ତାତେ ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଆହେ ବଲେ ତିନି ମନେ କରେନ । ଆର ଏ ଜନ୍ୟ ତିନି ତା ପେଶ କରାଇନ । ତୋମରା ନା ଚାଇଲେ ତା ମାନବେ ନା । କିନ୍ତୁ ଏର ପ୍ରଚାର ଓ ତାବଳୀଗେର ବ୍ୟାପାରେ ଏତଟା କ୍ଷିତି ହୁୟେ ଉଠିଛୋ କେନ? (ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଜନ୍ୟ ଦେଖୁନ ତାଫୁରୀମଲ କୁରାନ, ସୁରା ତର, ଟିକା ୩୧)

০।

০।

৩০. এ প্রশ্নটিও বাহ্যত রসূলগ্রাহ সাল্লাগ্রাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করা হয়েছে। কিন্তু আসলে প্রশ্নটি তাঁর বিরোধীদের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, তোমরা কি গায়েবের পর্দার অন্তরালে উকি দিয়ে দেখে নিয়েছো যে, প্রকৃতপক্ষে তিনি আল্লাহর প্রেরিত রসূল নন। আর যেসব সত্য তিনি তোমাদের কাছে বর্ণনা করছেন তাও ঠিক নয়। তাই তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করার জন্য তোমরা এমন কোমর বেঁধে লেগেছো? (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা তৃতীয়ের তাফহীমীর, টীকা ৩২)

৩১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তোমাদের বিজয় ও সাহায্য দেয়া এবং তোমাদের এসব বিরোধীদের পরাজিত করার চূড়ান্ত ফায়সালার সময় এখনও বহু দূরে। চূড়ান্ত ফায়সালার সে সময়টি আমার পূর্ব পর্যন্ত এ দীনের তাবলীগ ও প্রচারের পথে যত দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবত আসবে তা ধৈর্যের সাথে বরদাশত করতে থাকো।

৩২. অর্থাৎ ইউনুস আলাইহিস সালামের মত অধৈর্য হয়ে পড়ো না। অধৈর্য হয়ে পড়ার কারণে তাঁকে মাছের পেটে যেতে হয়েছিলো। আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা না আসা পর্যন্ত রসূলগ্রাহ সাল্লাগ্রাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়ার পরক্ষণেই “ইউনুস আলাইহিস সালামের মত হয়ো না” বলা থেকে স্বতই ইংরিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা আসার আগেই তিনি অধৈর্য হয়ে কোন কাজ করে ফেলেছিলেন এবং এভাবে আল্লাহর অস্তুষ্টি লাভ করেছিলেন। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত ১৮, টীকা ১৯; সূরা আল আবিয়া, আয়াত ৮৭-৮৮, টীকা ৮২ থেকে ৮৫; সূরা আস সাফ্ফাত, আয়াত ১৩৯ থেকে ১৪৮, টীকা ৭৮ থেকে ৮৫।

৩৩. সূরা আবিয়াতে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মাছের পেটের এবং সাগরের পানির অঙ্কুরে হ্যারত ইউনুস আলাইহিস সাল্লাম উচ্চস্থুরে এ বলে প্রার্থনা করলেন : ﴿إِلَهِيْ أَنْتَ سُبْحَنْكَ أَنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ তোমার পবিত্র সন্তা ছাড়া আর কের্ন ইলাহ নেই। আসলে “আমিই অপরাধী”। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফরিয়াদ গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে এ দুঃখ ও মুসিবত থেকে মুক্তি দান করলেন। (আয়াত ৮৭-৮৮)

৩৪. এ আয়াতটিকে সূরা সাফ্ফাতের ১৪২ থেকে ১৪৬ পর্যন্ত আয়াতগুলোর পাশাপাশি রেখে পড়লে দেখা যাবে যে, যে সময় হ্যারত ইউনুস মাছের পেটে নিষ্কিন্ত হয়েছিলেন তখন তিনি তিরঙ্কারের পাত্র ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি আল্লাহর তাসবীহ করলেন এবং নিজের অপরাধ শীকার করলেন তখন তাঁকে মাছের পেট থেকে বের করে অসুস্থ অবস্থায় একটি উন্মুক্ত ভূঢ়েলের ওপর নিষ্কেপ করা হলো। কিন্তু সে মুহূর্তে তিনি আর তিরঙ্কারের পাত্র নন। মহান আল্লাহ তা'র রহমতে সে জায়গায় একটি লতানো গাছ উৎপন্ন করে দিলেন, যাতে এ গাছের পাতা তাঁকে ছায়াদান করতে পারে এবং এর ফল খেয়ে তিনি ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্ত করতে পারেন।

৩৫. আমরা বলে থাকি, অমুক ব্যক্তি তাঁর প্রতি এমনভাবে তাকালো যেন তাঁকে খেয়ে ফেলবে। একথাটিও ঠিক সেরকম। মুক্তির কাফেরদের ক্রোধ ও আক্রোশের এ অবস্থা সূরা বনী ইসরাইলের ৭৩ তেকে ৭৭ পর্যন্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

# আল হাক্কাহ

৬৯

## নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

## নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটিও মক্কী জীবনের প্রাথমিক যুগে অবর্তীণ সূরাসমূহের একটি। এর বিষয়বস্তু থেকে বুরা যায়, সূরাটি যে সময় নাযিল হয়েছিলো তখন রসূলগ্রাহ সান্নাহাহ আলাইহি ওয়া সান্নামের বিরোধিতা শুরু হয়েছিলো ঠিকই কিন্তু তখনো তা তেমন তীব্র হয়ে ওঠেনি। মুসনাদে আহমাদ হাদীস প্রয়ে হ্যরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন : ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন রসূলগ্রাহ সান্নাহাহ আলাইহি ওয়া সান্নামকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে আমি বাড়ি থেকে বের হলাম। কিন্তু আমার আগেই তিনি মসজিদে হারামে পৌছে গিয়েছিলেন। আমি সেখানে পৌছে দেখলাম তিনি নামাযে সূরা আল হাক্কাহ পড়ছেন। আমি তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলাম, শুনতে থাকলাম। কুরআনের বাচনভঙ্গি আমাকে বিশ্বয়ে অভিভূত করে ফেলেছিল। সহসা আমার মন বলে উঠলো, লোকটি নিচয়ই কবি হবে। কুরাইশরাও তো তাই বলে। সে মুহূর্তেই নবী সান্নাহাহ আলাইহি ওয়া সান্নামের মুখে একখাণ্ডে উচ্চারিত হলো : “এ একজন সমানিত রসূলের বাণী। কোন কবির কাব্য নয়।” আমি মনে মনে বললাম : কবি না হলে গণক হবেন। তখনই পবিত্র মুখে উচ্চারিত হলো : “এ কোন গণকের কথাও নয়। তোমরা খুব কমই চিন্তা-ভাবনা করে থাকো। একথা তো বিশ-জাহানের রব বা পালনকর্তার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।” এসব কথা শোনার পর ইসলাম আমার মনের গভীরে প্রভাব বিস্তার করে বসলো। হ্যরত উমরের (রা) এ বর্ণনা থেকে জানা যায়, সূরাটি তাঁর ইসলাম গ্রহণের অনেক আগে নাযিল হয়েছিলো। কারণ এ ঘটনার পর বেশ কিছুকাল পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবে বিভিন্ন সময়ের কিছু ঘটনা তাঁকে দ্রুতান্বয়ে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিলো। অবশেষে তাঁর মনের উপর চূড়ান্ত আঘাত পড়ে তাঁর আপন বোনের বাড়ীতে। আর এ ঘটনাই তাঁকে দুমানের মনযিলে পৌছিয়ে দেয়। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা মারযামের ভূমিকা; সূরা ওয়াকিয়ার ভূমিকা)

## বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরাটির প্রথম রূক্ক'তে আখেরাত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় রূক্ক'তে কুরআনের আগ্নাহৰ পক্ষ থেকে নাযিল হওয়ায় এবং হ্যরত মুহাম্মাদ সান্নাহাহ আলাইহি ওয়া সান্নাম যে, আগ্নাহৰ রসূল তার সত্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিয়ামত ও আখেরাতের কথা দিয়ে প্রথম রূক্ত' শুরু হয়েছে। কিয়ামত ও আখেরাতে এমন একটি সত্য যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। আয়াত ৪ থেকে ১২তে বলা হয়েছে যে, যেসব জাতি আখেরাত অঙ্গীকার করেছে শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর আয়াবের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। অতপর ১৭ আয়াত পর্যন্ত কিয়ামত কিভাবে সংঘটিত হবে তার চিত্র পেশ করা হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ দুনিয়ার বর্তমান জীবন শেষ হওয়ার পর মানুষের জন্য আরেকটি জীবনের ব্যবস্থা করেছেন ১৮ থেকে ২৭ আয়াতে সে মূল উদ্দেশ্যটি বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সেদিন সব মানুষ তার রবের আদালতে হাজির হবে। সেখানে তাদের কোন বিষয়ই গোপন থাকবে না। প্রত্যেকের আমলনামা তার নিজের হাতে দিয়ে দেয়া হবে। পৃথিবীতে যারা এ উপলক্ষ্মি ও বিখ্যাসের ভিত্তিতে জীবন যাপন করেছিলো যে, একদিন তাদেরকে আল্লাহর কাছে নিজ নিজ কাজের হিসেব দিতে হবে, যারা দুনিয়ার জীবনে নেকী ও কল্যাণের কাজ করে আখেরাতে কল্যাণলাভের জন্য অঙ্গীম ব্যবস্থা করে রেখেছিলো তারা সেদিন নিজের হিসেব পরিক্ষার ও নিরুৎস্থাট দেখে আনন্দিত হবে। পক্ষান্তরে যেসব লোক আল্লাহ তা'আলার হকেরও পরোয়া করেনি, বান্দার হকও আদায় করেনি, তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করার মত কেউ ধাকবে না। তারা জাহানামের আয়াব তোগ করতে থাকবে।

দ্বিতীয় রূক্ত'তে মক্কার কাফেরদেরকে বলা হয়েছে। এ কুরআনকে তোমরা কবির কাব্য ও গণকের গণনা বলে আখ্যায়িত করছো। অথচ তা আল্লাহর নাযিস্কৃত বাণী। তা উচ্চারিত হচ্ছে একজন সম্মানিত রসূলের মুখ থেকে। এ বাণীর মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে একটি শব্দও হ্রাস বা বৃদ্ধি করার ইথিতিয়ার রসূলের নেই। তিনি যদি এর মধ্যে তাঁর মনগড়া কোন কথা শামিল করে দেন তাহলে আমি তার ঘাড়ের শিরা (অথবা হৃদপিণ্ডের শিরা) কেটে দেবো। এ একটি নিশ্চিত সত্য বাণী। যারাই এ বাণীকে মিথ্যা বলবে শেষ পর্যন্ত তাদের অনুশোচনা করতে হবে।

আয়াত ৫২

## সূরা আল হাক্কাহ-মঙ্গী

রুক্ম ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الْحَقَّةُ ۝ مَا الْحَقَّةُ ۝ وَمَا أَدْرِكَ مَا الْحَقَّةُ ۝ كَلِبَتْ ثَمُودَ  
 وَعَادَ بِالْقَارِعَةِ ۝ فَمَا تَمُودَ فَاهْلَكُوا بِالْطَّاغِيَةِ ۝ وَمَا عَادَ فَاهْلَكُوا بِرَبِِّ  
 صَرَصِّرَ عَاتِيَةِ ۝ سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لِيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ ۝ حَسُومًا لَفَتَرَى  
 الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ ۝ كَانُهُمْ أَعْجَازٌ نَخْلٌ خَاوِيَةٍ ۝ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ  
 بَاقِيَةٍ ۝ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝ فَعَصَوْا رَسُولَ  
 رَبِّهِمْ فَأَخْلَقَهُمْ أَخْلَقَ رَبِّيَةً ۝

অবশ্যঙ্গাবী ঘটনাটি<sup>১</sup>। কি সে অবশ্যঙ্গাবী ঘটনাটি? তুমি কি জান সে অবশ্যঙ্গাবী ঘটনাটি কি?<sup>২</sup> সামুদ<sup>৩</sup> ও আদ আকমিকভাবে সংঘটিতব্য সে মহা ঘটনাকে<sup>৪</sup> অঙ্গীকার করেছিলো তাই সামুদকে একটি কঠিন মহা বিপদ<sup>৫</sup> দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। আর আদকে কঠিন ঝঞ্চাবাত্ত্বা দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। যা তিনি সাত রাত ও আট দিন ধরে বিরামইন্নভাবে তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। (তুমি সেখানে থাকলে) দেখতে পেতে তারা ভূগুঠিত হয়ে পড়ে আছে। বেন খেজুরের পুরনো কাণ্ড। তুমি তাদের কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাচ্ছা কি? ফেরাউন, তার পূর্ববর্তী লোকেরা এবং উলটপালট হয়ে যাওয়া জনপদসমূহও<sup>৬</sup> একই মহা অপরাধে অপরাধী হয়েছিলো। তারা সবাই তাদের রবের প্রেরিত রস্তার কথা অমান্য করেছিল। তাই তিনি তাদের অত্যন্ত কঠোরভাবে পাকড়াও করেছিলেন।

১. মূল আয়াতে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন ঘটনা যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। যার সংঘটিত হওয়া একান্ত বাস্তব, যার সংঘটিত হওয়ায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিয়ামতের জন্য এ ধরনের শব্দ ব্যবহার এবং তা দিয়ে বক্তব্য শুরু করা প্রমাণ করে যে, এ বক্তব্য এমন লোকদের উদ্দেশ করে পেশ করা হয়েছে যারা

إِنَّا لَهَا طَغَا الْمَاءُ حَمْلَنَا فِي الْجَارِيَةِ<sup>١٥</sup> لِنَجْعَلُهَا الْكَرْتَرَةَ وَتَعِيمَاهَا ذَنْبَهَا  
 وَأَعْيَهُ<sup>١٦</sup> فَإِذَا نَفَرَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً<sup>١٧</sup> وَحَمِلَتِ الْأَرْضَ وَالْجَبَالَ  
 فَلَكَ تَادَكَهُ وَاحِدَةً<sup>١٨</sup> فِي يَوْمَئِنِ<sup>١٩</sup> وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ<sup>٢٠</sup> وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ  
 يَوْمَئِنِ<sup>٢١</sup> وَاهِيَةً<sup>٢٢</sup> وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا<sup>٢٣</sup> وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُ  
 يَوْمَئِنِ<sup>٢٤</sup> ثَمِينَةً<sup>٢٥</sup> يَوْمَئِنِ<sup>٢٦</sup> تَعْرُضُونَ لَا تَخْفِي مِنْكُمْ خَافِيَةً<sup>٢٧</sup>

যে সময় পানির তৃফান সীমা অতিক্রম করলো<sup>১</sup> তখন আমি তোমাদেরকে জাহাজে সওয়ার করিয়েছিলাম<sup>২</sup> যাতে এ ঘটনাকে আমি তোমাদের জন্য একটি শিক্ষণীয় স্মৃতি বানিয়ে দেই যেনে অরণকারী কান তা সংশঙ্গ করে<sup>৩</sup>।

অতপর<sup>৪</sup> যে সময় শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে—একটি মাত্র ফুৎকার। আর পাহাড়সহ পৃথিবীকে উঠিয়ে একটি আঘাতেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। সেদিন সে মহা ঘটনা সংঘটিত হয়ে যাবে। সেদিন আসমান চৌচির হয়ে যাবে এবং তার বন্ধন শিথিল হয়ে পড়বে। ফেরেশতারা এর প্রান্ত সীমায় অবস্থান করবে। সেদিন আটজন ফেরেশতা তাদের উপরে তোমার রবের আরশ বহন করবে<sup>৫</sup>। সেদিনটিতে তোমাদেরকে পেশ করা হবে। তোমাদের কোন গোপনীয় বিষয়ই আর সেদিন গোপন থাকবে না।

কিয়ামতের আগমনকে অঙ্গীকার করছিলো। তাদেরকে সহোধন করে বলা হচ্ছে, যে বিষয়কে তোমরা অঙ্গীকার করছো তা অবশ্যজ্ঞাবী। তোমরা অঙ্গীকার করলেই তার আগমন ঠেকে থাকবে না।

২. শ্রোতাদেরকে সজাগ ও সতর্ক করে দেয়ার জন্য পরপর দু'টি প্রশ্ন করা হয়েছে। যাতে তারা বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং পূর্ণ মনোযোগ সহকারে পরবর্তী বক্তব্য শ্রবণ করে।

৩. মকার কাফেররা যেহেতু কিয়ামতকে অঙ্গীকার করছিলো এবং তা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টিকে একটি তামাশা বলে মনে করছিলো, তাই প্রথমে তাদেরকে এ মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামত একটি অবশ্যজ্ঞাবী ঘটনা। তোমরা বিশ্বাস করো আর নাই করো তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। একথা বলার পর তাদের বলা হচ্ছে, এ বিষয়টি এতটা সাদামাটা বিষয় নয় যে, কেউ একটি সংগ্রাম ঘটনার খবরকে মনে নিছে কিংবা মনে নিছে না। বরং জাতিসমূহের নেতৃত্ব চারিত্ব এবং তাদের তবিষ্যতের সাথে এর অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। তোমাদের পূর্বের জাতিগুলোর ইতিহাস সাক্ষ দেয়, যে

জাতিই আখেরাতকে অধীকার করেছে এবং এ দুনিয়ার জীবনকে প্রকৃত জীবন বলে মনে করেছে পরিশেষে আল্লাহর আদালতে হাজির হয়ে নিজের কৃতকর্মের হিসেব দেয়ার বিষয়টি মিথ্যা বলে মনে করেছে সেসব জাতিই মারাত্ক নৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হয়েছে। অবশেষে আল্লাহর আযাব এসে তাদের অভিভূত থেকে দুনিয়াকে পবিত্র করে দিয়েছে।

৪. মূল শব্দ হলো قرع شدটি আরবী ভাষায় খট্টট্ শব্দ করা, হাতুড়ি পিচিয়ে শব্দ করা, কড়া নেড়ে শব্দ করা এবং একটি জিনিসকে আরেকটি জিনিস দিয়ে আঘাত করা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিয়ামতের য়াবহতা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৫. সূরা আ'রাফের ৭৮ আয়াতে একে الرَّجْفَة (প্রচও ভূমিকম্প) বলা হয়েছে। সূরা হুদের ৬৭ আয়াতে এ জন্য الصَّيْحَة (প্রচও বিশ্ফোরণ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা হা-মীম আসু সাজদার ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে صاعِقَةُ الْعَذَابِ (আযাবের বজ ধ্বনি) এসে পাকড়াও করলো। এখানে সে একই আযাবকে الطاغيَّة (অতিশয় কঠিন দুর্ঘটনা) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একই ঘটনার বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা মাত্র।

৬. অর্থাৎ লুতের কওমের জনবসতিসমূহ। এসব জনবসতি সম্পর্কে সূরা হুদ (৮২ আয়াত) এবং সূরা হিজরে (৭৪ আয়াত) বলা হয়েছে, আমি ঐগুলোকে ওলটপালট করে দিলাম।

৭. ন্হের সময়ের মহা প্রাবনের কথা বলা হয়েছে। এ মহা প্রাবনে গোটা একটা জাতিকে এ একই মহা অপরাধের কারণে ডুবিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল। শুধু তারাই বেঁচে ছিল যারা আল্লাহর রসূলের কথা মনে নিয়েছিলো।

৮. যেসব লোককে জাহাজে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো তারা হাজার হাজার বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীকালের গোটা মানব গোষ্ঠী যেহেতু এ মহা প্রাবন থেকে রক্ষা পাওয়া লোকদের স্তান-স্তুতি, তাই বলা হয়েছে : আমি তোমাদেরকে জাহাজে উঠিয়ে নিয়েছিলাম। অর্থাৎ আজ তোমরা পৃথিবীতে এ কারণে বিচরণ করতে পারছো যে, মহান আল্লাহ এই মহা প্রাবন হারা শুধু কাফেরদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন এবং ইমানদারদের তা থেকে রক্ষা করেছিলেন।

৯. অর্থাৎ এমন কান নয় যা শুনেও শোনে না এবং যে কানের পর্দা স্পর্শ করেই শব্দ অন্যত্র সরে যায়। বরং এমন কান যা শোনে এবং কথাকে মনের গভীরে প্রবিষ্ট করিয়ে দেয়। বাস্তুত এখানে কান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু অর্থ হলো শ্বেণকারী মানুষ যারা এ ঘটনা শুনে তা মনে রাখে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অতপর আখেরাতকে অধীকার এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণাম করত য়াবহ তা কথনো ভুলে যায় না।

১০. পরবর্তী আয়াত পড়ার সময় এ বিষয়টি দৃষ্টিতে থাকা দরকার যে, কিয়ামতের তিনটি পর্যায় আছে। এ তিনটি পর্যায়ের ঘটনাবলী একের পর এক বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত

হবে। কুরআন মজীদের কোন কোন জায়গায় এ তিনটি পর্যায় আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কোন কোন জায়গায় প্রথম পর্যায় থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত একসাথে বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে সূরা নামলের ৮৭ নং আয়াতের উল্লেখ করা যায়। এ আয়াতটিতে প্রথমবার শিংগায় ফুৎকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ একটি তয়ানক বিকট শব্দে এক সাথে ভীত সন্তুষ্ট হয়ে গড়বে। সেই সময় গোটা বিশ-জাহানের লগতও হয়ে যাওয়ার যে অবস্থা সূরা হজ্জের ১ ও ২ আয়াতে, সূরা ইয়াসীনের ৪৯ ও ৫০ আয়াতে এবং সূরা তাকবীরের ১ থেকে ৬ পর্যন্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তা তাদের চোখের সামনে ঘটতে থাকবে। সূরা যুমারের ৬৭ থেকে ৭০ আয়াতে শিংগায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফুৎকারের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, একবারের ফুৎকারে সব মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হবে। কিন্তু এরপর আবার শিংগায় ফুৎকার দিলে সব মানুষ জীবিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর আদালতে বিচারের সম্মুখীন হবে। সূরা ত্বা-হার ১০২ থেকে ১১২ আয়াত, সূরা আবিয়ার ১০১ থেকে ১০৩ আয়াত, সূরা ইয়াসীনের ৫১ থেকে ৫৩ আয়াত এবং সূরা ক্ষাফের ২০ থেকে ২২ আয়াতে শুধু শিংগায় তৃতীয়বারের ফুৎকারের কথা উল্লেখিত হয়েছে। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা, টাকা ৭৮; সূরা হজ্জ, টাকা ১ এবং সূরা ইয়াসীন, টাকা ৪৬ ও ৪৭) কিন্তু কুরআন মজীদের এ জায়গায় এবং অন্য আরো অনেক জায়গায় শিংগায় প্রথম ফুৎকার থেকে প্রক করে মানুষের জানাত ও জাহানামে প্রবেশ করা পর্যন্ত কিয়ামতের সমস্ত ঘটনাবলী একই সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

১১. এ আয়াতটি ‘মৃতশাবেহাত’ আয়াত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এর নির্দিষ্ট কোন অর্থ বলা কঠিন। আরশ কি বস্তু আমরা জানি না। কিয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতার আরশ বহন করার ধরন কি হবে তাও আমরা বুঝি না। তবে কোন অবস্থাই এ ধারণা করা যাবে না যে, আল্লাহ তা’আলা আরশের ওপর উপবিষ্ট থাকবেন আর আটজন ফেরেশতা তাঁকে সহ আরশ বহন করবে। সেই সময় আল্লাহ আরশের ওপর উপবিষ্ট থাকবেন, এমন কথা আয়াতেও বলা হয়নি। মহান আল্লাহ দেহসন্তানীন এবং দিক ও স্থানের গন্তি থেকে মুক্ত। এমন এক সভা কোন স্থানে অধিষ্ঠিত থাকবেন আর কোন মাখলুক তাঁকে বহন করবে এটা ভাবা যায় না। আল্লাহর মহান সভা সম্পর্কে কুরআন মজীদের দেয়া ধারণা আমাদেরকে এক্ষণ কল্পনা করতে বাধা দেয়। এ জন্য খুঁজে খুঁজে এর অর্থ বের করার প্রচেষ্টা চালানো নিজেকে গোমরাহী ও বিভ্রান্তির গহবরে নিষ্কেপ করার শামল। তবে এ বিষয়টি বুঝা দরকার যে, আল্লাহ তা’আলার শাসন ও শাসন কর্তৃত এবং তাঁর যাবতীয় বিষয়ের একটা ধারণা দেয়ার জন্য কুরআন মজীদে আমাদের জন্য এমন একটি চিত্র পেশ করা হয়েছে যা দুনিয়ার কোন বাদশার বাদশাহীর চিত্রের অনুরূপ। মানুষের ভাষায় রাষ্ট্র ও তার সাথে সংযুক্ত বিষয়াদির জন্য যে পরিভাষা ব্যবহার করা হয় এ জন্য অনুরূপ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, মানুষের বুদ্ধি-বিবেক এক্ষণ চিত্র এবং পরিভাষার সাহায্যেই গোটা বিশ-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় কিছুটা উপলব্ধি করতে সক্ষম। বিশ-জাহানের ইলাহী ব্যবহারণাকে মানুষের বোধগম্যতার সীমায় নিয়ে আসাই এ ধরনের বর্ণনাভঙ্গী গ্রহণের উদ্দেশ্য। তাই এর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয়।

فَالْمَأْمُنُ أَوْ تَرِكَتْبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْرَءُوا كِتْبَهُ إِنِّي ظَنَنتُ  
إِنِّي مَلِكٌ حِسَابِيْهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهِ قَطْوَفَهَا  
دَائِنَيْدَهُ كُلُوا وَاشْرِبُوا هِنِيَّتَاهَا اسْلَفَتُهُ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَهِ وَأَمَانُ أَوْ تَرِكَتْبَهُ  
كِتْبَهُ بِشَيْأِهِ فَيَقُولُ لِمَأْوَاتِ كِتْبَهِ وَلِمَأْدِرِ مَا حِسَابِيْهِ  
يُلِيَّتَهَا كَانَتِي الْقَاضِيَهِ

সে সময় যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে,<sup>১২</sup> সে বলবেঃ নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো।<sup>১৩</sup> আমি জানতাম, আমাকে হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।<sup>১৪</sup> তাই সে মনের মত আরাম আয়েশের মধ্যে থাকবে। উন্নত মর্যাদার জামাতে। যার ফলের শুচ্ছসমূহ নাগালের সীমায় অবনমিত হয়ে থাকবে। (এসব লোকদেরকে বলা হবেঃ) অতীত দিনগুলোতে তোমরা যা করে এসেছো তার বিনিময়ে তোমরা ভূত্তির সাথে খাও এবং পান করো। আর যার আমলনামা তার বাঁ হাতে দেয়া হবে<sup>১৫</sup>, সে বলবেঃ হায়! আমার আমলনামা যদি আমাকে আদৌ দেয়া না হতো<sup>১৬</sup> এবং আমার হিসেব যদি আমি আদৌ না জানতাম<sup>১৭</sup> তাহলে কতই না ভালো হতো। হায়! আমার সেই মৃত্যুই (যা দুনিয়াতে এসেছিলো) যদি চূড়ান্ত হতো।<sup>১৮</sup>

১২. ডান হাতে আমলনামা দেয়ার অর্থই হবে তার হিসেব-নিকেশ অত্যন্ত পরিকার। আর সে আল্লাহ তা'আলার আদালতে অপরাধী হিসেবে নয়, বরং একজন সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে উপস্থিত হতে যাচ্ছে। অধিকতর সভাবনা হলো, আমলনামা দেয়ার সময়ই সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষগুলো নিজেরাই ডান হাত বাড়িয়ে আমলনামা গ্রহণ করবে। কারণ মৃত্যুর সময় থেকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার সময় পর্যন্ত তার সাথে যে আচরণ করা হবে তাতে তার মনে এতটা আস্থা ও প্রশান্তি থাকবে যে, সে মনে করবে আমাকে এখানে পুরুষার প্রদানের জন্য হাজির করা হচ্ছে, শাস্তিদানের জন্য নয়। একজন মানুষ সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে পরিপারে যাত্রা করছে, না অসৎ ও পাপী হিসেবে যাত্রা করছে মৃত্যুর সময় থেকেই তা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। একথাটি ক্রুআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তাহাড়া মৃত্যুর সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত একজন নেক্কার মানুষের সাথে সমানিত মেহমানের মত আচরণ করা হয়। কিন্তু একজন অসৎ ও বদকার মানুষের সাথে আচরণ করা হয় অপরাধে অভিযুক্ত কয়েদীর মত। এরপর কিয়ামতের দিন আবেরাতের জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই নেক্কার মানুষদের জীবন যাপনের ধরন-ধারণই পাণ্টে যায়। একইভাবে কাফের, মুনাফিক ও

مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ هَلْكَ عَنِي سُلْطَنِيَهُ خَلَّهُ فَغْلُوهُ<sup>১৭</sup> ثُمَرَ  
 الْجَحِيمَ صَلَوَهُ<sup>১৮</sup> ثُمَرَ فِي سِلْسِلَهُ ذِرَاعَهَا سَبْعَونَ ذِرَاعًا فَاسْلُوكُهُ<sup>১৯</sup> أَنَّهُ كَانَ  
 لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ<sup>২০</sup> وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ<sup>২১</sup> فَلَيَسْ لَهُ  
 الْيَوْمَ هُنَّا حِمَرٌ<sup>২২</sup> وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلِينِ<sup>২৩</sup> لَا يَا كَلَهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ<sup>২৪</sup>

আজ আমার অর্থ-সম্পদ কোন কাজে আসলো না। আমার সব ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে।<sup>১৯</sup> (আদেশ দেয়া হবে) পাকড়াও করো ওকে আর ওর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। তারপর জাহানামে নিক্ষেপ করো। এবং সত্তর হাত লয়া শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলো। সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করতো না এবং দৃষ্ট মানুষকে খাদ্য দিতে উৎসাহিত করতো না।<sup>২০</sup> তাই আজকে এখানে তার সমব্যবী কোন বক্তৃ নেই। আর কোন খাদ্যও নেই ক্ষত নিস্ত পুঁজ-রক্ত ছাড়া। যা পাপীরা ছাড়া আর কেউ থাবে না।

পাপীদের জীবন যাপনের ধরনও তিনি রূপ হয়ে যায়। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনফাল, আয়াত ৫০; আন নাহল, আয়াত ২৮ ও ৩২ এবং টীকা ২৬; বনী ইসরাইল, আয়াত ৯৭; তা-হা, আয়াত ১০২, ১০৩ ও ১২৪ থেকে ১২৬ এবং টীকা ৭৯, ৮০ ও ১০৭; আল আব্রিয়া, আয়াত ১০৩, টীকা ৯৮; আল ফুরকান, আয়াত ২৪ ও টীকা ৩৮; আন নাম্ল, আয়াত ৮৯ ও টীকা ১০৯; সাবা, আয়াত ৫১ ও টীকা ৭২; ইয়াসীন, আয়াত ২৬ ও ২৭ এবং টীকা ২২-৩২; আল মু'মিন, আয়াত ৪৫ ও ৪৬ এবং টীকা ৬৩; মৃহাম্মাদ, আয়াত ২৭ এবং টীকা ৩৭; কৃফ, আয়াত ১৯ থেকে ২৩ পর্যন্ত এবং টীকা ২২, ২৩ ও ২৫)।

১৩. অর্থাৎ আমলনামা পাওয়ার সাথে সাথেই তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে এবং নিজের বক্তৃ-বাক্বদের তা দেখাবে। সূরা ইনশিকাকের ৯ আয়াতে বলা হয়েছে যে, “সে আনন্দচিত্তে আপনজনদের কাছে ফিরে যাবে।”

১৪. অর্থাৎ তারা তাদের এ সৌভাগ্যের কারণ হিসেবে বলবে যে, দূনিয়ার জীবনে তারা আখেরাতকে ভুলে ছিল না। বরং একদিন তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে সব কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে এ বিশ্বাস নিয়েই তারা সেখানে জীবন যাপন করেছিল।

১৫. সূরা ইনশিকাকে বলা হয়েছে, “আর যাকে পিছন দিক থেকে আমলনামা দেয়া হবে।” সত্ত্বত তা হবে এভাবে, অপরাধীর প্রথম থেকেই তার অপরাধী হওয়ার বিষয়টি জানা থাকবে। তার আমলনামায় কি আছে তাও ঠিকঠাক তার জানা থাকবে। তাই সে অত্যন্ত অনিষ্ট সত্ত্বেও বাঁ হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করবে এবং সংগে সংগেই নিজের পেছনের দিকে শুকিয়ে ফেলবে যাতে কেউ তা দেখতে না পায়।

فَلَا أَقِسْمَرُ بِمَا تَبْصِرُونَ وَمَا لَا تَبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ  
 ১৪  
 وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تَؤْمِنُونَ وَلَا يُقَوْلُ كَاهِنٌ قَلِيلًا  
 ১৫  
 مَا تَذَنَّ كَرْوَنَ ১৬ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ  
 ১৭

## ২ রংকৃত'

অতএব তা নয়। ১৫ আমি শপথ করছি এই সব জিনিসেরও যা তোমরা দেখতে পাও এবং এই সব জিনিসেরও যা তোমরা দেখতে পাও না। এটা একজন সম্মানিত রসূলের বাণী। ১৬ কোন কবির কাব্য নয়। তোমরা খুব কমই ঈমান পোষণ করে থাকে। ১৭ আর এটা কোন গণকের গণনাও নয়। তোমরা খুব কমই চিন্তা-ভাবনা করে থাকো। এ বাণী বিশ্ব-জাহানের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। ১৮

১৬. অর্থাৎ হাশরের যয়দানে প্রকাশ্যে আমার হাতে এ আমলনামা দিয়ে সবার সামনে লাঢ়িত ও অপমানিত না করে যে শান্তি দেয়ার তা দিয়ে ফেললেই তালো হতো।

১৭. অর্থাৎ পৃথিবীতে আমি যা করে এসেছি তা যদি আমাকে আদৌ বলা না হতো। এ আয়াতের আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, আমি ইতিপূর্বে আদৌ জানতাম না যে, হিসেব কি জিনিস। কোনদিন আমার কম্ভনায়ও আসেনি যে, আমার্কে একদিন আমার কার্যাবলীর হিসেব দিতে হবে এবং আমার অতীত কাজ-কর্ম সব আমার সামনে পেশ করা হবে।

১৮. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে আমার মৃত্যুবরণের পর সবকিছু যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। এবং আর কোন জীবন যদি না থাকতো।

১৯. মূল আয়াতে আছে **سَلْطَانٌ مَلَكٌ عَنْتَ سُلْطَانِيَّةٍ** শব্দটি দলিল-প্রমাণ অর্থেও ব্যবহৃত হয় আবার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। দলিল-প্রমাণ অর্থে গ্রহণ করলে তার অর্থ হবে আমি দলিল ও যুক্তি-প্রমাণের যে তুবড়ি ছুটাতাম তা আর এখানে চলবে না। এখন আত্মপক্ষ সমর্থনের মত কোন প্রমাণই আমার কাছে নেই। আর ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি অর্থে গ্রহণ করলে তার অর্থ হবে, আমি যে শক্তিতে বিলিয়ান হয়ে পৃথিবীতে বুকটান করে চলতাম তা খতম হয়ে গিয়েছে। এখানে আমার কোন দলবল বা সেনাবাহিনী নেই, আমার আদেশ মেনে চলারও কেউ নেই। এখানে তো আমি এমন একজন অসহায় মানুষের মত দাঁড়িয়ে আছি যে আত্মরক্ষার জন্যও কিছু করতে সক্ষম নয়।

২০. অর্থাৎ নিজে কোন দরিদ্রকে খাবার দেয়া তো দূরের কথা কাউকে এতটুকু কথা বলাও পছন্দ করতো না যে, আগ্নাহুর স্কুধাক্ষিট বান্দাদের খাদ্য দান করো।

২১. অর্থাৎ তোমরা যা মনে করে নিয়েছো ব্যাপার তা নয়।

০"

"০

২২. এখানে সমানিত রসূল মানে হয়রত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কিন্তু সূরা তাকবীরে (আয়াত ১৯) সমানিত রসূলের যে উদ্বেগ আছে তার অর্থ হয়রত জিবরাইল আলাইহিস সালাম। এখানে যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই সমানিত রসূল বলা হয়েছে তার প্রমাণ হলো, কুরআনকে সমানিত রসূলের বাণী বলার পরেই বলা হয়েছে যে, তা কোন কবি বা গণকের কথা নয়। আর একথা সবারই জানা যে, মকার কাফেররা হয়রত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই কবি বা গণক বলতো। তারা জিবরাইল আলাইহিস সালামকে কবি বা গণক বলতো না। পক্ষান্তরে সূরা তাকবীরে কুরআন মজীদকে সমানিত রসূলের বাণী বলার পরে বলা হয়েছে যে, সে রসূল অত্যন্ত শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, সেখানে তাঁর কথা গ্রহণ করা হয়, তিনি বিশ্বস্ত ও আমানতদার এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে পরিষ্কার দিগন্তে দেখেছেন। সূরা নাজুমের ৫ থেকে ১০ আয়াতে জিবরাইল আলাইহিস সাল্লাম সম্পর্কে প্রায় এ একই বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। তাহলো, কুরআনকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও জিবরাইল আলাইহিস সালামের বাণী বলার তৎপর্য কি? এর জওয়াব হলো, মানুষ কুরআনের এ বাণী শুনতো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের মুখ থেকে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনতেন জিবরাইল আলাইহিস সালামের মুখ থেকে। তাই এক বিচারে এটা ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের বাণী এবং আরেক বিচারে তা ছিল হয়রত জিবরাইল আলাইহিস সালামের বাণী। কিন্তু পরফণেই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের 'রবের' নাযিলকৃত বাণী। তবে তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামকে জিবরাইলের মুখ থেকে এবং লোকদেরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের মুখ থেকে শুনানো হচ্ছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের নিজের কথা থেকেও এ সত্যাটিই ফুটে ওঠে। তিনি বলেছেন যে, এসব তাঁদের দু'জনের কথা নয়। বরং বার্তাবাহক হিসেবে তাঁরা এ বাণী মূল বাণী প্রেরকের পক্ষ থেকে পেশ করেছেন।

২৩. "কমই দুয়ান পোষণ করে ধাকো" প্রচলিত আরবী বাকরীতি অনুসারে এর একটি অর্থ হতে পারে তোমরা আদৌ দুয়ান পোষণ করো না। এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, কুরআন শুনে কোন সময় তোমাদের ঘন হয়তো স্বত্যুর্তভাবেই বলে ওঠে যে, এটা মানুষের কথা হতে পারে না। কিন্তু তোমরা নিজেদের হঠকারিতার ওপর অবিচল রয়েছ এবং এ বাণীর ওপর দুয়ান আনতে অঙ্গীকৃতি জনিয়ে থাকো।

২৪. সারকথা হলো তোমরা যা কিছু দেখতে পাও এবং যা কিছু দেখতে পাও না তার কসম আমি এ জন্য করছি যে, এ কুরআন কোন কবি বা গণকের কথা নয়। বরং সারা বিশ্ব-জাহানের রবের নাযিলকৃত বাণী। এ বাণী এমন এক রসূলের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে যিনি মর্যাদাবান (অত্যন্ত সমানিত ও ভদ্র)। এখন দেখা যাক কসম করার উদ্দেশ্য কি? লোকজন যা কিছু দেখতে পাচ্ছিল তাহলো :

এক : এ বাণী এমন ব্যক্তি পেশ করছিলেন যার মার্জিত ও তদ্ব স্বত্বাবের বিষয়টি মক্কা শহরের কারোই অজানা ছিল না। সমাজের সবাই একথা জানতো যে, নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি তাদের জাতির মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। এরপ লোক আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা

আরোপ করবে এবং নিজে কোন কথা বানিয়ে মহান আল্লাহর কথা বলে তা চালিয়ে দেবে, এত বড় মিথ্যার বেসাতি এ লোকের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

দুই : তারা আরো দেখছিল যে, এ ব্যক্তি কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবতী হয়ে এ বাণী পেশ করছে না। বরং এ কাজ করতে গিয়ে সে নিজের স্বার্থকেই জলাঞ্জলি দিয়েছে। এ কাজ করতে গিয়ে সে নিজের ব্যবসায়-বাণিজ্য ধর্ষণ করেছে, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করেছে, যে সমাজে তাকে অভাবনীয় সম্মান দেখানো হতো সেখানেই তাকে গালিগালাজের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, আর এসব করে নিজেই যে শুধু দুঃখ-মসিবতের মধ্যে নিপত্তি হচ্ছে তাই নয়, বরং নিজের ছেলেমেয়েদেরকেও সব রকম দুঃখ-দুর্দশার মুখে ঠেলে দিয়েছে। ব্যক্তি স্বার্থের পূজারী হলে সে নিজেকে এ দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে টেনে আনবে কেন?

তিনি : তারা নিজের চোখে এও দেখছিলো যে, তাদের সমাজের যেসব লোক এ ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনছিলো তাদের জীবনে ইঠাই একটা বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়ে যাচ্ছে। কোন কবি অথবা গণকের কথার এতটা প্রভাব কি কখনো দেখা গিয়েছে যে তা মানুষের মধ্যে ব্যাপক নৈতিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে আর তার অনুসারীরা এ জন্য সব রকমের বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে?

চার : কবিদের ভাষা কেমন হয়ে থাকে এবং গণকদের কথাবার্তা কিরণ হয় তাও তাদের অজানা ছিল না। কুরআনের ভাষা, সাহিত্য ও বিষয়বস্তুকে কবির কাব্য এবং গণকের গণনা সদৃশ বলা একমাত্র ইঠকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। (আমি এ বিষয়ে তাফহীমুল কুরআনের সূরা আবিয়ার ৭নং টীকায়, সূরা শু'আরার ১৪২ থেকে ১৪৫নং টীকায় এবং সূরা আত্ তুরের ২২নং টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।)

পাঁচ : সমগ্র আরব ভূমিতে উন্নত ভাষাশৈলীর অধিকারী এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যার চমকপদ ও অলংকারময় ভাষাকে কুরআনের মোকাবিলায় পেশ করা যেতো। কুরআনের সমকক্ষ হওয়া তো দূরের কথা, কারো ভাষার বিশুদ্ধতা ও শুভতিমাধুর্য কুরআনের উন্নত ভাষাশৈলীর ধারে কাছে ঘোরও ঘোগ্যতা রাখতো না। এ বিষয়টিও তাদের জানা ছিল।

ছয় : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কথাবার্তা ও ভাষার সাহিত্যিক উৎকর্ষ ও কুরআনের সাহিত্যিক মান ও উৎকর্ষ থেকে যে সম্পূর্ণ বৃত্তি ছিল তাও তাদের অগোচরে ছিল না। আরবী ভাষাভাষী কোন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তৃতা এবং কুরআন শোনার পর বলতে পারতো না যে, এ দু'টি একই ব্যক্তির মুখের কথা।

সাত : যেসব বিষয়বস্তু ও জ্ঞান-বিজ্ঞান কুরআনে পেশ করা হয়েছে নবুওয়াত দাবী করার একদিন আগেও মক্কার লোকেরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে তা শোনেনি। তারা এও জানতো যে, তাঁর কাছে এসব তথ্য ও বিষয়বস্তু জানার কোন উপায়-উপকরণও নেই। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন গোপনীয় সূত্র থেকে এসব তথ্য ও জ্ঞান লাভ করছেন বলে তাঁর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেও মক্কার কেউ-ই তা বিশ্বাস করতো না। (আমি তাফহীমুল কুরআনের সূরা

وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ<sup>৪৪</sup> لَا خَلَّ نَا مِنْهُ بِالْيَوْمِينِ<sup>৪৫</sup> ثُمَّ لَقَطَعْنَا  
مِنْهُ الْوَتِينِ<sup>৪৬</sup> فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حِجْزٌ<sup>৪৭</sup> وَإِنَّهُ لَتَنِّي كُرَةً لِلْمُتَقِينَ<sup>৪৮</sup>  
وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مَكْنِي بِيْنَ<sup>৪৯</sup> وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكُفَّارِينَ<sup>৫০</sup> وَإِنَّهُ لَحَقْ<sup>৫১</sup>  
الْيَقِينِ<sup>৫২</sup> فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ<sup>৫৩</sup>

যদি এ নবী নিজে কোন কথা বানিয়ে আমার কথা বলে চালিয়ে দিতো তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং ঘাড়ের রগ কেটে দিতাম। তোমাদের কেউ-ই (আমাকে) এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারতো না।<sup>২৫</sup> আসলে এটি আগ্নাহতীরূপ লোকদের জন্য একটি নসীহত।<sup>২৬</sup> আমি জানি তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক মিথ্যাপ্রতিপন্থ করতে থাকবে। নিচিতভাবে তা এসব কাফেরদের জন্য অনুতাপ ও আফসোসের<sup>২৭</sup> কারণ হবে। এটি অবশ্যই এক নিচিত সত্য। অতএব হে নবী, তুমি তোমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করো।

আন নাহলের ১০৭ নং টীকা এবং সূরা আল ফুরকানের ১২২ নং টীকায় এর বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা পেশ করেছি।)

আটঃ এ পৃথিবী থেকে সুদূর আসমান তথ্য মহাশূন্য পর্যন্ত বিস্তৃত এ বিরাট-বিশাল বিশ্ব-জাহানকে তারা নিজ চোখে সূচারু রূপে পরিচালিত হতে দেখছিল। তারা এও দেখছিলো যে, এ বিশাল বিশ্বলোক একটি জ্ঞানগত আইন-বিধান এবং সর্বায়োগী নিয়ম-শৃংখলা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আরবের লোকেরা শিরকে লিঙ্গ ছিল এবং আখ্রোত অঙ্গীকার করতো। এটা ছিল তাদের আকীদা-বিশ্বাসের অঙ্গর্গত। কিন্তু এ বিশাল বিশ্বলোকের পরিচালনা ও নিয়ম-শৃংখলার কোন ক্ষেত্রেই তারা শিরক ও আখ্রোত অঙ্গীকৃতির পক্ষে কোন সাক্ষ-প্রমাণ খুঁজে পেতো না। বরং কুরআন তাওয়াহ ও আখ্রোতের যে ধারণা পেশ করছে সর্বত্র তারই সত্যতার সাক্ষ-প্রমাণ পাওয়া যায়।

এসবই তারা দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু যেসব জিনিস তারা দেখতে পাচ্ছিল না তা হলো, প্রকৃতপক্ষে আগ্নাহ তাঁ'আলাই এ বিশ্ব-জাহানের মষ্টা, মালিক এবং শাসক, বিশ্ব-জাহানের সবাই তাঁ'র বান্দা, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নয়, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, আগ্নাহ তাঁ'আলাই মুহাম্মদ সাগ্নাগ্নাহ আলাইহি ওয়া সাগ্নামকে রসূল করে পাঠিয়েছেন এবং আগ্নাহের পক্ষ থেকেই তাঁ'র উপর কুরআন নাযিল হচ্ছে। পূর্বোক্ত আয়াতগুলোতে যা বলা হয়েছে তা বলা হয়েছে এ দু' ধরনের সত্যের কসম থেয়ে।

২৫. নিজের পক্ষ থেকে অহীর মধ্যে কোন কম বেশী করার ইঁখতিয়ার নবীর নেই, নবী যদি এ কাজ করে তাহলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো, একথাটি বলাই এ

আয়াতের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু কথাটি বলতে যে বাচনভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছে তাতে চোখের সামনে এমন একটি চিত্র ভেসে ওঠে যে, বাদশাহর নিযুক্ত কর্মচারী বাদশাহর নামে জালিয়াতি করলে তিনি তাকে পাকড়াও করে তার গর্দান মেরে দেবেন। কিন্তু লোক এ আয়াত থেকে এ ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, কোন ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করলে তৎক্ষণাত্ত আল্লাহর তরফ থেকে যদি তার গর্দানের রগ কেটে দেয়া না হয় তাহলে এটা হবে তার নবী হওয়ার প্রমাণ। অথচ এ আয়াতে যা বলা হয়েছে তা সত্য নবী সম্পর্কে বলা হয়েছে। নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার সম্পর্কে তা প্রযোজ্য নয়। মিথ্যা দাবীদার তো শুধু নবুওয়াতের দাবীই করে না, খোদায়ীর দাবী পর্যন্ত করে বসে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে বৃক্ষ ফুলিয়ে চলে। এটা তাদের সত্য হওয়ার কোন প্রমাণ নয়। (আমি তাফহীমুল কুরআনের সূরা ইউনুসের ২৩নং টীকায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।)

২৬. অর্থাৎ যারা ভুল-ভাস্তি ও তার খারাপ পরিণাম থেকে রক্ষা পেতে চায় কুরআন তাদের জন্য উপদেশ বাণী। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, টীকা ৩)

২৭. অর্থাৎ পরিশেষে তাদেরকে এ জন্য অনুশোচনা করতে হবে যে, কেন তারা কুরআনকে মিথ্যা মনে করেছিল।

# আল মা'আরিজ

৭০

## নামকরণ

সূরার তৃতীয় আয়াতের *نِيَّةُ الْمَعَارِجِ* শব্দটি থেকে এর নামকরণ হয়েছে।

## নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরা আল হাক্কাহ যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিল এ সূরাটিও মোটামুটি সে একই পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছিল।

## বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

কাফেররা কিয়ামত, আখেরাত এবং দোষখ ও বেচেষ্ট সম্পর্কিত বক্তব্য নিয়ে বিদ্যুৎ ও উপহাস করতো এবং রসূলগ্রাহ সাল্লাহুর আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে চ্যালেজ করতো যে, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো আর তোমাকে অঙ্গীকার করে আমরা জাহানামের শাস্তিলাভের উপযুক্ত হয়ে থাকি তাহলে তুমি আমদেরকে যে কিয়ামতের তয় দেখিয়ে থাকো তা নিয়ে এসো। যে কাফেররা এসব কথা বলতো এ সূরায় তাদের সতর্ক করা হয়েছে এবং উপদেশ বাণী শোনানো হয়েছে। তাদের এ চ্যালেজের জবাবে এ সূরার গোটা বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

সূরার প্রথমে বলা হয়েছে প্রার্থনাকারী আযাব প্রার্থনা করছে। নবীর দাওয়াত অঙ্গীকারকারীর ওপর সে আযাব অবশ্যই পতিত হবে। আর যখন আসবে তখন কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। তবে তার আগমন ঘটবে নির্ধারিত সময়ে। আগ্নাহুর কাজে দেরী হতে পারে। কিন্তু তার কাছে বেইনসাফী বা অবিচার নেই। তাই তাদের হাসি-তামাসার ব্যাপারে দৈর্ঘ্য ধারণ করো। এরা মনে করছে তা অনেক দূরে। কিন্তু আমি দেখছি তা অতি নিকটে।

এরপর বলা হয়েছে, এসব লোক হাসি-ঠাট্টাছলে কিয়ামত দ্রুত নিয়ে আসার দাবী করছে। অথচ কত কঠোর ও ভয়ানক সেই কিয়ামত। যখন তা আসবে তখন এসব লোকের কি-যে ভয়ানক পরিণতি হবে। সে সময় এরা আযাব থেকে বাঁচার জন্য নিজের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং নিকট আত্মাদেরকেও বিনিয়য় স্বরূপ দিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। কিন্তু কোনভাবেই আযাব থেকে নিঙ্কতি লাভ করতে পারবে না।

এরপর মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সেদিন মানুষের তাগের ফায়সালা হবে সম্পূর্ণরূপে তাদের আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র ও কৃতকর্মের ভিত্তিতে। দুনিয়ার

জীবনে যারা ন্যায় ও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং ধন-সম্পদ জমা করে ডিমে তা দেয়ার মত স্বত্তে আগলে রেখেছে তারা হবে জাহানামের উপর্যুক্ত। আর যারা আল্লাহর আয়াবের ভয়ে ভীত থেকেছে। আবেরাতকে বিশ্বাস করেছে, নিয়মিত নামায পড়েছে, নিজের উপার্জিত সম্পদ দিয়ে আল্লাহর অভিযোগ বান্দাদের হক আদায় করেছে, ব্যতিচার থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছে, আমানতের খেয়ানত করেনি, ওয়াদা ও প্রতিশ্রূতি এবং কথা ও কাজ যথাযথভাবে রক্ষা করে চলেছে এবং সাক্ষদানের বেলায় সত্যবাদিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছে তারা সম্মান ও মর্যাদার সাথে জারাতে স্থান লাভ করবে।

পরিশেষে একার কাফেরদের সাবধান করা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখামাত্র বিদ্যুপ ও উপহাস করার জন্য চারদিক থেকে ঝাপিয়ে পড়তো। তাদেরকে বলা হয়েছে, যদি তোমরা তাঁকে না মানো তাহলে আল্লাহ তা'আলা অন্যদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই বলে উপদেশ দেয়া হয়েছে, যেন তিনি এসব উপহাস-বিদ্যুপের তোয়াক্তা না করেন। এরা যদি কিয়ামতের লাঙ্ঘনা দেখার জন্যই জিদ ধরে থাকে তাহলে তাদেরকে এ অর্থহীন তৎপরতায় লিঙ্গ থাকতে দিন। তারা নিজেরাই এর দৃঢ়ব্যজনক পরিণতি দেখতে পাবে।

আয়াত ৪৪

সুরা আল মা'আরিজ-মঙ্গী

রুক্ত ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

سَأَلَ سَائِلٌ بَعْدَ أَبٍ وَاقِعٌ لِلْكُفَّارِ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ<sup>①</sup> مِنَ اللَّهِ  
 ذِي الْمَعَارِجِ<sup>③</sup> تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ  
 خَمْسِينَ الْفَ سَنَةً<sup>④</sup> فَاصْبِرْ صَبْرًا جِبِيلًا<sup>⑥</sup> إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيلًا<sup>⑦</sup> وَنَرْهُ  
 قَرِيبًا<sup>⑧</sup>

এক প্রার্থনাকারী আয়াব প্রার্থনা করেছে<sup>১</sup> যে আয়াব কাফেরের জন্য অবধারিত। তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি উর্ধ্বারোহনের সোপানসমূহের অধিকারী<sup>২</sup> ফেরেশতারা এবং জন্ম<sup>৩</sup> তার দিকে উঠে যায়<sup>৪</sup> এমন এক দিনে যা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।<sup>৫</sup> অতএব, হে নবী, তুমি উত্তম ধৈর্য ধারণ করো।<sup>৬</sup> তারা সেটিকে অনেক দূরে মনে করছে। কিন্তু আমি দেখছি তা নিকটে।<sup>৭</sup>

১. মূল আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হলো **سَأَلَ سَائِلٌ**। কোন কোন মুফাস্সির এখানে **سَأَلَ** শব্দটিকে জিজ্ঞেস করা অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ হলো একজন জিজ্ঞেসকারী জানতে চেয়েছে যে, তাঁদেরকে যে আয়াব সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে তা কার ওপর আপত্তি হবে? আল্লাহ তা'আলা এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন এই বলে যে, তা কাফেরদের ওপর পতিত হবেই। তবে অধিকাংশ মুফাস্সির এ ক্ষেত্রে চাওয়াকে দাবী করা অর্থে গ্রহণ করেছেন। নাসায়ী এবং আরো কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস ইবনে আরাম থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস হাকেম এটিকে সহীহ হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি হলো নাদর ইবনে হারেস ইবনে কালাদা বলেছিল:

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ  
 السَّمَاءِ أَوْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - (الأنفال : ৩২)

“হে আল্লাহ, এটি যদি সত্ত্বিই তোমার পক্ষ থেকে আসা একটা সত্ত্ব বাণী হয়ে থাকে, তাহলে আসমান থেকে আমাদের ওপর পাথর বর্ষণ করো অথবা আমাদেরকে তীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি দাও।”

এটি ছাড়াও কুরআন মজীদের আরো অনেক স্থানে মক্কার কাফেরদের এ চ্যাগেজেরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তুমি আমাদের যে আয়াবের তর্ফ দেখাচ্ছ তা নিয়ে আসছো না কেন? উদাহরণ স্বরূপ নাচে উল্লেখিত স্থানসমূহ দেখুন। সূরা ইউনুস, আয়াত ৪৬ থেকে ৪৮; সূরা আরিয়া, আয়াত ৩৬ থেকে ৪১; সূরা আন নামল আয়াত ৬৭ থেকে ৭২; সূরা সাবা, আয়াত ২৬ থেকে ৩০; ইয়াসীন, আয়াত ৪৫ থেকে ৫২ এবং সূরা মূলক ২৪ থেকে ২৭।

২. মূল ইবারতে **مُفْرَج** شد ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ **হলো** ধাপ বা সিডি অথবা এমন জিনিস যার সাহায্যে ওপরে উঠা যায়। আল্লাহ তা'আলাকে **معارِج** এর অধিকারী বলার মানে হলো তাঁর সত্ত্ব অনেক উচ্চ ও সমুন্নত। তাঁর দরবারে পৌছার জন্যে ফেরেশতাদের একের পর এক ওপর দিকে উঠতে হয়। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়টিই বলা হয়েছে।

৩. **রহ** অর্থ জিবরাস্ত আলাইহিস সালাম। অন্য সব ফেরেশতাদের থেকে আলাদাভাবে জিবরাস্তের উল্লেখ ত্যাঁর বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করে। সূরা শু'আরায় বলা হয়েছে, **نَزَلَ بِالرُّوحِ الْأَمِينِ عَلَى قَلْبِكَ** (রহল আমীন এ কুরআন নিয়ে তোমার দিলের মধ্যে নাযিল হয়েছে।) সূরা বাকারায় বলা হয়েছে,

**قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَرَأَهُ عَلَى قَلْبِكَ**

“বলো, যে ব্যক্তি শুধু এ কারণে জিবরাস্তের দুশ্মন হয়ে গিয়েছেন যে, সে তোমার অন্তরে কুরআন নাযিল করেছেন.....।”

এ দুটি আয়াত এক সাথে পড়লে বুঝা যায় যে, **রহ** মানে জিবরাস্ত (আ) ছাড়া আর কিছু নয়।

৪. এ পুরো বিবরণটি ‘মুতাশাবিহাতের’ অতরভুক্ত। এর কোন নির্দিষ্ট অর্থ করা যায় না। আমরা ফেরেশতার সঠিক তাৎপর্য কি তা জানি না। আমরা তাদের উর্ধ্বরোহণের সঠিক রূপও জানি না। যে ধাপগুলো পেরিয়ে ফেরেশতারা ওপরে উঠেন তা কেমন তাও আমরা জানি না। মহান আল্লাহ সম্পর্কেও এ ধারণা করা যায় না যে, তিনি কোন বিশেষ স্থানে অবস্থান করেন। কারণ তাঁর মহান সত্ত্ব স্থান ও কালের গতিতে আবদ্ধ নয়।

৫. সূরা হজ্জের ৪৭ আয়াতে বলা হয়েছে : এসব লোক এ মুহূর্তেই আয়াব নিয়ে আসার জন্য তোমার কাছে দাবী করছে। আল্লাহ কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না। তবে তোমার রবের হিসেবের একদিন তোমাদের হিসেবের হাজার হাজার বছরের সমান হয়ে থাকে। সূরা আস সাজ্দার ৫ আয়াতে বলা হয়েছে : “তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত গোটা বিশ্ব-জাহানের সব বিষয় পরিচালনা করেন। এরপর (তাঁর রিপোর্ট) এমন একটি দিনে তাঁর কাছে পৌছে যা তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান।” আর এখানে আয়াব দাবী করার জবাবে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার একদিন পঞ্চাশ হাজার

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمَهْلِ<sup>١</sup> وَتَكُونُ الْجِبَانُ كَالْعِمَنِ<sup>٢</sup> وَلَا يَسْئَلُ  
 حِيمِرْ حِيمِيَا<sup>٣</sup> يَبْصُرُونَهُ يُودُ الْمَجْرُ لَوْيَفْتِنِي<sup>٤</sup> مِنْ عَنْ أَبِ يَوْمِئِلِ  
 بَيْنِيَهُ<sup>٥</sup> وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ<sup>٦</sup> وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تَشْوِيهِ<sup>٧</sup> وَمَنْ فِي الْأَرْضِ  
 جَمِيعًا «ثَمَرِينْجِيَهُ<sup>٨</sup> كَلَاءِ إِنْهَا لَظَى<sup>٩</sup> نَزَاعَةِ لِلشَّوَى<sup>١٠</sup> تَنْعَامَنِ<sup>١١</sup>  
 أَدْبَرْ وَتَوْلِ<sup>١٢</sup> وَجْمَعْ فَاوْعِي<sup>١٣</sup>

(যেদিন সেই আয়াব আসবে) সেদিন<sup>১</sup> আসমান গলিত রূপার মত বর্ণ ধারণ করবে।<sup>২</sup> আর পাহাড়সমূহ রংবেরং-এর ধূনিত পশমের মত হয়ে যাবে।<sup>৩</sup> কোন পরম বক্স বক্সকে জিঞ্জেস করবে না। অথচ তাদেরকে পরম্পর দৃষ্টি সীমার মধ্যে রাখা হবে।<sup>৪</sup> অপরাধী সেদিনের আয়াব থেকে মুক্তির বিনিময়ে তার স্তুন-স্তুতিকে, স্তুকে, ভাইকে, এবং তাকে আগ্রহদানকারী জাতি-গোষ্ঠীর আপনজনকে এমনকি পৃথিবীর সবকিছুই দিতে চাইবে। কখনো নয়, তা তো হবে জলন্ত আগুনের লেলিহান শিখা যা শরীরের গোশত ও চামড়া ঝলসিয়ে নিঃশেষ করে দেবে। যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল আর সম্পদ জমা করে ডিমে তা দেয়ার মত করে আগলে রেখেছিল<sup>৫</sup> তাদেরকে সে অগ্নিশিখা উচ্চ স্বরে নিজের কাছে ঢাকবে।

বছরের সমান। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যারা বিদ্রূপ করে আয়াব দাবী করছে তাদের এসব কথায় দৈর্ঘ্য ধারণ করুন। তারপর বলা হচ্ছে, এসব লোক আয়াবকে দূরে মনে করছে। কিন্তু আমি দেখছি তা অত্যাসন। এসব বক্তব্যের প্রতি সামঞ্জিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানুষ তার ঘন-মানসিকতা, চিন্তা ও দৃষ্টির পরিসর সংকীর্ণ হওয়ার কারণে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলীকে নিজেদের সময়ের মান অনুযায়ী পরিমাপ করে থাকে। তাই একশো বছর বা পঞ্চাশ বছর সময়ও তাদের কাছে অত্যন্ত দীর্ঘ সময় বলে মনে হয়। কিন্তু আল্লাহর এক একটি পরিকল্পনা হাজার হাজার বছর বা লাখ লাখ বছর মেয়াদের হয়ে থাকে। এ সময়টিও বলা হয়েছে উদাহরণ হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে মহা বিশ্ব ভিত্তিক পরিকল্পনা লক্ষ লক্ষ ও শত শত কোটি বছর মেয়াদেরও হয়ে থাকে। এসব পরিকল্পনার মধ্য থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার অধীনে এ পৃথিবীতে মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর একটা নির্দিষ্ট সময় দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী তাদেরকে এখানে একটি বিশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করার অবকাশ দেয়া হবে। কোন মানুষই জানে না এ পরিকল্পনা কখন শুরু হয়েছে, তা কার্যকরী করার জন্য কি পরিমাণ সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার

পরিসমাপ্তির জন্য কোন মুহূর্তটি নির্ধারিত করা হয়েছে, যে মুহূর্তটিতে কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভকারী সমস্ত মানুষকে এক সাথে জীবিত করে উঠিয়ে বিচার করার জন্য কোন সময়টি ঠিক করে রাখা হয়েছে। আমরা এ মহা পরিকল্পনার ততটুকুই কেবল জানি যেটুকু আমাদের চোখের সামনে সংঘটিত হচ্ছে অথবা অতীত মহাকালে সংঘটিত ঘটনাবলীর যে আংশিক ইতিহাসটুকু আমাদের সামনে বিদ্যমান আছে। এর সূচনা ও পরিণতি সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, সে সম্পর্কে জানি তো দূরের কথা তা বুঝাও আমাদের সাধ্যাতীত। তাই এর পেছনে যে দর্শন ও রহস্য কাহু করছে তা বুঝার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। এখন কথা হলো, যেসব লোক দায়ী করছে যে, এ পরিকল্পনা বাদ দিয়ে তার পরিণাম এখনই তাদের সামনে এনে হাজির করা হোক। আর যদি তা না করা হয় তাহলে পরিণাম সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে সেটিই যথ্য, তারা আসলে নিজেদের অজ্ঞতাই প্রমাণ করছে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হাজ্জ, টাকা ৯২-৯৩ এবং আস সাজদা, টাকা ১)

৬. অর্থাৎ এমন ধৈর্য যা একজন মহত উদার ও সাহসী মানুষের মর্যাদার উপযোগী।

৭. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, তারা এ ব্যাপারটিকে অসম্ভব মনে করে। অথচ আমাদের কাছে তা অত্যাসন্ন। দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, তারা কিয়ামতকে অনেক দূরের ব্যাপার বলে মনে করে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে তা এত কাছের যেন আগামীকালই সংঘটিত হবে।

৮. একদল মুফাসিসির এ আয়াতাশকে আয়াতাশের সাথে সম্পৃক্ত বলে ধরে নিয়েছেন। তারা বলেনঃ যে দিনটির স্থায়িত্ব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে সেটি কিয়ামতের দিন। মুসনাদে আহমাদ ও তাফসীরে ইবনে জারীরে হয়েত আবু সায়ীদ খুরী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতটি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হলো, তাহলে তো সেদিনটি খুবই দীর্ঘায়িত হবে। একথা শুনে তিনি বলেনঃ “যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সন্তান শপথ, একটি ফরয নামায পড়তে দুনিয়াতে যেটুকু সময় লাগে একজন ইমানদারের জন্য সেদিনটি তার চাইতেও সংক্ষিপ্ত হবে।” এটি সহীহ সনদে বর্ণিত রেওয়ায়াত হলে এটি ছাড়া এ আয়াতের অন্য কোন ব্যাখ্যা করার অবকাশই থাকতো না। হাদীসটির সনদে উল্লেখিত বর্ণনাকারী দাররাজ এবং তার উত্তাদ আবুল হাইসাম উভয়েই যয়ীফ।

৯. অর্থাৎ বার বার রং পরিবর্তিত হবে।

১০. পাহাড়সমূহের রং যেহেতু তিনি তিনি তাই যখন তা স্থানচূর্ণ ও জনহীন হয়ে উঠতে থাকবে তখন মনে হবে যেন রংবেরয়ের ধূমিত পশম বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

১১. অর্থাৎ তারা একজন আরেকজনকে দেখতে পাবে না বলে জিজ্ঞেস করবে না তা নয়। বরং অন্যের ব্যাপারে যা ঘটছে তা প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখতে পাবে। কিন্তু তা সন্ত্রেণ সে তাকে জিজ্ঞেস করবে না। কেননা, সে তখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

১২. এ স্থানে ও আখেরাতে মানুষের মন্দ পরিণামের দু'টি কারণ বলা হয়েছে যা সূরা আল হাজ্জার ৩৩ ও ৩৪ আয়তে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হলো হক থেকে ফিরে যাওয়া এবং ইমান আনয়নে অবীকৃতি। অপরটি হলো দুনিয়া পূজা ও কৃপণতা। এ কারণেই মানুষ সম্পদ জয়া করে এবং কোন কল্যাণকর কাজের জন্য তা ব্যবচ করে না।

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلْوَعًا ۝ إِذَا مَسَهُ الشَّرْجَزُ وَعًَا ۝ وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرَ  
 مَنْوَعًا ۝ إِلَّا الْمُصْلِينَ ۝ الَّذِينَ هُرَىٰ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝ وَالَّذِينَ  
 فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمُحْرِمُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَصِدِّقُونَ  
 بِيَوْمِ الْحِسْبَارِ ۝ وَالَّذِينَ هُرِّيَّ مِنْ عَلَىٰ أَبْرَيْهِمْ مَشْفِقُونَ ۝

মানুষকে ছোট মনের অধিকারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে।<sup>১৩</sup> বিপদ-মুসিবতে পড়লেই সে ঘাবড়ে যায়, আর যে-ই সজ্জলতার মুখ দেখে অমনি সে কৃপণতা করতে শুরু করে। তবে যারা নামায পড়ে<sup>১৪</sup> (তারা এ দোষ থেকে মুক্ত)। যারা নামায আদায়ের ব্যাপারে সবসময় নিষ্ঠাবান।<sup>১৫</sup> যাদের সম্পদে নির্দিষ্ট হক আছে প্রাপ্তি ও বাস্তিদের।<sup>১৬</sup> যারা প্রতিফলের দিনটিকে সত্য বলে মনে।<sup>১৭</sup> যারা তাদের প্রভুর আযাবকে ভয় করে।<sup>১৮</sup>

১৩. যে বিষয়টিকে আমরা আমাদের ভাষায় এভাবে বলে থাকি যে, “এটি মানুষের প্রকৃতিগত অথবা এটা তার সহজাত দুর্বলতা” সে বিষয়টিকে আগ্রাহ এভাবে বর্ণনা করেন যে, “মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে এভাবে”। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, কুরআন মঙ্গীদের বহু জায়গায় মানব জাতির সাধারণ নৈতিক দুর্বলতা উল্লেখ করার পর ঈমান ও সত্যের পথ অনুসরণকারীদের তা থেকে ব্যক্তিগত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়টিই বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে এ সত্যটি আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মানুষের জন্মাত এসব দুর্বলতা অপরিবর্তনীয় নয়। বরং আগ্রাহের দেয়া হিদায়াত গ্রহণ করে মানুষ যদি আত্মশক্তির জন্য সত্যিকার প্রচেষ্টা চালায় তাহলে সে এসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে। পক্ষান্তরে যদি সে তার প্রবৃত্তিকে লাগামহীনতাবে ছেড়ে দেয় তাহলে দুর্বলতাগুলো তার মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে যায়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আবিয়া, টাকা ৪১; সূরা আয যুমার, টাকা ২৩ থেকে ২৮ এবং সূরা আশুরা, টাকা ৭৫)

১৪. কোন ব্যক্তির নামায পড়ার অপরিহার্য অর্থ হলো সে আগ্রাহ, রসূল, কিতাব ও আখ্যেরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে এবং সাথে সাথে নিজের এ বিশ্বাস অন্যায়ী কাজ করার প্রচেষ্টাও চালিয়ে যায়।

১৫. অর্থাৎ কোন প্রকার অলসতা, আরামপ্রিয়তা, ব্যস্ততা কিংবা আকর্ষণ তাদের নামাযের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। নামাযের সময় হলে সেু সুবক্তু ফেলে রেখে তার প্রভুর ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত হয়। **عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ**—এর আর একটি অর্থ বর্ণনা করেছেন হ্যরত উকবা ইবনে আমের। তাহলো, সে পূর্ণ প্রশংস্তি এবং বিনয় ও নিষ্ঠাসহ নামায পড়ে, কাকের মত ঠোকর মারে না। ঠোকর

إِنَّ عَلَىٰ أَبَرَبِهِمْ غَيْرَ مَأْمُونٍ<sup>④</sup> وَالَّذِينَ هُمْ لِفَرْوَجِهِمْ حَفِظُونَ<sup>⑤</sup>  
 إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَالِكَتْ أَيْمَانِهِمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرَ مَلْوَمِينَ<sup>⑥</sup> فَمَنِ ابْتَغَ  
 وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ<sup>⑦</sup> وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَهِمْ وَعَمِلُهُمْ  
 رُعُونٌ<sup>⑧</sup> وَالَّذِينَ هُمْ يُشْهَدُونَ تِهْرِقَائِمُونَ<sup>⑨</sup> وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ  
 يَكَافِظُونَ<sup>⑩</sup> أُولَئِكَ فِي جَنَّتٍ مَكْرُمُونَ<sup>⑪</sup>

কারণ তাদের প্রভূর আয়াব এমন বস্তু নয় যে সম্পর্কে নির্ভয় থাকা যায়। যারা নিজেদের লজ্জাহান নিজের স্ত্রী অথবা মালিকানাধীন স্ত্রীলোকদের ছাড়া অন্যদের থেকে হিফায়ত করে।<sup>১৯</sup> স্ত্রী ও মালিকানাধীন স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে তারা তিরস্কৃত হবে না। তবে যারা এর বাইরে আর কেউকে চাইবে তারা সীমালংঘনকারী।<sup>২০</sup> যারা আমানত রক্ষা করে ও প্রতিশ্রূতি পালন করে।<sup>২১</sup> আর যারা সাক্ষ দানের ক্ষেত্রে সততার উপর অট্টল থাকে।<sup>২২</sup> যারা নামাযের হিফায়ত করে।<sup>২৩</sup> এসব লোক সশ্বানের সাথে জানাতের বাগানসমূহে অবস্থান করবে।

মেরেই কোন রকমে নামায শেষ করার চেষ্টা করে না। আবার নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক তাকিয়েও দেখে না। প্রচলিত আরবী বাকরীতিতে বক্স বা হির পানিকে মাদান্স বলা হয়। এরই আলোকে এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬. সূরা যারিয়াতের ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে, “তাদের সম্পদে প্রার্থী এবং বক্ষিতদের নিদিষ্ট হক আছে।” কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে নিদিষ্ট হকের অর্থ মনে করেছেন ফরয যাকাত। কারণ ফরয যাকাতেই নেসাব ও হার দু'টিই নিদিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সূরা মা'আরিজ সর্বসম্মত মতে মক্কায় অবতীর্ণ সূরা। কিন্তু নেসাব ও হার নিদিষ্ট করে যাকাত ফরয হয়েছে মদীনায়। অতএব হকের সঠিক অর্থ হলো, প্রার্থী ও বক্ষিতদের জন্য তারা নিজেরাই নিজেদের সম্পদে একটা অংশ নিদিষ্ট করে রেখেছে। এটাকে তাদের হক মনে করে তারা নিজেরাই তা দিয়ে দেয়। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, মুজাহিদ, শা'বী এবং ইবরাহিম নাখরী এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

প্রার্থী মানে পেশাদার ভিক্ষুক নয়, বরং যেসব অভাবী মানুষ অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হয় তারা। আর বক্ষিত অর্থ এমন গোক যার কোন আয়-উপার্জন নেই। অথবা সে উপার্জনের জন্য চেষ্টা করে ঠিকই কিন্তু তাতে তার প্রয়োজন পূরণ হয় না। অথবা কোন দুঃঘটনা বা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে অথবা আয়-উপার্জনের সামগ্রী নেই। এ

ধরনের লোকদের ব্যাপারে যখনই জানা যাবে যে, তারা প্রকৃতই বঞ্চিত তখন একজন আল্লাহভীর মানুষ এ জন্য অপেক্ষা করে না যে, সে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করক। বরং তার বঞ্চিত থাকার কথা জানা মাত্র সে নিজেই অগ্রসর হয়ে তাকে সাহায্য করে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা যারিয়াত, টীকা ১৭)

১৭. অর্থাৎ দুনিয়াতে নিজেকে দায়িত্বীন এবং জবাবদিহি থেকে মুক্ত মনে করে না। বরং এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, একদিন আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে তাদেরকে নিজেদের সব কাজের হিসেব দিতে হবে।

১৮. অন্য কথায় তাদের অবস্থা কাফেরদের মত নয়। কাফেররা দুনিয়াতে সব রকম গোনাই, অপরাধ ও জুনুম-অত্যাচারে লিঙ্গ থেকেও আল্লাহকে ত্য করে না। কিন্তু তারা নিজস্বভাবে যথাসম্ভব নৈতিকতা ও কাজ-কর্মে সদাচারণ করা সত্ত্বেও সবসময় আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। সবসময় তারা এ আশংকা করে যে, আল্লাহর আদালতে আমাদের অট্টি-বিচ্যুতি আমাদের নেক কাজের তুলনায় অধিক বলে প্রমাণিত না হয় এবং এভাবে আমরা শাস্তির উপর্যুক্ত বলে প্রমাণিত না হই। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মু'মিনুন, টীকা ৫৪ এবং সূরা আয যারিয়াত, টীকা ১৯)

১৯. লজ্জাস্থানের হিফায়তের অর্থ ব্যতিচার না করা এবং উলঙ্ঘনা থেকেও দূরে থাকা। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মু'মিনুন, টীকা ৬; আন নূর, টীকা ৩০-৩২ এবং আল আহ্যাব, টীকা ৬২)।

২০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল-মু'মিনুন, টীকা-৭।

২১. আমানতসমূহ বলতে এমন সব আমানত বুঝায়, যা আল্লাহ তা'আলা বান্দার হাতে সোপর্দ করেছেন এবং একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের ওপর আঁহা স্থাপন করে 'আমানত' হিসেবে অর্পণ করে। ঠিক তেমনি চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি মানে বান্দা আল্লাহর সাথে যে চুক্তি বা প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয় এবং মানুষ পরম্পরের সাথে যেসব চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয় এ উভয় প্রকার চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি। এ উভয় প্রকার আমানত এবং উভয় প্রকার চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা একজন মু'মিনের চরিত্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট। হাদীসে হয়রত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলস্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে যে বক্তব্যই পেশ করতেন তাতে অবশ্যই বলতেন :

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

"সাবধান, যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই। আর যে অংগীকার বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তার মধ্যে দীনদারী নেই। (বায়হাকী-শ'আবুল ঈমান)।

২২. অর্থাৎ তারা সাক্ষ যেমন গোপন করে না, তেমনি তাতে তেমন কোন কর্ম-বেশীও করে না।

২৩. এ থেকে নামাযের গুরুত্ব বুঝা যায়। যে ধরনের উন্নত চরিত্র ও মহৎ কর্মশীল লোক জানাতের উপর্যুক্ত তাদের গুণাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে নামায দিয়ে শুরু করা হয়েছে এবং নামায দিয়েই শেষ করা হয়েছে। তাদের প্রথম গুণ হলো তারা হবে নামাযী।

فَهَمَّالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مَهْتَعِينٌ ۝ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَاءِ عَزِيزٌ ۝  
 أَيْطَعُمُ كُلَّ أَمْرٍ يِنْهَمُ أَنْ يَلْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ۝ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَا مِمَّا  
 يَعْلَمُونَ ۝ فَلَا أَقِسْمُ بَرَبَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقِيلُ رُونَ ۝  
 عَلَىٰ أَنْ نَبْلِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ۝ وَمَا نَحْنُ بِمُسْبِقِينَ ۝ فَلَرَهْمَ يَخْوُضُوا  
 وَلَعْبُوًا حَتَّىٰ يُلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝ يَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ  
 الْأَجَلِ اثْسِرَاعًا كَانَهُمْ إِلَىٰ نَصْبِ يَوْفِضُونَ ۝ حَاسِعَةً أَبْصَارُهُمْ  
 تَرْهِقُهُمْ ذَلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝

## ২ রক্তু'

অতএব হে নবী, কি ব্যাপার যে, এসব কাফের ডান দিক ও বাম দিক ইতে দলে দলে তোমার দিকে ছুটে আসছে? ২৪ তাদের প্রত্যেকে কি এ আশা করে যে, তাকে প্রাচুর্যে ভরা জানাতে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হবে? ২৫ কখনো না। আমি যে জিনিস দিয়ে তাদের সৃষ্টি করেছি তারা নিজেরা তা জানে। ২৬ অতএব না, ২৭ আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের মালিকের। ২৮ আমি তাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর লোকদেরকে তাদের স্থলাভিয়ন্ত করতে সক্ষম। আমাকে পেছনে ফেলে যেতে পারে এমন কেউ-ই নেই। ২৯ অতএব তাদেরকে অথবীন কথাবার্তা ও খেল-তামাসায় মন্ত থাকতে দাও, যেদিনটির প্রতিশ্রূতি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে যতদিন না সেদিনটির সাক্ষাত তারা পায়। সেদিন তারা কবর থেকে বেরিয়ে এমনভাবে দৌড়াতে থাকবে যেন তারা নিজেদের দেব-প্রতিমার আস্তানার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ৩০ সেদিন চক্ষু হবে আনত, লাঞ্ছনা তাদের আচ্ছন্ন করে রাখবে। ঐ দিনটিই সেদিন যার প্রতিশ্রূতি এদেরকে দেয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয় গুণ হলো, তারা হবে নামাযের প্রতি নিষ্ঠাবান এবং সর্বশেষ গুণ হলো, তারা নামাযের হিফায়তের অর্থ অনেক কিছু। যথা সময়ে নামায পড়া, দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পাক-পবিত্র আছে কিনা নামাযের পূর্বেই সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, অযু থাকা এবং অযু করার সময় অংগ-প্রত্যঙ্গগুলো ভালভাবে ধোয়া, নামাযের ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাবগুলো ঠিকভাবে আদায় করা, নামাযের নিয়ম-কানুন

পুরোপুরি মেনে চলা, আল্লাহর নাফরমানী করে নামাযকে ধ্রঃ না করা, এসব বিষয়ও নামাযের হিফায়তের অন্তরভুক্ত।

২৪. যে সমস্ত লোক নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ দেবে এবং কুরআনের বক্তব্য শুনে তা নিয়ে হাসি-তামাসা করা এবং তার প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করার জন্য চারদিক থেকে ছুটে আসতো এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে।

২৫. অর্থ হলো যেসব লোকের বৈশিষ্ট ও গুণাবলী এই মাত্র বর্ণনা করা হলো আল্লাহর জামাত তো তাদের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু যারা সত্যের বাণী শোনা পর্যন্ত পছন্দ করে না এবং ন্যায় ও সত্যের কঠিকে শুন্দ করে দেয়ার জন্য এভাবে ছুটে আসছে তারা জামাতের দাবীদার কিভাবে হতে পারে? আল্লাহ কি এমন সব লোকদের জন্যই তাঁর জামাত তৈরী করেছেন? এ পর্যায়ে সূরা আল কলমের ৩৪ থেকে ৪১ আয়াত সামনে থাকা দরকার। যদ্কার কাফেররা বলতো, আবেরাত যদি থাকেও তাহলে এ দুনিয়ায় তারা যেভাবে আমোদ প্রমোদে মন্ত থাকছে, সেখানেও একইভাবে মন্ত থাকবে। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান পোষণকারী লোকেরা দুনিয়ায় যেভাবে দুরবহুর শিকার হয়ে আছে সেখানেও ঠিক তাই থাকবে। উল্লেখিত আয়াতসমূহে কাফেরদের এ ধ্যান-ধারণার জবাব দেয়া হয়েছে।

২৬. এখানে এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ হতে পারে। আগে বর্ণিত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ধরে নিলে এর অর্থ হবে, যে উপাদানে এসব লোককে সৃষ্টি করা হয়েছে সে হিসেবে সব মানুষ সমান। জামাতে যাওয়ার কারণ যদি ঐ উপাদানটি হয় তাহলে সৎ ও অসৎ, জালেম ও ন্যায়নিষ্ঠ, অপরাধী ও নিরপরাধ সবারই জামাতে যাওয়া উচিত। কিন্তু জামাতে যাওয়ার অধিকার যে মানুষের সৃষ্টির উপাদানের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় না বরং শুধু তাঁর গুণাবলীর ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টির ফায়সালার জন্য সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিই যথেষ্ট। আর এ আয়াতাংশকে যদি পরবর্তী বিষয়ের পূর্বভাস বা ভূমিকা হিসেবে ধরে নেয়া হয় তাহলে তাঁর অর্থ হবে এসব লোক নিজেরাই নিজেদেরকে আমার আয়াব থেকে নিরাপদ মনে করছে আর যে ব্যক্তি আমার কাছে জবাবদিহি সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করে দেয় তাকে বিদ্রূপ ও হাসি-তামাসা করছে। অর্থে আমি চাইলে যখন ইচ্ছা দুনিয়াতেও তাদেরকে আয়াব দিতে পারি আবার যখন ইচ্ছা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেছি এবং তারপর তাদেরকে সচল ও সক্ষম মানুষ বানিয়েছি। তাদের এ সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে যদি তারা চিন্তা-ভাবনা করতো তাহলে কখনো এ ভাস্ত ধারণার বশবর্তী তারা হতো না যে, এখন তারা আমার কর্তৃত্বের গভির বাইরে কিংবা আমি তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নই।

২৭. অর্থাৎ তারা যা মনে করে বসে আছে ব্যাপার আসলে তা নয়।

২৮. এখানে মহান আল্লাহ নিজেই নিজের সন্তার শপথ করেছেন। “উদয়াচলসমূহ ও অস্তচলসমূহ” এ শব্দ ব্যবহারের কারণ হলো, গোটা বছরের আবর্তন কালে সূর্য প্রতিদিনই একটি নতুন কোণ থেকে উদিত হয় এবং একটি নতুন কোণে অস্ত যায়।

১০। তাছাড়াও ভূগৃহের বিভিন্ন অংশে সূর্য তিনি তিনি সময়ে ক্রমাগত উদিত ও অস্তমিত হতে থাকে। এ হিসেবে সূর্যের উদয় হওয়ার ও অন্ত যাওয়ার স্থান একটি নয়, অনেক। আরেক হিসেবে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের তুলনায় একটি দিক হলো পূর্ব এবং আরেকটি দিক হলো পশ্চিম। তাই, সূরা শু'আরার ২৮ আয়াতে এবং সূরা মুয়াম্বিলের ১৯ আয়াতে **شَدٌّ بَرِّ** **رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরেক বিচারে পৃথিবীর দু'টি উদয়াচল এবং দু'টি অস্তাচল আছে। কারণ পৃথিবীর এক গোলার্ধে যখন সূর্য অন্ত যায় তখন ভূপুর গোলার্ধে উদিত হয়। এ কারণে সূরা আর রাহমানের ১৭ আয়াতে **رَبُّ لِمَشْرِقَيْنَ** **وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنَ** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আর রাহমান, চীকা ১৭)

২৯. একথাটির জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'টি উদয়াচল ও দু'টি অস্তাচলের মালিক হওয়ার শপথ করেছেন। এর অর্থ হলো, আমি যেহেতু উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের মালিক তাই গোটা পৃথিবীই আমার কর্তৃতাধীন। আমার কর্তৃত ও পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়া তোমাদের সাধ্যাভীত। যখন ইচ্ছা আমি তোমাদেরকে ধৰ্ম করতে পারি এবং তোমাদের চাইতে উৎকৃষ্টতর কোন জাতির উত্থান ঘটিয়ে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে পারি।

৩০. মূল আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হলো **الْمُصْبِبُ يُؤْفِضُ إِلَى نَصْبٍ** শব্দের অর্থের ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। অনেকে এর অর্থ করেছেন মূর্তি বা প্রতিমা। তাদের মতে এর অর্থ হলো, তারা হাশরের অধিপতির নির্ধারিত জায়গার দিকে দৌড়িয়ে অঘসর হতে ধাকবে ঠিক; আজ যেমন তারা তাদের দেব-দেবীর আস্তানার দিকে ছুটে যায়। আবার অন্য আরেক দল মুফাস্সিরের মতে এর অর্থ দৌড়ে অংশ গ্রহকারীদের জন্য চিহ্নিত গন্তব্য স্থল। প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী যাতে সবার আগে সেখানে পৌছতে চেষ্টা করে।

নৃহ

৭১

### নামকরণ

'নৃহ' এ সূরার নাম। এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও 'নৃহ'। কারণ এতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হয়েরত 'নৃহ' আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

### নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এটিও রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের অন্যতম। তবে এর বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, যে সময় রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের বিরুদ্ধে মকার কাফেরদের শক্রতামূলক আচরণ বেশ তীব্রতা লাভ করেছিল তখন এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল।

### বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এতে হয়েরত নৃহ আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তা কেবল কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্যে করা হয়নি। বরং এর উদ্দেশ্য মকার কাফেরদের এ মর্মে সাবধান করা যে, হয়েরত নৃহ আলাইহিস সালামের সাথে তার কওম যে আচরণ করেছিল তোমরাও হয়েরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সে একই আচরণ করছো। তোমরা যদি এ আচরণ থেকে বিরত না হও তাহলে তোমাদেরও সে একই পরিগতির সম্মুখীন হতে হবে যার সম্মুখীন হয়েছিল এ সব লোকেরা। গোটা সূরার মধ্যে একথাটি স্পষ্ট ভাষায় কোথাও বলা হয়নি। কিন্তু যে অবস্থা ও পরিস্থিতিতে মকাবাসীদের এ কাহিনী শুনানো হয়েছে তার পটভূমিতে এ বিষয়টি আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যে সময় আল্লাহ তা'আলা হয়েরত নৃহ আলাইহিস সালামকে রিসালাতের পদ মর্যাদায় অভিসিঞ্চ করেছিলেন সে সময় তার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন প্রথম আয়াতে তা বলা হয়েছে।

তিনি তাঁর দাওয়াত কিভাবে শুরু করেছিলেন এবং খজাতির মানুষের সামনে কি বক্তব্য পেশ করেছিলেন।

২ থেকে ৪ আয়াতে তা সংক্ষিপ্তাকারে বলা হয়েছে, এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরণ করার পর তার যে বর্ণনা হয়েরত

নৃহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে পেশ করেছিলেন ৫ থেকে ২০ আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি তাঁর জাতিকে সত্য পথে আনার জন্য কিভাবে চেষ্টা-সাধনা করেছেন আর তাঁর জাতির লোকেরা কি রকম হঠকারিতার মাধ্যমে তাঁর বিরোধিতা করেছে এ পর্যায়ে তিনি তাঁর সবই তাঁর প্রভূর সামনে পেশ করেছেন।

এরপর ২১ থেকে ২৪ আয়াতে হয়রত নৃহ আলাইহিস সালামের শেষ আবেদনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তিনি মহান আল্লাহর কাছে এ মর্মে আবেদন করছেন যে, এ জাতি আমার দাওয়াত চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরা তাদের নেতাদের হাতে নিজেদের লাগাম তুলে দিয়েছে এবং বিরাট ও ব্যাপক ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করেছে। এখন তাদের থেকে হিদায়াত গ্রহণ করার শুভবুদ্ধি ও যোগ্যতা ছিনিয়ে নেয়ার সময় এসে গেছে। হয়রত নৃহ আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে এটা কোন প্রকার অধৈর্যের বাহিপ্রকাশ ছিল না। বরং শত শত বছর ধরে দৈর্ঘ্যের চরম পরীক্ষার মত পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে দীনের তাৎপীঁগের দায়িত্ব আজ্ঞাম দেয়ার পর যে সময় তিনি তাঁর কওমের ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে গেলেন কেবল তখনই তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, এখন এ জাতির সত্য ও ন্যায়ের পথে আসার আর কোন সংজ্ঞাবনাই অবশিষ্ট নেই। তাঁর এ সিদ্ধান্ত ছিল হবহ আল্লাহ তা'আলার ফারাসানার অনুরূপ। তা-ই এর পরবর্তী ২৫ আয়াতেই বলা হয়েছে। এ জাতির কৃতকর্মের কারণে তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আয়াব নাযিল হলো।

আয়াব নাযিল হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হয়রত নৃহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার কাছে যে দোয়া করেছিলেন শেষ আয়াতটিতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তিনি নিজের ও ইমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন এবং নিজ কওমের কাফেরদের জন্য এ মর্মে আল্লাহর কাছে আবেদন করছেন যেন তাদের কাউকেই পৃথিবীর বুকে বসবাস করার জন্য জীবিত রাখা না হয়। কারণ, তাদের মধ্যে এখন আর কোন কল্যাণই অবশিষ্ট নেই। তাই তাদের প্রেরণে এখন যারাই জন্মলাভ করবে তারাই কাফের এবং পাপী হিসেবেই বেড়ে উঠবে।

এ সূরা অধ্যয়নকালে ইতিপূর্বে কুরআন মজীদে হয়রত নৃহ আলাইহিস সালামের কাহিনীর যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে তাও সামনে থাকা দরকার। দেখুন, সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ৫৯ থেকে ৬৪; ইউনুস, ৭১ থেকে ৭৩; হৃদ, ২৫ থেকে ৪৯; আল মু'মিনুন, ২৩ থেকে ৩১; আশ শু'আরা, ১০৫ থেকে ১২২; আল আন্কাবুত, ১৪ ও ১৫; আসূ সাফ্ফাত, ৭৫ থেকে ৮২ এবং আল কামার, ৯ থেকে ১৬ আয়াত পর্যন্ত।

আয়াত ২৮

রাখ ২

## সূরা নৃহ-মঙ্গী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنِ اقْرُبْ كَمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيهِمْ عَذَابٌ  
 الْيَمِينَ<sup>①</sup> قَالَ يَقُولُ إِنِّي لِكُمْ نَذِيرٌ مِّنْ بَيْنِ أَنْفُسِكُمْ إِنِّي أَعْبُدُ وَاللَّهُ وَأَنْتُوَهُ وَأَطِيعُونِي  
 يَغْفِرُ لِكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤْخِرُ كُمْ إِلَى آجَلٍ مُسْمَىٰ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ  
 لَا يُؤْخِرُ مَلِوكَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>②</sup>

আমি নৃহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম (এ নির্দেশ দিয়ে) যে, একটি কষ্টদায়ক আয়াব আসার আগেই তুমি তাদেরকে সাবধান করে দাও।<sup>১</sup>

সে বললো, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী (বার্তাবাহক, আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তাঁকে তয় করো এবং আমার আনুগত্য করো,<sup>২</sup> আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন<sup>৩</sup> এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন।<sup>৪</sup> প্রকৃত ব্যাপার হলো, আল্লাহর নির্ধারিত সময় যখন এসে যায় তখন তা থেকে বাঁচা যায় না।<sup>৫</sup> আহ ! যদি তোমরা তা জানতে,।<sup>৬</sup>

১. অর্থাৎ একথা জানিয়ে দেবেন যে, তারা যে বিভ্রান্তি ও নৈতিক অনাচারের মধ্যে পড়ে আছে যদি তা থেকে বিরত না হয় তাহলে তা তাদের আল্লাহর আয়াবের উপযুক্ত করে দেবে। এ আয়াব থেকে বাঁচার জন্য কোনু পথ অবলম্বন করতে হবে তাও তাদের বলে দেবেন।

২. হ্যরত নৃহ আলাইহিস সালাম তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালনের শুরুতেই তাঁর জাতির সামনে এ তিনটি বিষয় পেশ করেছিলেন। অর্থাৎ এক, আল্লাহর দাসত্ব, দুই, তাকওয়া বা আল্লাহভীতি এবং তিনি, রসূলের আনুগত্য। আল্লাহর দাসত্বের মানে অন্য সব কিছুর দাসত্ব ও গোলামী বর্জন করে এক আল্লাহকেই শুধু উপাস্য মেনে নিয়ে কেবল তাঁরই উপাসনা করা এবং তাঁরই আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। তাকওয়া বা আল্লাহভীতির মানে এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকা যা আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গ্যবের কারণ হয় এবং

○  
 قَالَ رَبِّيْ إِنِّي دُعُوتُ قَوْمِيْ لِي لِلَاوَهَارًا ① فَلَمْ يَرِدْهُرْ دُعَاءِيْ إِلَّا فِرَارًا ②  
 وَإِنِّي كُلَّمَا دُعُوتُهُرْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعْلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا  
 ثِيَابَهُمْ وَأَصْرَوْا وَأَسْتَكْبَرُوا أَسْتَكْبَارًا ③ ثُمَّ إِنِّي دُعُوتُهُرْ جَهَارًا ④  
 ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ⑤ فَقَلْتُ أَسْتَغْفِرُوْرَ بَكْرًا  
 إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ⑥

সেই বললো : হে আমার রব, আমি আমার কওমের লোকদের রাতদিন আহবান করেছি। কিন্তু আমার আহবান তাদের দূরে সরে যাওয়াকে কেবল বাড়িয়েই তুলেছে।<sup>৮</sup> তুমি যাতে তাদের ক্ষমা করে দাও<sup>৯</sup> এ উদ্দেশ্যে আমি যখনই তাদের আহবান করেছি তখনই তারা কানে আঙুল দিয়েছে,<sup>১০</sup> এবং কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিয়েছে, নিজেদের আচরণে অনড় খেকেছে এবং অতি মাত্রায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে।<sup>১১</sup> অতপর আমি তাদেরকে উচ্চকর্ত্তে আহবান জানিয়েছি। তারপর প্রকাশ্যে তাদের কাছে তাবলীগ করেছি এবং গোপনে চুপে চুপে বুঝিয়েছি। আমি বলেছি তোমরা নিজেদের প্রতিপানকের কাছে ক্ষমা চাও। নিসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল।

নিজেদের জীবনে এমন নীতি গ্রহণ করো যা একজন আন্তর্ভুক্ত মানুষের গ্রহণ করা উচিত। আর আমার আনুগত্য করো একথাটির মানে হলো, আন্তর্ভুক্ত রসূল হিসেবে তোমাদের যেসব আদেশ দেই তা মেনে চলো।

৩. মূল ইবারাতে শব্দ আছে যে **يَغْفِرُ لَكُمْ مَنْ ذَنِبْ�ُمْ** এ আয়াতাংশের অর্থ এ নয় যে, আন্তর্ভুক্ত তোমাদের কিছু গোনাহ মাফ করে দেবেন। বরং এর সঠিক অর্থ হলো, যে তিনটি বিষয় তোমাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে তা যদি তোমরা মেনে নাও তাহলে এতদিন পর্যন্ত যে গোনাহ তোমরা করেছো তা সবই আন্তর্ভুক্ত মাফ করে দেবেন। এখানে **মَنْ** শব্দটি অংশবিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

৪. অর্থাৎ যদি তোমরা এ তিনটি বিষয় মেনে নাও তাহলে আন্তর্ভুক্ত তা'আলা তোমাদের স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য যে সময় নির্ধারিত রেখেছেন সে সময় পর্যন্ত এ পৃথিবীতে তোমাদের বৈচে থাকার অবকাশ দেয়া হবে।

৫. কোন কওমের ওপর আয়াব নাযিল করার জন্য আন্তর্ভুক্ত তা'আলা যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এখানে সে সময়টিকে বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কোন কওমের জন্য আয়াবের ফায়সালা হয়ে যাওয়ার পর ইমান আনলেও তাদের আর মাফ করা হয় না।

يَرِسْلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَأْيٍ<sup>⑪</sup> وَيَمْلِدُكُمْ بِآمَوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ  
 لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَرًا<sup>⑫</sup> مَالِكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا<sup>⑬</sup> وَقَدْ خَلَقُوكُمْ  
 أَطْوَارًا<sup>⑭</sup> الْأَرْتُرَوَا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا<sup>⑮</sup> وَجَعَلَ الْقَمَرَ  
 فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاحًا<sup>⑯</sup> وَاللَّهُ انْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
 نَبَاتًا<sup>⑰</sup> ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا<sup>⑱</sup> وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ  
 بِسَاطًا<sup>⑲</sup> لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِي جَاجَا<sup>⑳</sup>

তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষাবেন। সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন, তোমাদের জন্য বাগান সৃষ্টি করবেন আর নদী-নালা প্রবাহিত করে দিবেন।<sup>১২</sup> তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর মাহাত্ম্য, প্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে বলে মনে করছো না।<sup>১৩</sup> অথচ তিনিই তোমাদের পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।<sup>১৪</sup> তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ কিভাবে সাত ত্বুরে বিন্যস্ত করে আস্মান সৃষ্টি করেছেন? ওগুলোর মধ্যে চৌকে আলো এবং সূর্যকে প্রদীপ হিসেবে স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মাটি থেকে বিশ্বকরণপে উৎপন্ন করেছেন।<sup>১৫</sup> আবার এ মাটির মধ্যে তোমাদের ফিরিয়ে নেবেন এবং অক্ষাৎ এ মাটি থেকেই তোমাদের বের করে আনবেন। আল্লাহ ভূপৃষ্ঠাকে তোমাদের জন্য বিছানার মত করে পেতে দিয়েছেন। যেন তোমরা এর প্রশংসন পথে চলতে পার।

৬. অর্থাৎ যদি তোমরা এ বিষয়টি বুঝতে যে, আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার বাণী তোমাদের কাছে পৌছার পর যে সময়টা অতিবাহিত হচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য একটা অবকাশ। তোমাদেরকে এ অবকাশ দেয়া হয়েছে ইমান আনয়নের জন্য। এ অবকাশের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি পাওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই। এ অবস্থায় ইমান আনয়নের জন্য তোমরা দ্রুত এগিয়ে আসবে। আযাব আসার সময় পর্যন্ত তা আর বিলবিত করবে না।

৭. মাঝখালে একটা দীর্ঘকালের ইতিহাস বাদ দিয়ে নৃহ আলাইহিস সালামের আবেদন তুলে ধরা হচ্ছে যা তিনি তাঁর রিসালাতের শেষ যুগে আল্লাহর সামনে পেশ করেছিলেন।

৮. অর্থাৎ আমি যতই তাদেরকে আহবান করেছি তারা ততই দূরে সরে গিয়েছে।

০

০

৯. এর মধ্যেই একথাটি নিহিত আছে যে, তারা নাফরমানীর আচরণ পরিহার করে ক্ষমাপ্রার্থী হবে। কারণ কেবল এভাবেই তারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভ করতে পারতো।

১০. মুখ ঢাকার একটি কারণ হতে পারে, তারা হ্যরত নৃহ আলাইহিস সালামের বক্তব্য শোনা তো দূরের কথা তাঁর চেহারা দেখাও পছন্দ করতো না। আরেকটি কারণ হতে পারে, তারা তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ ঢেকে চলে যেতো যাতে তিনি তাদের চিনে কথা বলার কোন সুযোগ আদৌ না পান। কাকার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের সাথে যে ধরনের আচরণ করছিলো সেটিও ছিল অনুরূপ একটি আচরণ। সূরা হৃদের ৫ আয়াতে তাদের এ আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে “দেখ, এসব লোক তাদের বক্ষ ঘুরিয়ে নেয় যাতে তারা রসূলের চোখের আড়ালে থাকতে পারে। সাবধান। যখন এরা কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে ঢেকে আড়াল করে তখন আল্লাহ তাদের প্রকাশ্য বিষয়গুলোও জানেন এবং গোপন বিষয়গুলোও জানেন। তিনি তো মনের মধ্যকার গোপন কথাও জানেন। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হৃদ, টাকা ৫ ও ৬)

১১. এখানে ক্রতৃ বা উদ্ধৃত্যের মানে হলো তারা ন্যায় ও সত্যকে মেনে নেয়া এবং আল্লাহর রসূলের উপদেশ গ্রহণ করাকে তাদের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের তুলনায় নীচু কাজ বলে মনে করেছে। উদাহরণ ব্রহ্মপ কোন সৎ ও ভাল লোক যদি কোন দুশ্চরিত্ব ব্যক্তিকে উপদেশ দান করে আর সে জন্য ঐ ব্যক্তি ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে পড়ে এবং মাটিতে পদাঘাত করে বেরিয়ে যায় তাহলে বুঝা যাবে যে, সে উদ্ধৃত্যের সাথে উপদেশ বাণী প্রত্যাখ্যান করেছে।

১২. একথাটি কুরআন মজীদের বিভিন্ন হালে বলা হয়েছে যে, আল্লাহদ্বোহিতার আচরণ মানুষের জীবনকে শুধু আখেরাতেই নয় দুনিয়াতেও সংকীর্ণ করে দেয়। অপর পক্ষে কোন জাতি যদি অবাধ্যতার বদলে ঈমান, তাকওয়া এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মনে চলার পথ অনুসরণ করে তাহলে তা শুধু আখেরাতের জন্যাই কল্যাণকর হয় না, দুনিয়াতেও তার উপর আল্লাহর অশেষ নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। সূরা ত্বা-হায় বলা হয়েছে : “যে আমার শরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার দুনিয়ার জীবন হবে সংকীর্ণ। আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অঙ্ক করে উঠাবো।” (আয়াত ১২৪) সূরা মা-য়েদায় বলা হয়েছেঃ “আহলে কিতাব যদি তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত ‘তাওরাত’, ‘ইনয়াল’ ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিধানাবলী মনে চলতো তাহলে তাদের জন্য উপর থেকেও রিয়িক বর্ষিত হতো এবং নীচ থেকেও ফুটে বের হতো।” (আয়াত ৬৬) সূরা আ’রাফে বলা হয়েছেঃ জনপদসমূহের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়ার নীতি অনুসরণ করতো তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতের দরজাসমূহ খুলে দিতাম। (আয়াত ৯৬) সূরা হৃদে বর্ণিত হয়েছে যে, হ্যরত হৃদ আলাইহিস সালাম তাঁর কওমের লোকদের বললেন : “হে আমার কওমের লোকেরা, তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো, তার দিকে ফিরে যাও। তিনি তোমাদের উপর আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তি ও ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দেবেন।” (আয়াত ৫২) খোদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামকে দিয়ে কাকার লোকদের সর্বোধন করে এ সূরা হৃদেই বলা হয়েছে : “আর তোমরা যদি তোমাদের রবের কাছে

ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর দিকে ফিরে আস তাহলে তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের উত্তম জীবনের পক্রণ দান করবেন।” (আয়াত ৩) হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের বললেন : একটি কথা যদি তোমরা মেনে নাও তাহলে আরব ও আজমের শাসনদণ্ডের অধিকারী হয়ে যাবে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা মা-য়মেদাহ, টীকা ১৬; সূরা হৃদ, টীকা ৩ ও ৫৭; সূরা তা-হা, টীকা ১০৫ এবং সূরা সোয়াদের ভূমিকা)।

কুরআন মজীদের এ নির্দেশনা অনুসারে কাজ করতে গিয়ে একবার দুর্ভিক্ষের সময় হয়েরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহ বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বের হলেন এবং শুধু ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেই শেষ করলেন। সবাই বললো, ‘হে আমীরুল্লাহ মু’মিনীন আপনি তো আদৌ দোয়া করলেন না। তিনি বললেন : আমি আসমানের ঐ সব দরজায় করাঘাত করেছি যেখান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। একথা বলেই তিনি সূরা নৃহের এ আয়াতগুলো তাদের পাঠ করে শুনালেন। (ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর) অনুরূপ একবার এক ব্যক্তি হাসান বাসরীর মজলিসে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি বললেন : আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অপর এক ব্যক্তি দারিদ্র্যের অভিযোগ করলো। তৃতীয় এক ব্যক্তি বললো : আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই। চতুর্থ এক ব্যক্তি বললো : আমার ফসলের মাঠে ফলন খুব কম হচ্ছে। তিনি সবাইকে একই জবাব দিলেন। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। লোকেরা বললো : কি ব্যাপার যে, আপনি প্রত্যেকের তিনি তিনি অভিযোগের একই প্রতিকার বলে দিচ্ছেন? তখন তিনি সূরা নৃহের এ আয়াতগুলো পাঠ করে শুনালেন। (কাশশাফ)

১৩. অর্থাৎ দুনিয়ার ছোট ছোট নেতা ও বিশেষ ব্যক্তিদের সম্পর্কে তো তোমরা মনে করো, তাদের মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার পরিপন্থী কোন আচরণ বিপজ্জনক। কিন্তু বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর সম্পর্কে এতটুকুও মনে করো না যে, তিনিও মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অধিকারী সন্তা। তোমরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছো, তাঁর প্রভুত্বের মধ্যে অন্যকে শরীক করছো, তাঁর আদেশ-নিয়েধ অমান্য করছো, এসব সত্ত্বেও তাঁকে তোমরা এতটুকু ভয়ও করো না যে, এ জন্য তিনি তোমাদের শাস্তি দেবেন।

১৪. অর্থাৎ সৃষ্টিকর্মের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করে তোমাদের বর্তমান অবস্থায় পৌছানো হয়েছে। প্রথমে তোমরা বীর্য আকারে মা-বাপের দেহে ছিলে। অতপর আল্লাহর বিধান ও সৃষ্টি কৌশল অনুসারে এ দু’টি বীর্য সংযোগিত হয়ে তোমরা মাত্রগতে স্থিত লাভ করেছিলে। এরপর মাত্রগতে দীর্ঘ নয়টি মাস ধরে দ্রুমবিকাশ ও উরয়ন ঘটিয়ে তোমাদের পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতি দেয়া হয়েছে এবং মানুষ হিসেবে দুনিয়াতে কাজ করার জন্য যে শক্তি ও যোগ্যতার প্রয়োজন তা তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর তোমরা একটি জীবন্ত শিশু হিসেবে মাত্রগত থেকে বেরিয়ে এসেছো, প্রতি মুহূর্তেই একটি অবস্থা থেকে আরেকটি অবস্থায় তোমাদের উত্তরণ ঘটানো হয়েছে। অবশেষে তোমরা যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছো। এসব পর্যায় অতিক্রমকালে প্রতি মুহূর্তেই তোমরা পুরোপুরি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও কবজ্ঞ ছিলে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমার জন্মের জন্য গভ সংঘরাই হতে দিতেন না এবং সে গভে তোমার পরিবর্তে অন্য কেউ স্থিতিলাভ করতো। তিনি চাইলে মাত্রগতেই তোমাদেরকে অঙ্গ, বধির, বোবা কিংবা বিকলাঙ্গ করে দিতেন অথবা তোমাদের

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَنِي وَاتَّبَعُوا مِنْ لَمْ يَرِدْهُ مَآلَهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا  
 خَسَارًا ۝ وَمَكَرُوا مُكْرَارًا ۝ وَقَالُوا لَا تَذَرْنَا إِلَّا تَذَرْنَ  
 وَدًا وَلَا سَوَاعِدًا ۝ وَلَا يَغْفُتْ وَيَعْقُقْ وَنَسْرًا ۝ وَقَدْ أَضْلَلُوا كَثِيرًا ۝ وَلَا تَرِدْ  
 الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَلُ

২ রংকু'

নৃহ বললো : হে প্রভু, তারা আমার কথা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এই সব নেতার অনুসরণ করেছে যারা সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পেয়ে আরো বেশী ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।<sup>১৫</sup> এসব লোক সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করে রেখেছে।<sup>১৬</sup> তারা বলেছে, তোমরা নিজেদের দেব-দেবীদের কোন অবস্থায় পরিত্যাগ করো না। আর ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নাস্রকে<sup>১৭</sup> পরিত্যাগ করো না। অথচ এসব দেব-দেবী বহু লোককে গোমরাহীতে নিষ্কেপ করেছে। তুমিও এসব জালেমদের জন্য গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই বৃক্ষি করো না।<sup>১৮</sup>

বিবেক-বুদ্ধি বিশ্বাস ও ক্রটিপূর্ণ করে দিতেন। তিনি চাইলে তোমরা জীবন্ত শিশুরাপে জন্ম লাভই করতে পারতে না। জন্মাত্তের পরও যে কোন মৃত্যুতে তিনি তোমাদের দ্রুংস করতে পারতেন। তাঁর একটি মাত্র ইঁগিতেই তোমরা কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে যেতে। যে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণে তোমরা এতটা অসহায় তাঁর সম্পর্কে কি করে এ ধারণা পোষণ করে বসে আছো যে, তাঁর সাথে সব রকম উদ্ধৃত্যপূর্ণ ও অকৃতজ্ঞতার আচরণ করা যেতে পারে, তাঁর বিরুদ্ধে সব রকম বিদ্রোহ করা যেতে পারে। কিন্তু এসব আচরণের জন্য তোমাদের কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না?

১৫. এ স্থানে মাটির উপাদান থেকে মানুষ সৃষ্টি করাকে উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়ার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। কোন এক সময় যেমন এই গ্রহে উদ্ভিদরাজি ছিল না। মহান আল্লাহই এখানে উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন। ঠিক তেমনি এক সময়ে এ ভূগূঁষ্ঠে কোন মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ তা'আলাই এখানে তাদের সৃষ্টি করেছেন।

১৬. ষড়যন্ত্রের অর্থ হলো জাতির লোকদের সাথে নেতাদের ধোকাবাজি ও প্রতারণা। নেতারা জাতির লোকদের হয়রত নৃহ আলাইহিস সালামের শিক্ষার বিরুদ্ধে বিবাস্ত ও প্রতারিত করার চেষ্টা করতো। যেমন, তারা বলতো : “নৃহ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আল্লাহর কাছ থেকে তার কাছে অহী এসেছে তা কি করে মেনে নেয়া যায়?” (সূরা আ'রাফ, ৬৩; হৃদ-২৭) “আমাদের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা না বুঝে শুনে নৃহের আনুগত্য করছে। তার কথা যদি সত্যিই মূল্যবান হতো তাহলে জাতির নেতা ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ তার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করতো।” (হৃদ-২৭) “আল্লাহ যদি পাঠাতেই চাইতেন

তাহলে কোন ফেরেশতা পাঠাতেন।” (আল মু’মিনুন, ২৪) এ ব্যক্তি যদি আল্লাহর প্রেরিত রসূল হতেন, তাহলে তাঁর কাছে সবকিছুর ভাগীর থাকতো, তিনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানতেন এবং ফেরেশতাদের মত সব রকম মানবীয় প্রয়োজন ও অভাব থেকে মুক্ত হতেন। (হৃদ, ৩১) নৃহ এবং তার অনুসারীদের এমন কি অলৌকিকত্ব আছে যার জন্য তাদের মর্যাদা ও প্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে হবে? (হৃদ, ২৭) এ ব্যক্তি আসলে তোমাদের মধ্যে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। (আল মু’মিনুন, ২৫) প্রায় এ রকম কথা বলেই কুরাইশ নেতারা লোকদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করতো।

১৭. নৃহের কওমের উপাস্যদের দেবীদের মধ্য থেকে এখানে সেসব দেব-দেবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে পরবর্তীকালে মকাবাসীরা যাদের পূজা করতে শুরু করেছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবের বিভিন্ন স্থানে তাদের মন্দিরও বর্তমান ছিল। এটা অসম্ভব নয় যে, মহা প্রাবন্ধে যেসব লোক রক্ষা পেয়েছিল পরবর্তী বংশধরণ তাদের মুখ থেকে নৃহের (আ) জাতির প্রাচীন উপাস্য দেব-দেবীদের নাম শুনেছিল এবং পরে তাদের বংশধরদের নতুন করে জাহেলিয়াত ছড়িয়ে পড়লে তারা সেসব দেব-দেবীর প্রতিমা তৈরী করে তাদের পূজা অর্চনা শুরু করেছিল।

‘ওয়াদ্দ’ ছিল ‘কুদা’আ’ গোত্রের ‘বনী কালব ইবনে দাবৰা’ শাখার উপাস্য দেবতা। ‘দূমাতুল জান্দাল’ নামক স্থানে তারা এর বেদী নির্মাণ করে রেখেছিল। আরবের প্রাচীন শিলালিপিতে তার নাম ‘ওয়াদ্দাম আবাম’ (ওয়াদ্দ বাপু) উল্লেখিত আছে। কালবীর মতে তার মৃত্তি ছিল এক বিশালদেহী পুরুষের আকৃতিতে নির্মিত। কুরাইশরাও তাকে উপাস্য দেবতা হিসেবে মানতো। তাদের কাছে এর নাম ছিল ‘উদ্দ’। তার নাম অনুসারে ইতিহাসে ‘আবদে উদ্দ’ নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ দেখা যায়।

‘সুওয়া’ ছিল হয়াইল গোত্রের দেবী। তার মৃত্তি ছিল নারীর আকৃতিতে তৈরী। ইয়ামুর সন্নিকটে ঝুঁহাত’ নামক স্থানে তার মন্দির ছিল।

‘ইয়াগুস’ ছিল ‘তায়’ গোত্রের ‘আনউম’ শাখার এবং ‘মায়হিজ’ গোত্রের কোন কোন শাখার উপাস্য দেবতা। ‘মায়হিজ’র শাখা গোত্রের লোকেরা ইয়ামান ও হিজায়ের মধ্যবর্তী ‘জুরাশ’ নামক স্থানে তার সিংহাকৃতির মৃত্তি স্থাপন করে রেখেছিল। কুরাইশ গোত্রেরও কোন কোন লোকের নাম আবদে ইয়াগুস ছিল বলে দেখা যায়।

‘ইয়াউক’ ইয়ামানের হামদান অঞ্চলের অধিবাসী হামদান গোত্রের ‘খায়ওয়ান’ শাখার উপাস্য দেবতা ছিল। এর মৃত্তি ছিল ঘোড়ার আকৃতির।

‘নাসর’ ছিল হিমইয়ার অঞ্চলের হিমইয়ার গোত্রের ‘আলে যুল-কুলা’ শাখার দেবতা। ‘বালখা’ নামক স্থানে তার মৃত্তি ছিল। এ মৃত্তির আকৃতি ছিল শকুনের মত। সাবার-প্রাচীন শিলালিপিতে এর নাম উল্লেখিত হয়েছে ‘নাসুর’। এর মন্দিরকে লোকেরা ‘বায়তে নাসর’ বা নাসুরের ঘর এবং এর পূজারীদের ‘আহলে নাসুর’ বা নাসুরের পূজারী বলতো। প্রাচীন মন্দিরসমূহের যে ক্ষৎসাবশেষ আরব এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে পাওয়া যায় সেসব মন্দিরের অনেকগুলোর দরজায় শকুনের চিত্র খোদিত দেখা যায়।

مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أَغْرِقُوا فَادْخُلُوا نَارًا لَّهُ فَلَمْ يَحِلْ وَالْمُرْسَلُونَ دُونِ اللَّهِ  
أَنْصَارًا ۝ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكُفَّارِ إِنَّكَ  
إِنَّ تَذَرَ رَهْرَيْصِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجْرًا ۝ رَبِّ اغْفِرْلِ  
وَلِوَالِدَيْ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَلِمَنْ مُنْتَ ۝ وَلَا تَزِدْ  
الظَّلَمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝

নিজেদের অপরাধের কারণেই তাদের নিমজ্জিত করা হয়েছিল তারপর আগন্তের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।<sup>১৯</sup> অতপর তারা আগ্নাহ হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কোন সাহায্যকারী পায়নি।<sup>২০</sup> আর নৃহ বললো : হে আমার রব, এ কাফেরদের কাউকে পৃথিবীর বুকে বসবাসের জন্য রেখো না। তুমি যদি এদের ছেড়ে দাও তাহলে এরা তোমার বান্দাদের বিভাস করবে এবং এদের বংশে যারাই জন্মগ্রাহ করবে তারাই হবে দৃঢ়তকারী ও কাফের। হে আমার রব, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মু'মিন হিসেবে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাদেরকে এবং সব মু'মিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করে দাও। জালেমদের জন্য ধ্রংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।

১৮. এ সূরার ভূমিকাতেই আমরা এ বিষয়টি উল্লেখ করেছি যে, হ্যরত নৃহ আলাইহিস সালামের এ বদদোয়া কোন প্রকার ধৈর্যহীনতার কারণে ছিল না। বরং এ বদদোয়া তাঁর মুখ থেকে তখনই উচ্চারিত হয়েছিল যখন তাবলীগ ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে শত শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর জাতির ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়েছিলেন। হ্যরত মূসাও এরপ পরিস্থিতিতেই ফেরাউন ও ফেরাউনের কওমের জন্য এ বলে বদদোয়া করেছিলেন : “হে প্রভু! তুমি এদের অর্ধ-সম্পদ ধ্রংস করে দাও এবং তাদের দিলের ওপর মোহর লাগিয়ে দাও, এরা কঠিন আঘাব না দেখা পর্যন্ত ইমান আনবে না।” তার জবাবে আগ্নাহ তা’আলা বলেছিলেন : তোমার দোয়া কবুল করা হয়েছে। (ইউনুস, আয়াত ৮৮-৮৯) হ্যরত মূসা আলাইহিস সালামের বদদোয়ার মত নৃহ আলাইহিস সালামের এ বদদোয়াও ছিল আগ্নাহ ইচ্ছার প্রতিক্রিয়া। তাই সূরা হৃদে আগ্নাহ তা’আলা বলেছেন :

وَأُوحِيَ إِلِيْ سُوْحِ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ أَمَنَ فَلَا تَبْتَسِّمْ  
بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

“আর অহী পাঠিয়ে নৃহকে জানিয়ে দেয়া হলো, এ পর্যন্ত তোমার কওমের যেসব লোক ঈমান এনেছে এখন তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না। তাদের কৃতকর্মের জন্য আর দুঃখ করো না।” (হৃদ, ৩৬)

১৯. অর্থাৎ নিমজ্জিত হওয়াতেই তাদের ব্যাপারটা চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যায়নি। বরং ধ্রংস হওয়ার পরপরই তাদের রুহসমূহকে আগুনের কঠিন শাস্তির মধ্যে নিষ্কেপ করা হয়েছে। এ আচরণের সাথে ফেরাউন ও তার জাতির সাথে কৃত আচরণের হবহ মিল রয়েছে। এ বিষয়টিই সূরা আল মু'মিনের ৪৫ ও ৪৬ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মু'মিন, টিকা-৬৩) যেসব আয়াত দ্বারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের আয়াব বা কবরের আয়াব প্রমাণিত হয় এ আয়াতটি তারই একটি।

২০. অর্থাৎ তারা যেসব দেব-দেবীকে সাহায্যকারী মনে করতো সেসব দেব-দেবীর কেউ-ই তাদের রক্ষা করতে আসেনি। এটা যেন মক্কাবাসীদের জন্য এ যর্মে সতর্কবাণী যে, তোমরাও যদি আল্লাহর আয়াবে পাকড়াও হও তা হলে যেসব দেব-দেবীর ওপর তোমরা ভরসা করে আছ তারা তোমাদের কোন কাজেই আসবে না।

---

# আল জিন

৭২

## নামকরণ

আল জিন এ সূরার নাম। এর বিষয়বস্তুর শিরোনামও আল জিন। কারণ এতে কুরআন শুনে জিনদের জাতির কাছে যাওয়া এবং তাদের মধ্যে ইসনামের তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করার ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

## নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থে হয়েরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্রাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে উকায়ের বাজারে যাচ্ছিলেন। পথে নাখলা নামক স্থানে তিনি ফজরের নামাযে ইমামতি করেন। সে সময় একদল জিন ঐ স্থান অতিক্রম করছিলো। কুরআন তিলাওয়াতের শব্দ শুনে তারা সেখানে থেমে যায় এবং গভীর মনযোগসহ কুরআন শুনতে থাকে। এ সূরাতে এ ঘটনারই উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বর্ণনার ভিত্তিতে অধিকাংশ মুফাস্সির মনে করেছেন যে, এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিহাস খ্যাত তায়েফ সফরের ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছিল হিজরাতের তিন বছর আগে নবুওয়াতের ১০ম বছরে। কিন্তু কয়েকটি কারণে এ ধারণা ঠিক নয়। তায়েফের উক্ত সফরে জিনদের কুরআন শোনার যে ঘটনা ঘটেছিল তা সূরা আহকাফের ২৯ থেকে ৩২. আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতগুলো একবার দেখনেই বুঝা যায়, সে সময় যেনেব জিন কুরআন শুনে তার প্রতি ঈমান এনেছিল তারা আগে থেকেই হয়েরত মূসা এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান পোষণ করতো। পক্ষান্তরে এ সূরার ২ হতে ৭ পর্যন্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এ সময় যে জিনেরা কুরআন শুনেছিল তারা ছিল মুশারিক। তারা আখেরাত ও রিসালাত অঙ্গীকার করতো। তাছাড়াও এ বিষয়টি ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, তায়েফের সফরে যায়েদ ইবনে হারেসা ছাড়া আর কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন না। পক্ষান্তরে এ সূরায় উল্লেখিত সফর সম্পর্কে ইবনে আব্রাস বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় কয়েকজন সাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন। তা ছাড়াও অনেকগুলো বর্ণনা এ বিষয়ে একমত যে, সূরা আহ্কাফে বর্ণিত ঘটনায় জিনরা যখন কুরআন শুনেছিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ থেকে মক্কা ফেরার পথে নাখলায় অবস্থান করছিলেন। আর ইবনে আব্রাসের বর্ণনা মতে এ সূরায় বর্ণিত সফরে জিনদের কুরআন শোনার ঘটনা তখন ঘটেছিল যখন তিনি মক্কা থেকে উকায যাচ্ছিলেন। এসব কারণে যে বিষয়টি সঠিক বলে জানা যায় তাহলো, সূরা আহ্কাফ

এবং সূরা জিনে একই ঘটনার উল্লেখ করা হয়েন। বরং এ ছিল তিনি সফরে সংঘটিত ভির ভির দু'টি ঘটনা।

সূরা আহকাফে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা যে দশম নববী সনে তায়েফ সফরের সময় সংঘটিত হয়েছিল সে ব্যাপারে রেওয়ায়াতসমূহে ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এ হিতীয় ঘটনাটি কখন সংঘটিত হয়েছিল? ইবনে আবাসের বর্ণনায় এর কোন জবাব পাওয়া যায় না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল সাহাবীকে সাথে নিয়ে কখন উকায়ের বাজারে গিয়েছিলেন অন্য আর কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকেও তা জানা যায় না। তবে এ সূরার ৮ খেকে ১০ পর্যন্ত আয়াতগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায়, এটি নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগের ঘটনা হবে। এসব আয়াতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতলাভের পূর্বে জিনরা উর্ধ জগতের খবর জানার জন্য আসমান থেকে কিছু না কিছু শুনে নেয়ার একটা সুযোগ পেয়ে যেতো। কিন্তু এরপর তারা হঠাৎ দেখতে পেলো সবথানে ফেরেশতাদের কড়া পাহারা বসে গেছে এবং উকার বৃষ্টি হচ্ছে। তাই কোথাও তারা এমন একটু জায়গা পাচ্ছে না যেখানে অবস্থান নিয়ে কোন আভাস তারা লাভ করতে পারে। তাই একথা জানার জন্য তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো যে, পৃথিবীতে এমন কি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বা হতে যাচ্ছে যার জন্য এ কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সভবত তখন থেকেই জিনদের বিভির দল বিষয়টির অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল এবং তাদেরই একটি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শুনে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছিল যে, এটিই সে বস্তু, যার কারণে জিনদের জন্য উর্ধ জগতের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

### জিনদের হাকীকত বা তাংপর্য

মন-মগজ যাতে কোন প্রকার বিভাসির শিকার না হয় সে জন্য এ সূরা অধ্যয়নের আগে জিনদের তাংপর্য সম্পর্কে জেনে নেয়া আবশ্যিক। বর্তমান যুগের বহু লোক এ ভাস্তিতে নিমজ্জিত আছে যে, জিন বলতে বাস্তবে কিছু নেই। বরং এটিও প্রাচীন কালের কুসংস্কার ভিত্তিক বাজে একটি ধারণা। তাদের এ ধারণার ভিত্তি কিন্তু এটা নয় যে, তারা গোটা বিশ্ব-জাহানের সবকিছুর তাংপর্য ও বাস্তবতা জেনে ফেলেছে এবং এও জেনে ফেলেছে যে, জিন বলে কোথাও কিছু নেই। এমন জ্ঞান লাভের দাবী তারা নিজেরাও করতে পারে না। কিন্তু কোন প্রমাণ ছাড়াই তারা ধরে নিয়েছে যে, গোটা বিশ্ব-জাহানে শুধু তা-ই বাস্তব যা অনুভব করা যায় বা ধরা হোঁয়ার মধ্যে আনা যায়। অথচ সমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু পানির যে অবস্থা এ বিরাট বিশাল বিশ্ব-জাহানের বিশালত্বের তুলনায় মানুষের অনুভূতি ও ধরা-হোঁয়ার গভির অবস্থা তাও নয়। যে ব্যক্তি মনে করে যে, যা অনুভব করা যায় না তার কোন অস্তিত্ব নেই, আর যার অস্তিত্ব আছে তা অবশ্যই অনুভূত হবে, সে আসলে নিজের বুদ্ধি-বিবেকের সংকীর্ণতারই প্রমাণ দেয়। এ ধরনের চিন্তাধারা অবলম্বন করলে শুধু এক জিন নয় বরং এমন কোন সত্যকেই মানুষ মেনে নিতে পারবে না যা

সরাসরি তার অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে না এবং অনুভব করা যায় না এমন কোন সত্যকে মেনে নেয়া তো দূরের কথা আল্লাহর অস্তিত্ব পর্যন্তও তাদের কাছে মেনে নেয়ার মত থাকে না।

মুসলমানদের মধ্যে যারা এরূপ ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে কিন্তু কুরআনকেও অঙ্গীকার করতে পারেনি তারা জিন, ইবলীস এবং শয়তান সম্পর্কে কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যকে নানা রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিষয়ে পরিণত করেছে। তারা বলেন : জিন বলতে এমন কোন অদৃশ্য মাখলুক বুঝায় না যাদের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব আছে। বরং কোথাও এর অর্থ মানুষের পাশবিক শক্তি যাকে শয়তান বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোথাও এর অর্থ অসভ্য, বন্য ও পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারী জাতিসমূহ। আবার কোথাও এর দ্বারা ঐ সব লোকদের বুঝানো হয়েছে যারা গোপনে কুরআন শুনতো। কিন্তু এ ব্যাপারে কুরআন মজীদের বক্তব্য এত স্পষ্ট ও খোলামেলা যে, এ ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সামান্যতম অবকাশও তাতে নেই।

কুরআন মজীদে এক জায়গায় নয় বহু জায়গায় এমনভাবে জিন ও মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে বুঝা যায়, এরা স্বতন্ত্র দু'টি মাখলুক। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন সূরা আ'রাফ, আয়াত ৩৮; হৃদ, ১৯; হা-মীম আস সাজদা, আয়াত ২৫ ও ২৯; আল আহকাফ ১৮; আয যারিয়াত; ৫৬ এবং আল নাস, ৬। সূরা আর রাহমান তো পুরাটাই এ ব্যাপারে এমন অকাট্য প্রমাণ যে, জিনদের এক প্রকার মানুষ মনে করার কোন অবকাশই নেই। সূরা আ'রাফের ১২ আয়াত, সূরা হিজরের ২৬ ও ২৭ আয়াত এবং সূরা আর রাহমানের ১৪ ও ১৫ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টির মৌলিক উপাদান হলো যাচি আর জিন সৃষ্টির মৌলিক উপাদান হলো আগুন।

সূরা হিজরের ২৭ আয়াতে পরিকার তাষায় বলা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টির পূর্বে জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআন মজীদের সাতটি স্থানে আদম ও ইবলীসের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এর সবগুলো স্থানের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সৃষ্টির সময় ইবলীস বর্তমান ছিল। এ ছাড়াও সূরা কাহফের ৫০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইবলীস জিনদেরই একজন।

সূরা আ'রাফের ২৭ আয়াতে পরিকার তাষায় বলা হয়েছে যে, জিনরা মানুষকে দেখতে পায় কিন্তু মানুষ জিনদের দেখতে পায় না।

সূরা হিজরের ১৭ থেকে ১৮, সূরা সাফ্ফাতের ৬ থেকে ১০ এবং সূরা মূলকের ৫ আয়াতে বলা হয়েছে, জিনেরা উর্ধ্ব জগতের দিকে উঠতে সক্ষম হলেও একটি নির্দিষ্ট সীমার ওপরে তারা যেতে পারে না। এর উর্ধ্বে যাওয়ার চেষ্টা করলে এবং উর্ধ্বজগতে বিচরণকারী ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে চাইলে তাদের থামিয়ে দেয়া হয়। গোপনে দৃষ্টির অগোচরে শুনতে চাইলে উক্তাপিও ছুড়ে মেরে তাড়িয়ে দেয়া হয়। একথার মাধ্যমে আরবের মুশরিকদের একটি ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল জিনরা গায়েবী বিষয়ের খবর জানে অথবা খোদায়ীর গোপন তত্ত্বসমূহ জানার কোন উপায় তাদের জানা আছে। সূরা সাবার ১৪ আয়াতেও এ ভাস্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

সূরা বাকারার ৩০ থেকে ৩৪ আয়াত এবং সূরা কাহফের ৫০ আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর খেলাফত দিয়েছেন মানুষকে। এও জানা যায় যে, মানুষ জিনদের চেয়ে উভয় মাখলুক যদিও জিনদের কিছু অশ্বাভাবিক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমরা সূরা নাম্লের ৭ আয়াতে এর একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। কিন্তু মানুষের তুলনায় পশুরাও কিছু অধিক ক্ষমতা লাভ করেছে। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, পশুরা মানুষের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী।

কুরআন একথাও বলে যে, জিনরাও মানুষের মত একটি মাখলুক। তাদেরকেও মানুষের মত স্বাধীনতাবে কাজ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ইবলীসের কাহিনী এবং সূরা আহুকাফ ও সূরা জিনে উল্লেখিত কিছু সংখ্যক জিনের দ্বিমান আনার ঘটনা এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

কুরআনের বহু জায়গায় এ সত্যটিও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আদমকে সৃষ্টি করার মুহূর্তেই ইবলীস এ মর্মে দৃঢ় সংকল্প করেছিল যে, সে মানব জাতিকে গোমরাহ, বিভাস্ত ও পথচার করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। সে সময় থেকেই জিনদের শয়তানরা মানুষকে গোমরাহীর মধ্যে ঠেলে দেয়ার চেষ্টায় লেগে আছে। কিন্তু মানুষের ওপর অধিপত্য বিস্তার করে জবরদস্তিমূলকভাবে কোন কাজ করিয়ে নেয়ার সামর্থ তারা রাখে না। বরং তারা তা মনের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে, তাদের বিভাস্ত করে এবং অন্যায় ও গোমরাহীকে তাদের সামনে শোভনীয় করে পেশ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলো পাঠ করুন। সূরা নিসা, আয়াত ১১৭ থেকে ১২০; আ'রাফ, ১১ থেকে ১৭ পর্যন্ত; ইবরাহীম ২২; আল হিজর ৩০ থেকে ৪২; আন নাহল, ৯৮ থেকে ১০০ এবং বনী ইসরাইল, ৬১ থেকে ৬৫ আয়াত পর্যন্ত।

কুরআন শরীফে একথাও বলা হয়েছে যে, আরবের মুশরিকরা জাহেলী যুগে জিনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতো, তাদের ইবাদাত বা পূজা-অর্চনা করতো এবং তাদেরকে আল্লাহর বংশধর বা সন্তান-সন্ততি মনে করতো। দেখুন, সূরা আল আন'আম, আয়াত ১০০; সাবা, আয়াত ৪০ থেকে ৪১ এবং আস্ম সাফ্ফাত, আয়াত ১৫৮।

এসব বিশদ আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জিনরা একটা ব্যতুক বহিঃসন্তার অধিকারী এবং তারা মানুষের থেকে তিনি প্রজাতির আরেকটি অদৃশ্য সৃষ্টি। তাদের রহস্যজনক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কারণে অস্ত লোকেরা তাদের অস্তিত্ব ও শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে কিছু অতিরিক্তিত ধারণা পোষণ করে আসছিলো এমনকি তাদের পূজা করতে শুরু করেছিল। কিন্তু কুরআন তাদের ব্যাপারে প্রকৃত সত্য একেবারে খোলাসা করে বলে দিয়েছে যা থেকে তারা কি এবং কি নয় তা ভালভাবে জানা যায়।

### বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

জিনদের একটি দল কুরআন মজীদ শোনার পর তার কি প্রভাব গ্রহণ করেছিল এবং ফিরে গিয়ে নিজ জাতির অন্যান্য জিনদের কি কি কথা বলেছিল, এ সূরার প্রথম আয়াত থেকে ১৫ আয়াত পর্যন্ত তা-ই বলা হয়েছে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা তাদের সব কথাবার্তা এখানে উল্লেখ করেননি। বরং উল্লেখযোগ্য বিশেষ বিশেষ কথাগুলোই উল্লেখ

করেছেন। তাই বর্ণনাভঙ্গী ধারাবাহিক কথাবার্তা বলার মত নয়। বরং তাদের বিভিন্ন উক্তি এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, তারা একপ একপ কথা বলেছে। জিনদের মুখ থেকে উচ্চারিত এসব উক্তি যদি মানুষ গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ে তাহলে সহজেই একথা বুঝা যাবে যে, তাদের দ্বিমান আনার এ ঘটনা এবং নিজ জাতির সাথে কথোপকথন কুরআন মজীদে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যে টিকা নিখেছি তাতে তাদের উক্তিসমূহের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছি এ উদ্দেশ্য বুঝতে তা আরো অধিক সাহায্য করবে।

তারপর ১৬ থেকে ১৮ পর্যন্ত আয়াতে লোকদের বুঝানো হয়েছে যে, তারা যদি শিরীক পরিত্যাগ করে এবং সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে অবিচল থাকে তাহলে তাদের প্রতি অজস্র নিয়ামত বর্ষিত হবে। অন্যথায় আল্লাহর পাঠানো এ উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিণামে তারা কঠিন আয়াবের মধ্যে নিপত্তি হবে। অতপর ১৯ থেকে ২৩ পর্যন্ত আয়াতে মকার কাফেরদের তিরক্ষার করা হয়েছে। কারণ আল্লাহর রসূল যখন আল্লাহর দিকে উচ্চকর্তৃ আহবান জানান তখন তারা তার ওপরে হামলা করতে উদ্যত হয়। অথচ আল্লাহর বাণী পৌছিয়ে দেয়াই রসূলের দায়িত্ব। তিনি তো এ দাবী করছেন না যে, মানুষের ভালমন্দ এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ তারই ইঁথতিয়ারে। এরপর ২৪ ও ২৫ আয়াতে কাফেরদের এ মর্মে ইশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে, আজ তারা রসূলকে বন্ধুহীন ও অসহায় দেখে অবদিমিত করে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন তারা জানতে পারবে, প্রকৃতপক্ষে বন্ধুহীন ও অসহায় কারা? সে সময়টি দ্রুতে না নিকটে রসূল তা জানেন না। কিন্তু সেটি অবশ্যই আসবে। সব শেষে লোকদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, ‘আলেমুল গায়েব’ বা গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে। রসূল শুধু ততটুকুই জানতে পারেন যতটুকু আল্লাহ তাকে জানান। এ জ্ঞানও হয় রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্পর্কিত বিষয়ে। এমন সুরক্ষিত পথায় রসূলকে এ জ্ঞান দেয়া হয় যার মধ্যে বাইরে থেকে হস্তক্ষেপের আদৌ কোন সম্ভাবনা থাকে না।

খ্যাত ২৮

রংক ২

## সূরা আল জিন-মঙ্গী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মাময় ঘেহেরবান আল্লাহর নামে

قُلْ أَوْحَى إِلَيْنَا أَنَّهُ سَمِعَ نَفْرِينَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قَرآنًا عَجِيبًا  
 يَهْدِي إِلَيْ الرِّشْدِ فَإِنَّا بِهِ مُنَاهِيٌّ وَلَئِنْ شَرِكَ بِرِبِّنَا أَهْلَ أَهْلَ<sup>①</sup> وَأَنَّهُ تَعْلَى جَلَرِبِّنَا<sup>②</sup>  
 مَا أَتَخْلَ مَاصِبَةً وَلَا وَلَدًا<sup>③</sup> وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهِنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا<sup>④</sup>  
 وَأَنَّا ظَنَنَا أَنْ لَنْ تَقُولَ إِلَيْنَا وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَنِبًا<sup>⑤</sup> وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالًا<sup>⑥</sup>  
 مِنَ الْإِنْسِ بِعَذْوَنَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَرَادُهُمْ رَهْقًا<sup>⑦</sup>

হে নবী, বল, আমার কাছে অহী পাঠানো হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে গুনেছে।<sup>১</sup> তারপর (ফিরে গিয়ে নিজ জাতির লোকদেরকে) বলেছেঃ

“আমরা এক বিশ্যকর ‘কুরআন’ গুনেছি যা সত্য ও সঠিক পথের নির্দেশনা দেয় তাই আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা আর কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করবো না।”<sup>২</sup>

আর “আমাদের রবের মর্যাদা অতীব সমৃক্ষ। তিনি কাউকে স্তু কিংবা সত্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি।”<sup>৩</sup>

আর “আমাদের নির্বোধ লোকেরা”<sup>৪</sup> আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ও ন্যায়ের পরিপন্থী অনেক কথাবার্তা বলে আসছে।”

আর “আমরা মনে করেছিলাম যে, মানুষ এবং জিন আল্লাহ সরকে কখনো মিথ্যা বলতে পারে না।”<sup>৫</sup>

আর “মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোক জিনদের কিছু লোকের কাছে আগ্রহ প্রার্থনা করতো। এভাবে তারা জিনদের অহংকার আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।”<sup>৬</sup>

১. এ থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় জিনদের দেখতে পাছিলেন না এবং তারা যে কুরআন শুনছে একথাও তাঁর জানা ছিল না। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তাঁরাকে অহির মাধ্যমে এ ঘটনা জানিয়ে দিয়েছেন। এ ঘটনাটি বর্ণনা প্রসঙ্গে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদের উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেননি এবং তিনি তাদের দেখেনওনি।” (মুসলিম, তিরিয়ি, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর)

২. মূল আয়াতে **عَجْبًا قُرَأْنًا** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ‘কুরআন’ মানে পড়ার মত জিনিস। জিনেরা সম্ভবত শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার করেছিল। কারণ তখন তারা প্রথম বারের মত এ বাণীর সাথে পরিচিত হয়েছিল। সে সময় হয়তো তাদের জানা ছিল না যে, যে জিনিস তারা শুনছে তার নামই কুরআন। **عَجْبٌ** আধিক্য অর্থনির্দেশক একটি শব্দ। আরবী ভাষায় শব্দটি ব্যবহৃত হয় অত্যধিক বিশ্বাসকর ব্যাপার বুঝাতে। সুতরাং জিনদের উক্তির অর্থ হলো, আমরা এমন একটি বাণী শুনে এসেছি যা ভাষাগত উৎকর্ষতা ও বিষয়বস্তু হিসেবে অতুলনীয়।

এ থেকে জানা যায় যে, জিনরা শুধু মানুষের কথা শুনতে পারে তাই নয়, তারা মানুষের ভাষাও ভালভাবে বুঝতে পারে। তবে এটা জরুরী নয় যে, সব জিন মানুষের সব ভাষাই জানবে বা বুঝবে। সম্ভবত তাদের যে গোষ্ঠী পৃথিবীর যে এলাকায় বসবাস করে তারা সে এলাকার মানুষের ভাষা জানে। তবে কুরআনের এ বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ সময় যেসব জিন কুরআন শুনেছিল তারা আরবী ভাষায় এত দক্ষ ছিল যে, তারা এ বাণীর অতুলনীয় ভাষাগত উৎকর্ষ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং এর উচ্চমানের বিষয়বস্তুও ভালভাবে বুঝতে পেরেছিল।

৩. এ থেকে কয়েকটি বিষয় জানা গেল। এক, জিনরা আল্লাহর অন্তিত্ব এবং তাঁর ‘রব’ হওয়াকে অঙ্গীকার করে না। দুই, তাদের মধ্যেও মুশরিক আছে যারা মুশরিক মানুষের মত অন্য জিনিসকে আল্লাহর উল্লিখিয়াতের মধ্যে শরীক করে। তাই জিনদের যে কওমের সদস্যরা কুরআন মজিদ শোনার পর কওমের কাছে ফিরে গিয়েছিল তারাও ছিল মুশরিক। তিনি, নবওয়াত এবং আসমানী কিভাবসমূহ নায়িল হওয়ার ধারা জিনদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। বরং তাদের মধ্যে যেসব জিন ঈমান আনে তারা মানুষের মধ্যে প্রেরিত নবী এবং তাদের আনীত কিভাবসমূহের ওপর-ই ঈমান আনে। একথাটি সূরা আহ্�কাফের ২৯-৩১ আয়াত থেকেও জানা যায়। এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, সে সময় যেসব জিন কুরআন শুনেছিল তারা হ্যরত মুসার অনুসারী ছিল। তারা কুরআন শোনার পর নিজের কওমকে এ মর্মে দাওয়াত দিয়েছিল যে, এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বাণী এসেছে এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিভাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করছে তার ওপর ঈমান আনো। সূরা আর রাহমানও এ বিষয়টিই প্রমাণ করে। কারণ তার পুরা বক্তব্যই স্পষ্ট করে দেয় যে, মানুষ ও জিন শুধু এ দু'টি সৃষ্টিই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে ছিল।

৪. এখান থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল। এ জিনগুলো হয় ঈসায়ী বা খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী ছিল অথবা অন্য এমন কোন ধর্মের অনুসারী ছিল যে ধর্মে মহান আল্লাহর জ্ঞানী ও ছেলেমেয়ে আছে বলে বিশ্বাস করা হতো। দুই, সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

وَإِنَّمَا ظنُوا كِمَا ظنَّتْرُمَانٌ لِّيَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا<sup>۱</sup> وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ  
 فَوَجَدْنَا مِنْهَا مِلْئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشَهِيدًا<sup>۲</sup> وَإِنَّا كَنَّا نَقْعُلُ مِنْهَا مَقَاعِلَ لِلسَّمْعِ  
 فَمَنْ يَسْتَمِعُ إِلَآنَ يَجْعَلُ لَهُ شَهِيدًا رَصْدًا<sup>۳</sup> وَإِنَّا لَأَنْدِرِي أَشْرَارِي دِينَ بِمِنْ  
 فِي الْأَرْضِ أَلَا أَرَأَيْتَمِنْ رَبَّهُمْ رَشِلًا<sup>۴</sup> وَإِنَّا مِنَ الْمُصْلِحُونَ وَمِنَادُونَ ذَلِكَ  
 كَنَاطِرِ أَيْقَنَ قَدَّدًا<sup>۵</sup> وَإِنَّا ظَنَّنَا أَنَّ لَنْ نَعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نَعْجِزَهُ هُرْبًا<sup>۶</sup>

আর “তোমরা যেমন ধারণা পোষণ করতে মানুষেরাও ঠিক তেমনি ধারণা পোষণ করেছিল যে, আল্লাহ কাউকে রসূল বানিয়ে পাঠাবেন না।”

আর “আমরা আসমানে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছি, তা কঠোর প্রহরী ও উক্তাপিও দ্বারা পরিপূর্ণ।”

আর “ইতিপূর্বে আমরা ছিটকেটা কিছু আড়ি পেতে শোনার জন্য আসমানে বসার জায়গা পেয়ে যেতাম। কিন্তু এখন কেউ গোপনে শোনার চেষ্টা করলে সে তার নিজের বিরুদ্ধে নিষ্কেপের জন্য একটা উক্তা নিয়োজিত দেখতে পায়।”

আর আমাদের বোধগম্য হচ্ছিল না যে, পৃথিবীবাসীদের সাথে কোন খারাপ আচরণ করার সংকল্প করা হয়েছে, নাকি তাদের প্রভু, তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে চান।”

আর আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আছে নেক্কার আর কিছু লোক আছে তার চেয়ে নিচু পর্যায়ের। এভাবে আমরা বিভিন্ন মতে বিভক্ত<sup>۷</sup> ছিলাম।

আর আমরা মনে করতাম যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে সক্ষম নই এবং পালিয়েও তাঁকে পরাভূত করতে পারবো না।”

সান্নাম নামায়ের মধ্যে পবিত্র কুরআনের এমন কোন অংশ তিসাওয়াত করছিসেন যা শুনে তাদের কাছে নিজেদের আকীদার আতি ধরা পড়েছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে, মহান আল্লাহর সমুন্নত ও অতি মর্যাদাবান সন্তার সাথে স্তৰী ও ছেলেমেয়েকে সম্পর্কিত করা চরম অক্ষতা ও উদ্ধৃতাপূর্ণ আচরণ।

৫. মূল আয়াতে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি এক ব্যক্তির জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে আবার অনেক লোক বা দলের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। যদি শব্দটি একজন অজ্ঞ বা মূর্খ লোক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার মানে হবে ইবলীস। আর যদি

অনেক লোক বা দল অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার অর্থ হবে জিনদের মধ্য থেকে অনেক নির্বোধ ও বৃক্ষি-বিবেকহীন লোক এ রকম কথা বলতো।

৬. অর্থাৎ তাদের প্রান্ত কথাবার্তা ঘৰা আমাদের বিভাস্ত ইগ্রহার কারণ হলো, আমরা কোন সময় চিন্তাও করতে পারিনি যে, মানুষ কিংবা জিন আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলার দুঃসাহসও করতে পারে। কিন্তু এখন এ কুরআন শুনে আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রকৃত-পক্ষে তারা ছিল মিথ্যাবাদী।

৭. ইবনে আবাস বলেন : জাহেলী যুগে আরবরা যখন কোন জনহীন প্রান্তের রাত্রি যাপন করতো তখন উচ্চস্থরে বলতো, “আমরা এ প্রান্তের অধিপতি জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” জাহেলী যুগের অন্যান্য বর্ণনাতেও এ বিষয়টির বহুল উল্লেখ দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, কোন জায়গার পানি এবং ঘাস ফুরিয়ে গেলে মরুচারী যায়াবর বেদুইনরা তাদের একজন লোককে এমন আরেকটি জায়গা খুঁজে বের করতে পাঠাতো যেখানে পানি এবং ঘাস পাওয়া যেতে পারে। অতপর উক্ত ব্যক্তির নির্দেশনা মূলভিক এসব লোক নতুন জায়গায় পৌছলে সেখানে অবস্থান নেয়ার আগে চিন্কার করে বলতো : আমরা এ প্রান্তের মালিকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যাতে আমরা এখানে সব রকম বিপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পারি।” তাদের বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক জনমানবহীন জায়গা কোন না কোন জিনের দখলে আছে। তার আশ্রয় প্রার্থনা ছাড়াই কেউ যদি সেখানে অবস্থান করে তাহলে সে জিন হ্য নিজেই তাদের উত্ত্যক্ত করে কিংবা অন্য জিনদের উত্ত্যক্ত করার জন্য লেলিয়ে দেয়। ইমান আনয়নকারী এ জিনরা এ বিষয়টির প্রতিই ইঞ্গিত করেছে। তাদের কথার অর্থ হলো এ পৃথিবীর খলীফা বা প্রতিনিধি মানুষ। তারাই যখন উচ্চ আমাদের তয় করতে শুরু করেছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুরু করেছে তখন আমাদের জাতির লোকদের মন্তিষ্ঠ বিকৃতি আরো বৃক্ষি পেয়েছে। তাদের গর্ব, অহংকার এবং কুফরী ও জুলুম অত্যাচারের মাত্রা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে এবং গোমরাহীর ক্ষেত্রে তারা আরো বেপরোয়া হয়ে গিয়েছে।

৮. মূল ভাষ্য হচ্ছে **أَنْ لَنْ يُبَعْثِثَ اللَّهُ أَحَدًا** এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি আমরা যা অন্বাদ করেছি। অপরটি হলো, “মৃত্যুর পর আল্লাহ তা’আলা কাউকে আর জীবিত করে উঠাবেন না।” যেহেতু কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক তাই তার এ অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, মানুষের মত জিনদের মধ্যে একদল আখেরাতকে অঙ্গীকার করতো। কিন্তু পরবর্তী বিষয়ের সাথে সামঝস্যের দিক থেকে প্রথম অর্থটিই অধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কারণ, পরবর্তী আয়াতসমূহে এ বিষয়টির উল্লেখ আছে যে, ইমান আনয়নকারী এসব জিন তাদের কওমকে বলছে, আল্লাহ আর কোন রসূল পাঠাবেন না। তোমাদের এ ধারণা প্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের জন্য আসমানের দরজা বন্ধ করার কারণ হলো আল্লাহ একজন রসূল পাঠিয়েছেন।

৯. এটাই সে কারণ যার ভিত্তিতে জিনরা এ বিষয়টি অনুসন্ধান করতে বেরিয়েছিল যে, পৃথিবীতে এমন কি ঘটনা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে যার খবরাখবর সুরক্ষিত করার জন্য এমন কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এখন আমরা উর্ধ জগতের কোন খবর জানার সুযোগ পাই না এবং যেখানেই যাই আমাদের যেরে তাড়িয়ে দেয়া হয়।

وَأَنَّا لَمَسِعْنَا الْهَدَىٰ أَمَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرِبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا  
وَلَا رَهْقًا<sup>১</sup> وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحْرُوا  
رَشَّانًا<sup>২</sup> وَأَمَّا الْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمْ حَطَبًا<sup>৩</sup> وَأَن لَوْيَاستَقْامَوْعَالَى  
الْطَّرِيقَةِ لَا سَقِينُهُم مَاء غَلَقًا<sup>৪</sup> لِنَفْتِنُهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ  
يَسْلُكَهُ عَنِ ابَابِ صَعَلَ<sup>৫</sup> وَأَنَّ الْمَسْجِلَ لِلَّهِ فَلَآتِلَ عَوْمَعَ اللَّهِ أَحَدًا<sup>৬</sup>  
وَأَنَّهُ لِمَّا قَاتَ أَعْبَدَ اللَّهَ يَدِ عَوْهَ كَادَوْيَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا<sup>৭</sup>

আর আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনলাম তখন তার প্রতি ইমান আনলাম। যে ব্যক্তিই তার রবের ওপর ইমান আনবে তার অধিকার বিনষ্ট হওয়ার কিংবা অত্যাচারিত হওয়ার তয় ধাকবে না।<sup>১</sup>

আর আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আছে মুসলমান (আল্লাহর আনুগত্যকারী) আর কিছু সংখ্যক আছে ন্যায় ও সত্য থেকে বিমুখ। তবে যারা ইসলাম (আনুগত্যের পথ) গ্রহণ করেছে তারা মুক্তির পথ ঝুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছে। আর যারা ন্যায় ও সত্য থেকে বিমুখ তারা হবে জাহানামের ইঁকন।<sup>১</sup>

আর<sup>২</sup> (হে নবী, বলে দাও, আমাকে অহীর মাধ্যমে এও জানানো হয়েছে যে,) লোকেরা যদি সঠিক পথের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতো তাহলে আমি তাদের প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম।<sup>২</sup> যাতে এ নিয়ামতের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা করতে পারি।<sup>৩</sup> আর যারা তাদের প্রভূর শরণ থেকে বিমুখ হবে<sup>৪</sup> তিনি তাদের কঠিন আশাবে নিষ্কেপ করবেন। আর মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য। তাই তোমরা আল্লাহর সাথে আর কাউকে ডেকো না।<sup>৫</sup> আর আল্লাহর বান্দু<sup>৬</sup> যখন তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়ালো তখন তারা সবাই তার ওপর হামলা করতে উদ্যুক্ত হলো।

১০. এ থেকে জানা গেল যে, দুটি পরিস্থিতিতে উর্ধ্ব জগতে এ ধরনের অসাধারণ ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়ে থাকে। এক, আল্লাহ যদি পৃথিবীবাসীদের ওপর কোন আশাব নায়িল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং চান যে, তা নায়িল হওয়ার আগে জিনরা তার পূর্বাভাস পেয়ে তাদের মানুষ বন্ধুদের সাবধান করে না দিক। দুই, আল্লাহ যদি পৃথিবীতে কোন রসূল পাঠিয়ে থাকেন এবং তাঁর কাছে যেসব হিদায়ত ও বাণী পাঠানো হচ্ছে তাতে শয়তানরা

যাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে না পারে এবং রসূলের কাছে কি কি হিদায়াত বা বাণী পাঠানো হচ্ছে তা আগেভাগেই জ্ঞেনে নিতে না পারে তার নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কাম্য হয় তখন এ ধরনের অসাধারণ ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়। সুতরাং জিনদের একথাটির অর্থ হলো, আমরা যখন আসমানে এরপ কঠোর প্রহরা দেখলাম এবং অজস্র উদ্ধা বর্ণণ লক্ষ করলাম তখন এ দু'টি অবস্থার কোন্টি সংঘটিত হচ্ছে আমাদের মধ্যে তা জানার উদ্দেশ সৃষ্টি হলো। আল্লাহ তা'আলা কি হঠাতে করে পৃথিবীর কোন জাতির ওপর আযাব নাযিল করেছেন না কোন এলাকায় কোনো রসূল পাঠিয়েছেন? এ বিষয়টি অনুসন্ধানেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। এরি এক পর্যায়ে আমরা এ বিশ্যবকর বাণী শুনতে পেলাম যা সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দান করে। এভাবে আমরা জানতে পেরেছি, আল্লাহ কোন আযাব নাযিল করেননি। বরং তাঁর সৃষ্টিকে সত্য ও সঠিক পথ দেখানোর জন্য একজন রসূল পাঠিয়েছেন। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হিজৰ, টীকা ৮ থেকে ১২; সূরা সাফ্ফাত, টীকা ৭ এবং সূরা আল মুলক, টীকা ১১)

১১. অর্থাৎ আমাদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের দিক থেকেও তাল ও মন্দ দু' প্রকারের জিন আছে এবং আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকেও মত ও পথ একটি নয়। এ ক্ষেত্রেও আমরা বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত। একথা বলে ইমান আনয়নকারী এসব জিন নিজ জাতির জিনদের বুঝাতে চাহিল যে, নিসন্দেহে আমরা সত্য ও সঠিক পথ খুঁজে বের করার মুখাপেক্ষ। এর প্রয়োজনীয়তা আমরা অবীকার করতে পারি না।

১২. অর্থাৎ আমাদের এ ধরণাই আমাদের মুক্তির পথ দেখিয়েছে। আমরা যেহেতু আল্লাহ সম্পর্কে নির্ভয় বা বেপরোয়া ছিলাম না এবং এ ব্যাপারে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে, যদি আমরা তাঁর অবাধ্য হই তাহলে তাঁর পাকড়াও থেকে কোন অবস্থায়ই বাঁচতে পারবো না। তাই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শনকারী বাণী শুনে ন্যায় ও সত্যকে জানার পরও অঙ্গ ও নির্বোধ লোকদের প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত আকীদা-বিশ্বাসকেই আঁকড়ে থাকার দৃঃসাহস আমরা দেখাইনি।

১৩. অধিকার বিনষ্ট হওয়ার অর্থ হলো, নেক কাজের জন্য যতটা পারিশমিক বা পুরস্কার পাওয়ার কথা তার চাইতে কম দেয়া। আর জুলুম বা অত্যাচার হলো নেক কাজের জন্য আদৌ কোন পারিশমিক বা পুরস্কার না দেয়া এবং তার দ্বারা যে ক্রটি বা অপরাধ হয়েছে তার তুলনায় অধিক শান্তি দেয়া, কিংবা অপরাধ ছাড়াই কাউকে শান্তি দেয়া। আল্লাহ তা'আলার দরবারে কোন ইমানদারের প্রতি এ ধরনের কোন বেইনসাফী হওয়ার আশংকা থাকবে না।

১৪. কুরআনের ভাষ্য অনুসারে জিনেরা আগুন থেকে সৃষ্টি। তাই প্রশ্ন হতে পারে যে, জাহানামের আগুন দ্বারা তাদের আবার কি কষ্ট হবে? এর জবাব হলো, কুরআনের ভাষ্য অনুসারে মানুষও মাটি থেকে সৃষ্টি। তা সন্ত্রেও তাদের মাটির চিল ছুড়ে যারলে ব্যথা পায় কেন? প্রকৃত সত্য হলো মানুষের গোটা দেহ মাটির উপাদান দ্বারা তৈরী হলেও এসব উপাদান থেকে যখন একজন রক্ত-মাংসের জীবত মানুষ অঙ্গিত্ব লাভ করে তখন সে এসব উপাদান থেকে সম্পূর্ণ তির জিনিসে রূপান্তরিত হয় এবং একই উপাদান থেকে তৈরী অন্যান্য জিনিস তার কঠোর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক তেমনিভাবে গঠনাকৃতির দিক থেকে জিন যদিও আগুনের তৈরী। কিন্তু আগুন থেকে তৈরী একটি জীবত ও চেতনা সম্পর্ক

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوْرَبِيْ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ الْكِرْمَ ضَرَّاً وَلَا  
رِشَّاً ۝ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجْزِيَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۝ وَلَنْ أَجِلَّ مِنْ دُونِهِ  
مُلْتَكِلًا ۝ إِلَّا بِلْفَاظِ مِنَ اللَّهِ وَرِسْلَتِهِ ۝ وَمَنْ يَعِصِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ  
نَارٌ جَهَنَّمُ خَلِيلُنِي فِيهَا أَبْدًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ  
مِنْ أَضَعَّفَ نَاصِرًا ۝ وَأَقْلَعَ عَلَّدًا ۝

## ২ রক্ত'

হে নবী, বলো, "আমি শুধু আমার রবকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।"<sup>১৩</sup> বলো, "আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখি না, উপকার করারও না। বলো, আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ আমাকে বাঁচাতে সক্ষম নয় এবং তাঁর কাছে ছাড়া কোন আশ্রয়ও আমি পাব না। আল্লাহর বাণী ও হকুম-আহকাম পৌছিয়ে দেয়া ছাড়া আমার কাজ আর কিছুই নয়।"<sup>১৪</sup> এরপর যারাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা অমান্য করবে তার জন্য রয়েছে জাহানামের আগুন। এ ধরনের লোকেরা চিরকাল সেখানে থাকবে।<sup>১৫</sup>

(এসব লোক তাদের এ আচরণ থেকে বিরত হবে না) এমনকি অবশ্যে যখন তারা সে জিনিসটি দেখবে যার প্রতিশ্রুতি তাদের দেয়া হচ্ছে, তখন তারা জানতে পারবে যে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার দল সংখ্যায় কম।<sup>১৬</sup>

সৃষ্টি যখন অঙ্গিত্ব লাভ করে তখন সে আগুনই তার জন্যে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আর রাহমান, টীক ১৫)

১৫. এর পূর্বে জিনদের কথা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এখান থেকে আল্লাহ তা'আলার নিজের কথা শুরু হচ্ছে।

১৬. একথাটিই সূরা নৃহে এভাবে বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তোমাদের ওপর আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।" (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নৃহ, টীকা ২) প্রচুর পরিমাণ পানিকে নিয়ামতের প্রাচৰ্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, পানির ওপর নির্ভর করেই জনবসতি গড়ে উঠে। পানি না থাকলে আদৌ কোন জনপদ গড়ে উঠতে পারে না। পানি না থাকলে মানুষের ঘোলিক প্রয়োজন যেমন প্ররুণ হয় না তেমনি মানুষের বিভিন্ন রকম শিল্প গড়ে উঠতে পারে না।

০

০

১৭. অর্থাৎ তিনি দেখতে চান তারা নিয়ামতলাভ করার পর কৃতজ্ঞ থাকে কিনা এবং আমার দেয়া নিয়ামতসমূহ সঠিকভাবে কাজে লাগায়, না ভাস্ত পথে কাজে লাগায়।

১৮. অরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার একটা অর্থ হলো, মানুষ আল্লাহর প্রেরিত উপদেশ শ্রেণ করবে না। আরেকটা অর্থ হলো, মানুষ আল্লাহর যিকরের কথা শোনা পছন্দই করবে না। এর আরেকটি অর্থ হলো, সে আল্লাহর ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

১৯. مُحَمَّدْ سَمَّاْجِي شব্দটি সাধারণভাবে ইবাদাতখানা বা উপাসনালয় অর্থে গ্রহণ করেছেন : 'মাসার্জিদ' শব্দটির এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতটির অর্থ হয় 'উপাসনালয় সমূহে আল্লাহর ইবাদাতের সাথে সাথে আর কারো ইবাদাত যেন করা না হয়। হ্যরত হাসান বাস্তী বলেন : সমস্ত পৃথিবীটাই ইবাদাতখানা বা উপাসনালয়। তাই আয়াতটির মূল বক্তব্য হলো আল্লাহর এ পৃথিবীতে কোথাও যেন শির্ক করা না হয়। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাহই ওয়া সাল্লামের এ বাণী থেকে প্রমাণ পেশ করেছেন। وَجَعَلَ لَيْلَى أَرْضَ مَسْجِدٍ وَطَهَّرَ<sup>১</sup> আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে ইবাদাতের স্থান এবং পবিত্রতা অর্জনের উপায় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। হ্যরত সাঈদ ইবনে জুবাইর মসজিদ বলতে যেসব অংগ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে মানুষ সিজদা করে সেগুলো অর্থাৎ হাত, হাঁটু, পা ও কপাল বুঝিয়েছেন। এ ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতটির অর্থ হলো, সমস্ত অংগ-প্রত্যঙ্গে আল্লাহর তৈরী। এগুলোর সাহায্যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা যাবে না।

২০. এখানে আল্লাহর বান্দা অর্থ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

২১. অর্থাৎ আল্লাহকে ডাকা এমন কোন আপত্তিকর কাজ নয় যার জন্য মানুষ এতটা রাগাদ্বিত ও উভেজিত হয়ে পড়বে। তবে কেউ যদি আল্লাহর সাথে তাঁর প্রভূত্ব ও উলুহিয়াতের ব্যাপারে কাউকে শরীক করে তাহলে তা নিসদ্দেহে খারাপ! আর এ কাজ আমি করিনি। বরং যারা আল্লাহর নাম শুনে আমার ওপর হামলা করতে চায় তারাই এ কাজ করছে।

২২. অর্থাৎ আমি কখনো এ দাবী করি না যে, আল্লাহর প্রভূত্বে আমার কোন দখলদারী বা কর্তৃত্ব আছে। কিংবা মানুষের ভাগ্য ভাঙা বা গড়ার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা আছে। আমি তো আল্লাহর একজন রসূল মাত্র। আমার ওপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার বাণী পৌছিয়ে দেয়ার অধিক আর কিছুই নয়। আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ব্যাপার তো পুরোপুরি আল্লাহরই করায়ত্ব। অন্য কারো কল্যাণ বা ক্ষতি সাধন তো দূরের কথা নিজের ক্ষতি ও কল্যাণের ব্যাপারটিও আমার নিজের ইচ্ছাদীন নয়। আমি যদি আল্লাহর নাফরমানী করি তাহলে তাঁর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করে কোথাও আশয় দাত করতে পারবো না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে ছাড়া আমার আর কোন আশয়হীন নেই। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশুরা, চীকা ৭)

২৩. এর অর্থ এই নয় যে, প্রতিটি গোনাহ ও অপরাধের শাস্তি হচ্ছে চিরস্থায়ী জাহানাম। বরং যে প্রসংগে একথাটি বলা হয়েছে তার আলোকে আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তাওহীদের যে আহবান জানানো হয়েছে তা যে ব্যক্তি

قُلْ إِنَّ أَدْرِي أَقْرِيبًا مَا تَوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيْ أَمْ إِلَيْهِ الْغَيْبُ  
 فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدٌ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ  
 مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصْدًا ۚ ۖ لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسْلِيْ  
 رِبِّهِمْ وَأَهَاطُ بِهِمْ رِاحْصِيْ، كُلُّ شَيْءٍ عَلَى دَائِرَةِ

বলো, আমি জানি না, যে জিনিসের প্রতিষ্ঠিতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে তা নিকটে, না তার জন্য আমার রব কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করছেন।<sup>২৫</sup> তিনি গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না।<sup>২৬</sup> তবে যে রসূলকে (গায়েবী বিষয়ের কেন জ্ঞান দেয়ার জন্য) মনোনীত করেছেন<sup>২৭</sup> তাকে ছাড়া। তিনি তাঁর সামনে ও পেছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন।<sup>২৮</sup> যাতে তিনি নিশ্চিতরপে জ্ঞানতে পারেন যে, রসূলগণ তাদের রবের বাণীসমূহ পৌছিয়ে দিয়েছেন<sup>২৯</sup> তিনি তাদের গোটা পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। আর তিনি প্রতিটি জিনিস শুণে শুণে হিসেব করে রেখেছেন।<sup>৩০</sup>

মানবে না এবং শিরুককেও বর্জন করবে না তার জন্য অবধারিত আছে জাহানামের চিরস্থায়ী শাস্তি।

২৪. এ আয়াতটির পটভূমি হলো, সে শুণে যেসব লোক আল্লাহর পথের দিকে রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহবান শুনেই তাঁর উপর মারমুখী হতো তারা এ খোশ খেয়ালে নিয়ে ছিল যে, তাদের দলবলই বড়। অপরদিকে রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আছে আঙুলে গোণ কয়েকজন লোক। সুতরাং তারা অতি সহজেই তাকে পরাভূত করতে সক্ষম হবে। তাই বলা হচ্ছে, আজ এসব লোক রসূলকে (স) অসহায় ও বন্ধুহীন এবং নিজেদের সংখ্যাধিক্য দেখে ন্যায় ও সত্যের কষ্ট শুরু করে দিতে দৃঃসাহস দেখাচ্ছে। কিন্তু যে সময় সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দেয়া হচ্ছে সে দৃঃসময়টি যখন আসবে, তখন তারা বুঝতে পারবে প্রকৃত পক্ষে অসহায় ও বন্ধুহীন কারা।

২৫. বর্ণনাভঙ্গী থেকেই বুঝা যায়, এটি একটি প্রশ্নের জওয়াব। এখানে প্রশ্নটি উল্লেখ না করে শুধু তাঁর জবাব দেয়া হয়েছে। সম্ভবত ওপরে উল্লেখিত কথা শুনে বিরোধীরা বিদ্রূপের তঙ্গীতে প্রশ্ন করে থাকবে যে, যে সময়ের ভয় তিনি দেখাচ্ছেন সে সময়টি কখন আসবে? তাঁর জবাবে রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের বলো, সে সময়টির আগমন তো নিশ্চিত, তবে তাঁর আগমনের দিনক্ষণ আমাকে জানানো হয়নি। সে সময়টি অতি আসৱ, না তাঁর জন্য দীর্ঘ সময় নির্দিষ্ট রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

২৬. অর্থাৎ গায়েবী বিষয়ের সবটুকু জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। গায়েবী বিষয়ের এ পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান তিনি কাউকেই দেন না।

২৭. অর্থাৎ রসূল নিজে 'আলেমুল গায়েব' বা গায়েবী বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী নন। বরং আল্লাহ তা'আলা যখন তাকে রিসালাতের দায়িত্ব আঞ্চাম দেয়ার জন্য মনোনীত করেন তখন তিনি ইচ্ছামত তাঁকে অদৃশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞান দান করেন।

২৮. প্রহরী মানে ফেরেশতা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন অহীর মাধ্যমে গায়েবী বিষয়ের গভীর জ্ঞান ও তাৎপর্য তাঁর রসূলের কাছে পাঠান তখন তার রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদারীর জন্য সবখানে ফেরেশতা ঘোতায়েন করেন। যাতে সে জ্ঞানটি অত্যন্ত সুরক্ষিত পছাড় রসূলের কাছে পৌছতে পারে এবং তার মধ্যে বাইরের কোন কিছু সংখ্যিত হতে না পারে। ওপরে ৮ ও ৯ নং আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পর জিনরা দেখলো তাদের উর্ধ্ব জগতে প্রবেশের সব পথ বক্স। তারা দেখলো সব জ্ঞানগায় কঠোর প্রহরা বসানো হয়েছে যার কারণে ছিটে ফোটা কিছু আভাস লাভের সুযোগও তাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

২৯. এর তিনটি অর্থ হতে পারে। এক, রসূল নিশ্চিতভাবে জানবেন যে, ফেরেশতারা তাঁর কাছে আল্লাহ তা'আলার বাণীসমূহ ঠিক ঠিক পৌছিয়ে দিয়েছে। দুই, আল্লাহ তা'আলা জানবেন যে, ফেরেশতারা তাদের রবের বাণীসমূহ তাঁর রসূলের কাছে সঠিকভাবে পৌছিয়ে দিয়েছে। তিনি, আল্লাহ তা'আলা জানবেন যে, রসূলগণ তাঁদের রবের বাণীসমূহ তাঁর বান্দাদের কাছে ঠিকমত পৌছিয়ে দিয়েছেন। আয়াতটির শব্দমালা এ তিনটি অর্থেরই ধারক। অসম্ভব নয় যে, এখানে যুগপৎ এ তিনটি অর্থই বুঝানো হয়েছে। এ ছাড়াও আয়াতটির আরো দু'টি অর্থ হ্য। প্রথমটি হলো রিসালাতের দায়িত্ব আঞ্চাম দেয়ার জন্য রসূলকে যতটুকু 'ইলমে গায়েব' বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করা জরুরী ততটুকু জ্ঞান দান করা। দ্বিতীয়টি হলো, যেসব ফেরেশতাকে প্রহরা কাজে নিয়োজিত করা হয় তারা রসূল পর্যন্ত সুরক্ষিত পছাড় অহী পৌছে যাওয়ার ব্যাপারটুকুই শুধু তত্ত্বাবধান করেন না বরং রসূল তাঁর রবের বাণীসমূহ তাঁর বান্দাদের কাছে যাতে পুরোপুরি পৌছিয়ে দিতে পারেন তার তত্ত্বাবধানও করে থাকেন।

৩০. অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা রসূল ও ফেরেশতা উভয়কে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত করে আছে যে, তারা যদি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুল পরিমাণ কাজে করেন তাহলে সংগে সংগে পাকড়াও হবেন। আর যে বাণীসমূহ আল্লাহ পাঠান তার প্রতিটি বর্ণ গোণা ও হিসেব করা। তার একটি বর্ণের হাস-বৃক্ষি করার ক্ষমতাও রসূল বা ফেরেশতা কারো নেই।

# আল মুয়্যামিল

৭৩

## নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের المزمل শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এটা শুধু সূরাটির নাম, এর বিষয়বস্তুর শিরোনাম নয়।

## নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার দু'টি রূক্তি' দু'টি তিনি সময়ে নাযিল হয়েছে।

প্রথম রূক্তি'র আয়াতগুলো মকায় নাযিল হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। এর বিষয়বস্তু এবং বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা থেকেও তা বুঝা যায়। তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, মকী জীবনের কোন পর্যায়ে তা নাযিল হয়েছিল? হাদীসের বর্ণনাসমূহ থেকে আমরা এর কোন জবাব পাই না। তবে পুরো রূক্তি'টির বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্ণয় করতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়।

প্রথমত, এতে রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতের বেলা উঠে আল্লাহর ইবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে তাঁর মধ্যে নবুওয়াতের শুরু দায়িত্ব বহনের শক্তি সৃষ্টি হয়। এ থেকে জানা গেল যে, এ নির্দেশটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রথম শুরু এমন এক সময় নাযিল হয়ে থাকবে যখন আল্লাহর তা'আলার পক্ষ থেকে এ পদমর্যাদার জন্য তাঁকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল।

দ্বিতীয়ত, এর মধ্যে তাঁকে তাহজুদ নামাযে অধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কম বা বেশী রাত পর্যন্ত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তখন পর্যন্ত কুরআন মজীদের অন্তত এতটা পরিমাণ নাযিল হয়েছিল যা দীর্ঘক্ষণ তিলাওয়াত করা যেতো।

তৃতীয়ত, এ 'রূক্তি'তে রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিরোধীদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণের উপদেশ এবং মকার কাফেরদের আঘাতের হমকি দেয়া হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রূক্তি'টি যখন নাযিল হয়েছিল তখন রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রকাশ্য তাবলীগ বা প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন এবং মকায় তাঁর বিরোধিতাও ভীত্তি লাভ করেছিল।

দ্বিতীয় রূক্তি' সম্পর্কে মুফাস্সিরগণ যদিও বলেছেন যে, এটিও মকায় নাযিল হয়েছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুফাস্সির একে মদীনায় অবতীর্ণ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। এ রূক্তি'টির বিষয়বস্তু থেকে এ মতটিরই সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ এর মধ্যে আল্লাহর পথে লড়াই করার উল্লেখ আছে। মকায় এর কোন প্রশ্নই ছিল না। এতে ফরযকৃত যাকাত আদায়

করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এটা প্রমাণিত বিষয় যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে যাকাত দেয়া মদীনাতে ফরয হয়েছে।

### বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

প্রথম সাতটি আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে মহান কাজের গুরু দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়েছে তার দায়-দায়িত্ব ঠিকমত পালনের জন্য আপনি নিজেকে প্রস্তুত করুন। এর বাস্তব পক্ষা বলা হয়েছে এই যে, আপনি রাতের বেলা উঠে অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশী সময় বা কিছু কম সময় পর্যন্ত নামায পড়ুন।

৮ থেকে ১৪ নং পর্যন্ত আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি সবকিছু থেকে বিছির হয়ে সমগ্র বিশ-জাহানের অধিপতি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে যান। নিজের সমস্ত ব্যাপার তাঁর কাছে সোপন্দ করে দিয়ে নিঃশংক ও নিশ্চিন্ত হয়ে যান। বিরোধীরা আপনার বিরুদ্ধে যা বলছে সে ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করুন, তাদের কথায ঝক্কেপ করবেন না। তাদের ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিন। তিনিই তাদের সাথে বুরাপড়া করবেন।

এরপর ১৫ থেকে ১৯ নম্বর পর্যন্ত আয়াতে মকার যে সমস্ত মানুষ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করছিলো তাদের এ বলে হিশ্যারী দেয়া হয়েছে যে, আমি যেমন ফেরাউনের কাছে রসূল পাঠিয়েছিলাম ঠিক তেমনি তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি। কিন্তু দেখো, আল্লাহর রসূলের কথা না শুনে ফেরাউন কিন্তু পরিগামের সম্মুখীন হয়েছিল। মনে করো, এ জন্য দুনিয়াতে তোমাদের কোন শাস্তি দেয়া হলো না। কিন্তু কিয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে তোমরা কিভাবে নিঙ্কতি লাভ করবে?

এ পর্যন্ত যা বর্ণিত হলো তা প্রথম রূক্তির বিষয়বস্তু। হ্যরত সাঈদ ইবনে জুবায়েরের বর্ণনা অনুসারে এর দশ বছর পর দ্বিতীয় রূক্তি নাযিল হয়েছিল। তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে প্রথম রূক্তির শুরুতেই যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এতে তা সহজ করে দেয়া হয়েছে। এখন নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তাহাজ্জুদ নামায যতটা সহজে ও স্বচ্ছন্দে আদায় করা সম্ভব সেভাবেই আদায় করবে। তবে মুসলমানদের যে বিষয়টির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে তাহলো, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতাসহ আদায় করবে। যাকাত যেহেতু ফরয তাই তা যথাযথভাবে আদায় করবে এবং আল্লাহর পথে নিজের অর্থ-সম্পদ বিশুদ্ধ নিয়তে খরচ করবে। সবশেষে মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়াতে তোমরা যেসব কল্যাণমূলক কাজ আজ্ঞায় দেবে তা ব্যর্থ হবে না। বরং তা এমন সব সাজ-সরঞ্জামের মত যা একজন মুসাফির তার স্থায়ী বাসস্থানে আগেই পাঠিয়ে দেয়। আল্লাহর কাছে পৌছার পর তোমরা তার সবকিছুই পেয়ে যাবে যা দুনিয়া থেকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলে। আগেভাগেই পাঠিয়ে দেয়া এসব সরঞ্জাম-সামগ্রী তোমরা দুনিয়াতে যা ছেড়ে যাবে তার চেয়ে যে শুধু তাল তাই নয়, বরং আল্লাহর কাছে তোমরা তোমাদের আসল সম্পদের চেয়ে অনেক বেশী পূরস্কারও লাভ করবে।

আয়াত ২০

সূরা আল মুয়াম্বিল - মক্কী

রুক্মি ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يَا يَاهَا الْمَرْمَلٌ ۝ قَبْرِ الْيَلِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ  
 عَلَيْهِ وَرِتَلِ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا ۝ إِنَّ اسْنَلْقَى عَلَيْكَ قَوْلًا تَقِيلًا ۝ إِنَّ نَاسِئَةَ  
 الْيَلِ هِيَ أَشَدُ وَطَأً وَقُوًّا قَيْلًا ۝ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَا سَبَحًا طَوِيلًا ۝ وَإِذْ كِرَاسِرَ  
 رِبَكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبَتِّيلًا ۝

হে বক্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী<sup>১</sup> রাতের বেলা নামাযে রত থাকো। তবে কিছু সময় ছাড়া<sup>২</sup> অধেক রাত, কিংবা তার চেয়ে কিছু কম করো। অথবা তার ওপর কিছু বাড়িয়ে নাও।<sup>৩</sup> আর কুরআন খেমে খেমে পাঠ করো।<sup>৪</sup> আমি অতি শীঘ্র তোমার ওপর একটি গুরুত্বার বাণী নথিল করবো।<sup>৫</sup> প্রকৃতপক্ষে রাতের বেলা জেগে উঠা<sup>৬</sup> প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বেশী কার্যকর।<sup>৭</sup> এবং যথাযথভাবে কুরআন পড়ার জন্য উপযুক্ত সময়<sup>৮</sup> দিনের বেলা তো তোমার অনেক ব্যস্ততা রয়েছে। নিজ প্রভূর নাম ঘরণ করতে থাকো<sup>৯</sup> এবং সবার থেকে বিছির হয়ে তাঁরই জন্য হয়ে যাও।

১. এ শব্দগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংবোধন করে আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন রাতের বেলা ওঠেন এবং ইবাদাতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, সে সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন অথবা ঘুমানোর জন্য চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। এ সময় তাঁকে হে নবী (স) অথবা হে রসূল বলে সংবোধন না করে হে বক্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী বলে সংবোধন একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংবোধন। এর যে অর্থ দাঁড়ায় তা হলো, এখন আর সে সময় নেই যখন তিনি নিচিতে আরামে ঘুমাতেন। এখন তাঁর ওপর এমন এক বিরাট কাজের বোৰা চাপানো হয়েছে যার দাবী ও চাহিদা সম্পূর্ণ তির ধরনের।

২. এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক, নামাযে দাঁড়িয়ে রাত অতিবাহিত করো এবং রাতের অর্ব কিছু সময় মাত্র ঘুমে কাটাও। দুই, তোমার কাছে সমস্ত রাতই নামায পড়ে কাটিয়ে দেয়ার দাবী করা হচ্ছে না। বরং তুমি বিশ্রামও করো এবং রাতের একটা ক্ষুদ্র

অংশ ইবাদাত-বন্দেগীতেও ব্যয় করো। কিন্তু পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে প্রথমোক্ত অর্থটাই অধিকতর সামজ্ঞস্পূর্ণ। সূরা দাহরের ২৬নং আয়াত থেকে একথারই সমর্থন পাওয়া যায়। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে :

وَمِنَ الْلَّيلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَهُ لَيْلًا طَوِيلًا

“রাতের বেলা আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে থাকো এবং রাতের বেশীর ভাগ সময় তাঁর তাসবীহ ও প্রশংসায় অভিবাহিত করো।”

৩. যে সময়টুকু ইবাদাত করে কাটাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল সে সময়ের পরিমাণ কি হবে এটা তারই ব্যাখ্যা। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তিনি ইচ্ছা করলে অর্ধেক রাত নামায পড়ে কাটাতে পারেন কিংবা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী করতে পারেন। তবে বাচনভঙ্গী থেকে বুঝা যায় যে, অর্ধেক রাত-ই অ্যাধিকারযোগ্য। কারণ অর্ধেক রাতকে মানদণ্ড নির্ধারিত করে তার থেকে কিছু কম বা তার চেয়ে কিছু বেশী করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

৪. অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ও দ্রুতগতিতে পড়ো না। বরং ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ সুন্দরভাবে মুখে উচ্চারণ করে পড়ো। এক একটি আয়াত পড়ে থেমে যাও যাতে মন আল্লাহর বাণীর অর্থ ও তার দাবীকে পুরোপুরি উপলক্ষ্য করতে পারে এবং তার বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোন জায়গায় আল্লাহর সন্তা ও শুণাবলীর উল্লেখ থাকলে তার মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও ভীতি যেন মনকে ঝোকুনি দেয়। কোন জায়গায় তাঁর রহমত ও করুণার বর্ণনা আসলে হৃদয়-মন যেন কৃতজ্ঞতার আবেগে আপৃত হয়ে ওঠে। কোন জায়গায় তাঁর গ্যব ও শাস্তির উল্লেখ থাকলে হৃদয়-মন যেন তার ভয়ে কম্পিত হয়। কোথাও কোন কিছু করার নির্দেশ থাকলে কিংবা কোন কাজ করতে নিষেধ করা হয়ে থাকলে কি কাজ করতে আদেশ করা হয়েছে এবং কোন কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা যেন ভালভাবে বুঝে নেয়া যায়। মোট কথা কুরআনের শব্দগুলো শুধু মুখ থেকে উচ্চারণ করার নাম কুরআন পাঠ নয়, বরং মুখ থেকে উচ্চারণ করার সাথে সাথে তা উপলক্ষ্য করার জন্য গভীরভাবে চিত্ত-ভাবনাও করতে হবে। হ্যরত আনাসকে (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুরআন পাঠের নিয়ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শব্দগুলোকে টেনে টেনে পড়তেন। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি আল্লাহ, রাহমান এবং রাহীম শব্দকে মদ্দ করে বা টেনে পড়তেন। (বুখারী) হ্যরত উমে সালামাকে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক একটি আয়াত আলাদা আলাদা করে পড়তেন এবং প্রতিটি আয়াত পড়ে থামতেন। যেমন **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** পড়ে থামতেন, তারপর **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ** পড়ে থামতেন এবং কিছু সময় থেমে থেকে **مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ** পড়তেন। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিয়ী) আরেকটি রেওয়ায়াতে হ্যরত উমে সালামা (রা) বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একেকটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে পড়তেন। (তিরমিয়ী, নাসায়ী) হ্যরত হ্যায়ফ ইবনে ইয়ামান বর্ণনা করেছেন যে, একদিন রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়তে দাঁড়ালাম। আমি দেখলাম, তিনি

এমনভাবে কুরআন তেলাওয়াত করছেন যে, যেখানে তাসবীহের বিষয় আসছে সেখানে তিনি তাসবীহ পড়ছেন, যেখানে দোয়ার বিষয় আসছে সেখানে দোয়া করছেন এবং যেখানে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয় আসছে সেখানে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। (মুসলিম, নাসাইয়া) হ্যুরত আবু যার বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাতের নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লায় যখন এ আয়াতটির কাছে পৌছলেন  
 إِنَّ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  
 “তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও, তারা তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও তাহলে তুমি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ) তখন তিনি বার বার এ আয়াতটি পড়তে থাকলেন এবং এভাবে তোর হয়ে গেল।” (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী)

৫. এর অর্থ হলো তোমাকে রাতের বেলা নামায পড়ার এ নির্দেশ এ জন্য দেয়া হচ্ছে যে, আমি একটি অতি গুরুত্বার বাণী তোমার ওপরে নাযিল করছি। এ ভার বহন করার এবং তা বরদাশত করার শক্তি তোমার মধ্যে সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। তুমি এ শক্তি অর্জন করতে চাইলে আরাম পরিভ্যাগ করে রাতের বেলা নামাযের জন্য ওঠো এবং অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী রাত ইবাদাত বন্দেগীতে কাটিয়ে দাও। কুরআনকে গুরুত্বার বাণী বলার কারণ হলো, তার নির্দেশ অনুসারে কাজ করা, তার শিক্ষার উদ্দাহরণ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা, সারা দুনিয়ার সামনে তার দাওয়াত বা আহবান নিয়ে দৌড়ানো এবং তদন্যায়ী আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, নৈতিক চরিত্র ও আচার-আচরণ এবং তাহ্যীব-তামাদুনের গোটা ব্যবস্থায় বিপ্লব সংযুক্তি করা এমন একটি কাজ যে, এর চেয়ে বেশী কঠিন ও গুরুত্বার কাজের কম্বনাও করা যায় না। এ জন্যও একে গুরুত্বার ও কঠিন বাণী বলা হয়েছে যে, তার অবতরণের ভার বহন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। হ্যুরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হওয়ার সময় তিনি আমার উরুর ওপর তাঁর উরু ঢেকিয়ে বসেছিলেন। আমার উরুর ওপর তখন এমন চাপ পড়ছিলো যে, মুনে হচ্ছিলো তা এখনই ভেঙে যাবে। হ্যুরত আয়েশা বর্ণনা করেন : আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হতে দেখেছি। সে সময়ও তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকতো। (বুখারী, মুসলিম, মালিক, তিরমিয়ী, নাসাইয়া) আরেকটি রেওয়ায়াতে হ্যুরত আয়েশা (রা) বলেছেন : উটনীর ওপর সওয়ার থাকা অবস্থায় যখনই তাঁর ওপর অহী নাযিল হতো উটনী তখন তার বুক মাটিতে ঢেকিয়ে দিতো। অহী নাযিল শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারতো না। (মুসনাদে আহমাদ, হাকেম, ইবনে জায়ির)

৬. মূল ইবারাতে **شَدِّ الْبَلِّ** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার বাখ্যায় মুফাস্সির ও ভাষাবিদদের চারটি ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। একটি মত হলো, **شَدِّ** শব্দের মানে রাতের বেলা শয্যা ত্যাগকারী ব্যক্তি। দ্বিতীয় মতটি হলো এর অর্থ রাত্রিকালীন সময়। তৃতীয় মত হলো এর অর্থ রাতের বেলা জেগে থাকা বা ওঠা। আর চতুর্থ মতটি হলো, এর অর্থ শুধু রাতের বেলা ওঠা বা জেগে থাকা নয়। বরং ঘুমিয়ে পড়ার পর জেগে ওঠা। হ্যুরত আয়েশা এবং মুজাহিদ এ চতুর্থ অর্থটিই গ্রহণ করেছেন।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْنَاهُ وَكَيْلًا ۝ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ  
 رَاهِجَهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝ وَذَرْنَىٰ وَالْمَكَنِ بَيْنَ أُولَى النِّعَمَةِ وَمَهْلِمِهِ  
 قَلِيلًا ۝ إِنَّ لَدِينَنَا أَنَّكَ لَا تَوْجِحُهُمْ ۝ وَطَعَامًا ذَافِصَةً وَعَلَّابًا لِيَمَادًا  
 يَوْمَ تَرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيرًا مَهْبِلًا ۝

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তাই তাঁকেই নিজের উকীল হিসেবে গ্রহণ করো।<sup>10</sup> আর লোকেরা যা বলে বেড়াচ্ছে সে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করো এবং ভদ্রভাবে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও।<sup>11</sup> এসব মিথ্যা আরোপকারী সম্পদশালী লোকদের সাথে বুঝাপড়ার ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।<sup>12</sup> আর কিছু কালের জন্য এদেরকে এ অবস্থায়ই থাকতো দাও। আমার কাছে (এদের জন্য) আছে শক্ত বেড়ি,<sup>13</sup> জুলন্ত আগুন, গলায় আটকে যাওয়া খাবার এবং যন্ত্রণাদায়ক আয়াব। এসব হবে সেদিন যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা কেঁপে উঠবে এবং পাহাড়গুলোর অবস্থা হবে এমন যেন বালুর স্তুপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে।<sup>14</sup>

৭. আয়াতে **أَشْدَدُ وَطَأً** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এতো ব্যাপক যে, একটি মাত্র বাক্যে তা বুঝানো সম্ভব নয়। এর একটি অর্থ হলো, রাতের বেলা ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য শয্যা ত্যাগ করে ওঠা এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা যেহেতু মানুষের স্বতাব-বিরক্ত কাজ, মানুষের মন ও প্রবৃত্তি এ সময় আরাম কামনা করে, তাই এটি এমন একটি কাজ ও চেষ্টা-সাধনা যা প্রবৃত্তিকে অবদমিত ও বশীভূত করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর পথ। যে বাস্তি এ প্রস্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয় এবং দেহ ও মন-মগজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিজের এ শক্তিকে আঁচাহর পথে ব্যবহার করতে সক্ষম হয় সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সত্য ও শাশ্বত এ দীনের দাওয়াতকে পৃথিবীতে বিজয়ী করার কাজ করতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ হলো, এ কাজটি মানুষের হৃদয়-মন ও বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করার একটা কার্যকর উপায়। কারণ রাতের এ সময়টিতে বালা ও আঁচাহর মধ্যে আর কেউ আড়াল হয় না। এ অবস্থায় মানুষ মুখে যা বলে তা তার হৃদয়ের কথার প্রতিক্রিণি। তৃতীয় অর্থ হলো, এটি মানুষের ভেতর ও বাহিরের মধ্যে সংগতি ও যিন সৃষ্টির অতি কার্যকর একটি উপায়। কারণ যে বাস্তি রাতের নির্জন নির্থর পারিবেশে আরাম পরিত্যাগ করে ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য উঠবে সে নিসন্দেহে খালেস মনেই এলাপ করবে। তাতে প্রদর্শনীর বা লোক দেখানোর আদৌ কোন সুযোগ থাকে না। চতুর্থ অর্থ হলো, মানুষের জন্য এ ধরনের ইবাদাত-বন্দেগী যেহেতু দিনের বেলার ইবাদাত-বন্দেগীর চেয়ে অনেক বেশী কষ্টকর। তাই তা নিয়মিত করার ফলে মানুষের মধ্যে অনেক বেশী দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়,

১০। সে অত্যন্ত শক্ত হয়ে আগ্নাহর পথে অগ্রসর হতে পারে এবং এ পথের কঠোরতাসমূহকে সে অটল ও অবিচল থেকে বরদাশত করতে পারে।

৮. মূল ইবারতে আগুমْ قُبْلًا বলা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো, 'কথাকে আরো বেশী যথার্থ ও সঠিক বানায়।' তবে এর মূল বক্তব্য হলো, সে সময় মানুষ আরো বেশী প্রশান্তি, তৃষ্ণি ও মনোযোগ সহকারে বুঝে কুরআন শরীফ পড়তে পারে। ইবনে আব্রাস (রা) এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে কর্তৃর উপরে অবস্থিত গভীর চিন্তা-ভাবনা ও মনোনিবেশসহ কুরআন পাঠের জন্য এটা একটা অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত সময়। (আবু দাউদ)

৯. দিনের বেলার ব্যস্ততার উল্লেখ করার পর 'তোমার রবের নাম স্মরণ করতে থাকো' এ নির্দেশ দেয়া থেকে আপনা আপনি একথাটি প্রকাশ পায় যে, দুনিয়াতে হাজারো কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও তোমার রবের স্মরণ থেকে গাফেল যেন না হও। বরং কোন না কোনভাবে তাকে স্মরণ করতে থাকো। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহ্যাব, টীকা ৬৩)

১০. উকীল বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যার প্রতি আহ্বা রেখে কোন ব্যক্তি নিজের ব্যাপার তার ওপর সোপর্দ করে। উদ্দৃ তায়াতে প্রায় এ অধৈই আমরা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উকীল শব্দটি ব্যবহার করি আমাদের মামলা-মোকদ্দমা যার হাতে অর্পণ করে কেউ এতটা নিশ্চিন্ত হয়ে যায় যে, সে তার পক্ষ থেকে ভালভাবেই মামলাটি নড়বে এবং তার নিজের এ মামলা লড়ার কোন দরকার হবে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতটির অর্থ হলো, দীনের দাওয়াত পেশ করার কারণে তোমার বিরোধিতার যে তুফান সৃষ্টি হয়েছে এবং তোমার ওপর যেসব বিপদ-মুসিবত আসছে সে জন্য তুমি অস্ত্রির বা উৎকর্তিত হয়ে না। তোমার প্রতু তো সেই সন্তা যিনি পূর্ব ও পশ্চিম তথ্য সমষ্টি বিশ্ব-জাহানের মালিক। ইলাহী ক্ষমতা ও কর্তৃত একমাত্র তাঁর ছাড়া আর কারো হাতে নেই। তুমি তোমার সমস্ত ব্যাপার তাঁর হাতে সোপর্দ করে দাও এবং নিশ্চিন্ত হয়ে যাও যে, এখন তোমার মোকদ্দমা তিনি নিজে লড়বেন, তোমার বিরক্ষতবাদীদের সাথে তিনিই বুঝাগড়া করবেন এবং তোমার সব কাজ তিনিই সম্পর্ক করবেন।

১১. 'আলাদা হয়ে যাও' কথাটির অর্থ এই নয় যে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছির করে ইসলামের তাবলীগের কাজ বন্ধ করে দাও। বরং এর অর্থ হলো, তাদের প্রতি উপেক্ষপ করো না, তাদের অন্যায় ও অর্থহীন আচরণ উপেক্ষা করে চলো এবং তাদের কোন অত্যন্ত আচরণের জবাব দিও না। তবে তাদের প্রতি এ উপেক্ষা এবং নির্দিষ্টাও যেন কোন প্রকার ক্ষেত্রে, ক্রেতে এবং বিরক্ষিত না হয়। বরং তা যেন এমন উপেক্ষা হয়, যেমন একজন তদ্ব মানুষ কোন অসভ্য বাউগেলে বা বখাটে লোকের গালি শুনে যেমন তা উপেক্ষা করে এবং মনকে ভারাক্রান্ত হতে পর্যন্ত দেয় না। এ থেকে এক্সপ ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়া ঠিক নয় যে, রসূলুল্লাহ আলাইহি শুয়া সাল্লামের কর্মপদ্ধতি বোধ হয় এ থেকে কিছুটা তির ধরনের ছিল। তাই আগ্নাহ তাঁকে এ আদেশ করেছেন। তিনি মূলত প্রথম থেকেই এ কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করছিলেন। তবে কুরআনে এ নির্দেশ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের একথা জানিয়ে দেয়া যে, তোমরা যে আচরণ করছো তার জবাব না দেয়ার কারণ দুর্বলতা নয়। বরং এরপ আচরণের জবাবে আগ্নাহ তাঁর রসূলকে এ ধরনের ভদ্রজনোচিত পর্হা গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছেন।।

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْ فِرْعَوْنَ رَسُولًا  
 فَعَصَى فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخْلَى نَهَا خَلَى وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَقَوَّنَ إِنْ  
 كَفَرَ تَرْبِيْوْمَا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَيْبَاً السَّمَاءَ مُنْفَطِرَ بِهِ كَانَ وَعْدَهُ  
 مَفْعُولًا إِنْ هُنْ قَرْرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَيْ رَبِّهِ سَبِيلًا

আমি তোমাদের<sup>১৫</sup> নিকট একজন রসূল পাঠিয়েছি তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ<sup>১৬</sup> যেমন ফেরাউনের নিকট একজন রসূল পাঠিয়েছিলাম। দেখো, ফেরাউন যখন সে রসূলের কথা মানলো না তখন আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলাম। তোমরা যদি মানতে অশ্রীকার করো তাহলে সেদিন কিভাবে রক্ষা পাবে যেদিনটি শিশুকে বৃক্ষ বানিয়ে দেবে<sup>১৭</sup> যেদিনের কঠোরতায় আকাশ মণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে যেতে থাকবে? আল্লাহর প্রতিশ্রূতি তো পূর্ণ হবেই। এ একটি উপদেশ বাণী। অতএব যে চায় সে তার প্রভুর পথ অবলম্বন করুক।

১২. একথা থেকে এ মর্মে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় যে, যেকোন যেসব লোক রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করছিল এবং নানাভাবে ধোকা দিয়ে এবং নানা রকমের ব্যাখ্যাতি সংকীর্ণতা ও বিদেশ উক্তে দিয়ে তার বিরোধিতায় নামহিল তারা সবাই ছিল জাতির সচ্ছল, সম্পদশালী ও বিলাসপ্রিয় মানুষ। কারণ ইসলামের এ সংক্ষার আন্দোলনের আঘাত তাদের স্বার্থের উপর সরাসরি পড়েছিল। কুরআন আমাদের বলে যে, এ আচরণ শুধু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই ছিল না বরং এ গোষ্ঠী চিরদিনই সংক্ষার ও সংশোধনের পথ রূপ করার জন্য জগন্দল পাথরের মত বাধা সৃষ্টি করে এসেছে। উদাহরণ হিসেবে দেখুন, সূরা আল আরাফ, আয়াত ৬০, ৬৬, ৭৫, ৮৮; আল মু'মিন, ৩৩; সাবা, ৩৪ ও ৩৫ এবং আয় যুখরুফ, ২৩)

১৩. জাহানামে পাপী ও অপরাধীদের পায়ে তারী বেড়ি পরানো হবে। তারা যাতে পালাতে না পাবে সে জন্য এ বেড়ি পরানো হবে না, বরং তা পরানো হবে এ জন্য যে, তারা যেন উঠতে না পাবে। এ বেড়ি পালিয়ে যাওয়া ক্রোধ করার জন্য নয় বরং শাস্তি বৃক্ষি করার জন্য।

১৪. সে সময় পাহাড়সমূহের বিভিন্ন অংশকে পরম্পর সংযুক্ত রাখার ক্ষেত্রীয় বল নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই প্রথমে তা যিহি বালুর স্তুপে পরিণত হবে। অতপর ভূমিকম্প গোটা পৃথিবীকে প্রবলভাবে কাঁপিয়ে তুলে বালুর এ স্তুপ বিক্ষিণ্ণ হয়ে যাবে এবং গোটা ভূপৃষ্ঠ একটা বিশাল প্রান্তরে রূপান্তরিত হবে। এ অবস্থার একটি চিত্র সূরা আল-হার ১০৫ থেকে ১০৭ আয়াত পর্যন্ত এভাবে তুলে ধরা হয়েছে : “লোকেরা তোমাকে এসব পাহাড়ের অবস্থা কি হবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। ভূমি বলো, আমার প্রভু পাহাড়সমূহকে

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثَلَاثِيَّةِ الْأَيَّلِ وَنِصْفَهِ وَثُلَثَتِهِ وَطَائِفَةٍ  
مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدِرُ الْأَيَّلَ وَالنَّهَارَ عَلَيْكَ أَنْ لَنْ تَحْصُوهُ  
فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَسْرِيْرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمْتَ أَنْ سِيْكُونْ مِنْكُمْ  
مَرْضِيٌّ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَمْتَغِفُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَآخَرُونَ يَقْاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَسْرِيْرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوْةَ وَأَقْرِبُوا إِلَيْهِ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ  
مِّنْ خَيْرٍ تَجْهِلُ وَهُنَّ عِنْ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا إِلَيْهِ إِنَّ

الله غفور رحيم ⑬

## ২ রূপ্তু

হে নবী,<sup>১৮</sup> তোমার রব জানেন যে, তুমি কোন সময় রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কোন সময় অর্ধাংশ এবং কোন সময় এক-তৃতীয়াংশ সময় ইবাদাতে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দাও।<sup>১৯</sup> তোমার সংগী একদল লোকও এ কাজ করে।<sup>২০</sup> রাত এবং দিনের সময়ের হিসেব আল্লাহই রাখেন। তিনি জানেন, তোমারা সময়ের সঠিক হিসেব রাখতে পারো না। তাই তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এখন থেকে কুরআন শরীফের যতটুকু স্বাচ্ছন্দে পড়তে পারবে ততটুকুই পড়বে।<sup>২১</sup> তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক হবে অসুস্থ, কিছু লোক আল্লাহর অনুগ্রহ সন্দানে ভ্রমণরত।<sup>২২</sup> এবং কিছু লোক আল্লাহর পথে নড়াই করে।<sup>২৩</sup> তাই কুরআনের যতটা পরিমাণ সহজেই পড়া যায় ততটাই পড়তে থাকো। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও।<sup>২৪</sup> এবং আল্লাহকে ‘করয়ে হাসানা’ দিতে থাকো।<sup>২৫</sup> তোমরা নিজের জন্য যে পরিমাণ কল্যাণ অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে তা আল্লাহর কাছে প্রস্তুত পাবে। সেচিহি অধিক উত্তম এবং পুরস্কার হিসেবে অনেক বড়।<sup>২৬</sup> আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

ধূলির মত করে ওড়াবেন এবং ভৃষ্টকে এমন সমতল বিশাল প্রাঞ্চরে ঝুঁপান্তরিত করবেন যে, তুমি সেখানে উচ্চ নিচু বা তাঁজ দেখতে পাবে না।”

১৫. মকার যেসব কাফের রসূলগ্রাহ সান্নাত্রাহ আলাইহি ওয়া সান্নামকে অঙ্গীকার করছিলো এবং তাঁর বিরোধিতায় অতি মাত্রায় তৎপর ছিল এখানে তাদের উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে।

১৬. লোকদের জন্য রসূলগ্রাহ সান্নাত্রাহ আলাইহি ওয়া সান্নামকে সাক্ষী বানিয়ে পাঠানোর একটি অর্থ হলো, তিনি দুনিয়ায় তাদের সামনে নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্ত্বের সাক্ষ পেশ করবেন। আরেকটি হলো আখেরাতে যখন আল্লাহর আদালত কাশেম হবে সে সময় তিনি সাক্ষ দেবেন যে, এসব লোকের কাছে আমি সত্ত্বের আহবান পৌছিয়ে দিয়েছিলাম। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারা, টীকা ১৪৪; আন নিসা, টীকা ৬৪; আন নাহল, আয়াত ৮৪-৮৯; আল আহ্যাব, টীকা ৮২; আল ফাত্হ, টীকা ১৪)

১৭. অর্থাৎ প্রথম তো তোমাদের এ তর করা উচিত যে, আমার প্রেরিত রসূলের কথা যদি তোমরা না মানো তাহলে এ একই অপরাধের কারণে ফেরাউন যে দুর্ভাগ্যজনক পরিগাম ভোগ করেছে অনুরূপ পরিগাম দুনিয়াতেই তোমাদের ভোগ করতে হবে। আর মনে করো, দুনিয়ায় যদি তোমাদের জন্য কোন আয়াবের ব্যবস্থা নাও করা হয় তাহলেও কিয়ামতের আয়াব থেকে কিভাবে নিঃকৃতি পাবে?

১৮. ইতিপূর্বে তাহাঙ্গুদ নামাযের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এ আয়াতের মাধ্যমে তা শিথিল ও সহজ করা হয়েছে। এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময়-কাল সম্পর্কে তিনি তিনি রেওয়ায়াত আছে। মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম ও আবু দাউদে এ রেওয়ায়াত উচ্চৃত হয়েছে যে, তাহাঙ্গুদ নামায সম্পর্কে প্রথম নির্দেশের পর এ দ্বিতীয় নির্দেশটি এক বছর পর নাযিল হয়েছিল এবং রাতের বেলার ইবাদাত-বন্দেগী ফরয পর্যায়ে না রেখে নফল করে দেয়া হয়েছিল। ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম হয়রত আয়েশা (রা) থেকেই আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ নির্দেশটি প্রথম নির্দেশের আট মাস পরে দেয়া হয়েছিল। হয়রত আয়েশা থেকে ইবনে আবী হাতেম তৃতীয় আরেকটি বর্ণনা উচ্চৃত করেছেন। এতে পরবর্তী নির্দেশটি শোল মাস পরে নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবু দাউদ, ইবনে জারীর এবং ইবনে আবী হাতেম হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস থেকে এক বছর সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হয়রত সাদিদ ইবনে জুবায়েরের বর্ণনা হলো, নির্দেশটি দশ বছর পর নাযিল হয়েছিল (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম)। আমাদের মতে এ বর্ণনাটি অধিক বিশুদ্ধ। কারণ প্রথম রূক্ত'র বিষয়বস্তু থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তা মকায় নাযিল হয়েছিল এবং মক্কী যুগেরও একদম প্রথম দিকে। নবী সান্নাত্রাহ আলাইহি ওয়া সান্নামের নবওয়াতলাতের পর তখন বড়জোর চারটি বছর অতিবাহিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় রূক্ত'র বিষয়বস্তুর স্পষ্ট বক্তব্য অনুসারে তা মদীনাতে নাযিল হয়েছিল বলে মনে হয়। তখন কাফেরদের সাথে সশন্ত যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং যাকাত ফরয হওয়ার নির্দেশও দেয়া হয়েছিল। তাই এ দু'টি রূক্ত'র নাযিল হওয়ার সময়কালের মধ্যে অনিবার্যভাবে কম করে হলেও দশ বছরের ব্যবধান হওয়া উচিত।

১৯. প্রাথমিক নির্দেশে যদিও অধিক রাত বা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশী সময় নামাযে দৌড়িয়ে থাকতে বলা হয়েছিল। কিন্তু নামাযে নিমগ্নতার কারণে সময়ের আন্দাজ বা

পরিমাপ ঠিক থাকতো না। আর সে সময় ঘড়িও ছিল না যে, সময় ঠিকমত পরিমাপ করা যাবে। সুতরাং কোন সময় দুই-তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত ইবাদাতে কেটে যেতো আবার কোন সময় তা হাস পেয়ে শুধু এক-তৃতীয়াংশের মত হতো।

২০. প্রথম পর্যায়ে নির্দেশ দেয়ার সময় শুধু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই সম্মোধন করা হয়েছিল এবং তাঁকেই রাতে নামায পড়তে বলা হয়েছিল। কিন্তু সে সময় মুসলমানদের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ এবং নেকী অর্জনের যে অব্বাভাবিক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল সে কারণে অধিকাংশ সাহাবীও এ নামাযকে গুরুত্ব দিতেন এবং তা পড়তেন।

২১. কুরআন তেলাওয়াত দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণেই যেহেতু নামায দীর্ঘায়িত হয় সে জন্য বলেছেন যে, তাহাঙ্গুদ নামাযে যতটা পরিমাণ কুরআন সহজে ও স্থাচন্দে পড়তে পার, ততটাই পড়। এভাবে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী নামায আপনা থেকেই হাস প্রাপ্ত হবে। এ কথাটির শব্দমালা বাহ্যিকভাবে যদিও নির্দেশের মত, কিন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত যে, তাহাঙ্গুদের নামায ফরয নয়, বরং নফল। হাদীসেও স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তোমাদের জন্য দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। সে জিজ্ঞেস করলো : এ ছাড়া অন্য কিছু কি আমার জন্য অবশ্য করণীয়? জবাবে বলা হলো, ‘না’। তবে তুম বেছায় কিছু পড়লে, তা ভিন্ন কথা। (বুখারী ও মুসলিম)।

এ আয়াত থেকে আরো একটি কথা জানা গেল যে, নামাযে রূক্ত' ও সিজদা যেমন ফরয তেমনি কুরআন মজীদ পড়াও ফরয। কারণ আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য স্থানে যেমন রূক্ত' ও সিজদা শব্দ নামায অর্থে ব্যবহার করেছেন তেমনি এখানে কুরআন পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এর অর্থ নামাযে কুরআন পড়। এভাবে প্রমাণ পেশ করার ব্যাপারে কেউ যদি একথা বলে আপত্তি উথাপন করে যে, তাহাঙ্গুদের নামাযই যখন নফল, তখন সে নামাযে কুরআন মজীদ পড়া ফরয হয় কি করে? এর জবাব হলো, কেউ যখন নফল নামায পড়বে তখন নফল নামাযেরও সব শর্ত পূরণ করা এবং তার সব 'রূক্তন' ও ফরয আদায় করা আবশ্যিক। কেউ একথা বলতে পারে না যে, নফল নামাযের জন্য কাপড় ও শরীর পরিত্র হওয়া, অ্যু করা এবং সতর থাকা ওয়াজিব নয় এবং নফল নামাযে দাঁড়ানো, বসা এবং রূক্ত' ও সিজদা করা সবই নফল।

২২. হালাল ও বৈধ উপায়ে রূজি অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করাকে কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর মেহেরবানী ও করণ্ণা অনুসন্ধান বলে আখ্যায়িত করেছে।

২৩. এখানে আল্লাহ তা'আলা হালাল রূজি উপার্জন এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উল্লেখ এক সাথে যেভাবে করেছেন এবং অসুস্থতা জনিত অক্ষমতা ছাড়া এ দু'টি কাজকেও তাহাঙ্গুদ নামায এবং অব্যাহতি লাভের কিংবা তা কিছুটা লাঘব করার কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন তা থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামে বৈধ পন্থায় রূজি উপার্জন করা কত বড় মর্যাদার কাজ। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

ما من جالبٍ يجلب طعاماً إلى بلدٍ من بلدان المسلمين فيبيعه  
للسُّعْرِ يومَهُ الا كانت منزلته عند الله ثم قرأ رسول الله صلى الله  
عليه وسلم وآخرون يضربون في الأرض .....  
.....

যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন শহর বা জনপদে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে এবং সে দিনের  
বাজার দরে তা বিক্রি করে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। এরপর রসূলুল্লাহ  
সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পড়লেন **وآخرون يضربون في الأرض** (ইবনে মারদুইয়া)

হযরত উমর (রা) বলেছেন :

ما من حال ياتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب  
إلى من أن ياتيني وأنا بين شعبتي جبل التمس من فضل الله  
- وقرأ هذه الآية -

আল্লাহর পথে জিহাদ ছাড়া আর কোন অবস্থায় প্রাণ দেয়া আমার কাছে সর্বাধিক  
পচন্দনীয় হয়ে থাকলে তা হলো এই যে, আমি আল্লাহর অনুগ্রহ বা মেহেরবানী  
অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কোন গিরিপথ অতিক্রম কালে সেখানে মৃত্যু এসে আমাকে  
আলিঙ্গন করছে। তার পর তিনি এ আয়াতটি পড়লেন। (বায়হাকী ফী শ'আবিল ইমান)

২৪. এখানে নামায কায়েম করা এবং যাকাত দেয়া বলতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায  
এবং ফরয যাকাত বুরানো হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ সবাই একমত।

২৫. ইবনে যায়েদ বলেন : এর অর্থ যাকাত দেয়া ছাড়াও নিজের অর্থ-সম্পদ আল্লাহর  
পথে খরচ করা। এ খরচ আল্লাহর পথে জিহাদ করা, আল্লাহর বাদাদের সাহায্য করা,  
জনকল্যাণমূলক কাজ করা কিংবা অন্যান্য কল্যাণকর কাজেও হতে পারে। আল্লাহকে কর্জ  
এবং উন্নত কর্জ দেয়ার অর্থ কি তার ব্যাখ্যা আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থানে করেছি।  
(দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, টীকা ২৬৭; আল মা-য়েদাহ, টীকা  
৩৩ এবং আল হাদীদ, টীকা ১৬)।

২৬. এর অর্থ হলো, আবেরাতের জন্য যা কিছু তোমরা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছো তা  
তোমাদের ঐ সব জিনিসের চেয়ে অনেক বেশী উপকারী যা তোমরা দুনিয়াতেই রেখে  
দিয়েছো এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত কোন কল্যাণকর কাজে যায় করোনি।  
হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, এক সময়  
রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : **أيكم ماله أحب إليه من** :  
**مالوارثه** “তোমাদের এমন কেউ আছে যার নিজের অর্থ-সম্পদ তার উভরাধিকারীর  
অর্থ-সম্পদের চেয়ে তার কাছে বেশী প্রিয়? জবাবে গোকেরা বললো, “হে আল্লাহর রসূল,  
আমাদের মধ্যে কেউ-ই এমন নেই যার নিজের অর্থ-সম্পদ তাঁর কাছে তার  
উভরাধিকারীর অর্থ-সম্পদ থেকে বেশী প্রিয় নয়।” তখন তিনি বললেন : ‘তোমরা কি

বলছো তা ভেবে দেখো।' লোকেরা বললো : হে আল্লাহর রসূল, আমাদের অবস্থা আসলেই এরূপ। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

### انما مال احدكم ماقدم ومال وارثه ما اخر

তোমাদের নিজের অর্থ-সম্পদ তো সেইগুলো যা তোমরা আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছো। আর যা তোমরা রেখে দিয়েছো সেগুলো উয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীদের অর্থ-সম্পদ। (বুখারী, নাসায়ী ও মুসনাদে আবু ইয়ালা)।

---

# আল মুদ্দাস্সির

৭৪

## নামকরণ

প্রথম আয়াতের **الْمُدْرِّ** শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটিও শুধু সূরার নাম। এর বিষয় ভিত্তিক শিরোনাম নয়।

## নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এর প্রথম সাতটি আয়াত পবিত্র মক্কা নগরীতে নবুওয়াতের একেবারে প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিল। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত বৃখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী এবং মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের কোন কোন রেওয়ায়াতে এতদূর পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, এগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হওয়া সর্বপ্রথম আয়াত। কিন্তু গোটা মুসলিম উচ্চার কাছে এ বিষয়টি প্রায় সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম যে অহী নাযিল হয়েছিল তা ছিল একেবারে প্রথম অহী নাযিল হওয়ার পর কিছুকাল পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কোন অহী নাযিল হয়নি। এ বিরতির পর নতুন করে আবার অহী নাযিলের ধারা শুরু হলে সূরা মুদ্দাস্সিরের এ আয়াতগুলো থেকেই তা শুরু হয়েছিল। ইয়াম যুহুরী এর বিত্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এভাবে :

“কিছুকাল পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল বন্ধ রইলো। সে সময় তিনি এতো কঠিন মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন যে, কোন কোন সময় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সেখান থেকে নিজেকে নীচে নিক্ষেপ করতে বা গড়িয়ে ফেলে দিতে উদ্যত হতেন। কিন্তু যখনই তিনি কোন চূড়ার কাছাকাছি পৌছতেন তখনই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সামনে এসে বলতেন : ‘আপনি তো আল্লাহর নবী’ এতে তাঁর হস্তয় মন প্রশান্তিতে ভরে যেতো এবং তাঁর অশ্বষ্টি ও অস্ত্রিতার ভাব বিদ্যুরিত হতো।”

(ইবনে জারীর)

এরপর ইয়াম যুহুরী নিজে হয়রত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়াতেই এভাবে উদ্ভৃত করছেন :

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (অহী বন্ধ ধাকার সময়)-এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন : একদিন আমি পথে চলছিলাম। হঠাৎ আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। ওপরের দিকে তাকিয়েই দেখতে পেলাম হেরা

গিরি শুহায় যে ফেরেশতা আমার কাছে এসেছিল সে ফেরেশতা আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি আসন পেতে বসে আছে। এ দৃশ্য দেখে আমি অত্যন্ত ভীত সন্তুষ্ট হয়ে পড়াম এবং বাড়ীতে পৌছেই বলসাম : আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো। আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো। সুতরাং বাড়ীর লোকজন আমাকে লেপ (অথবা কঁশল) দিয়ে আচ্ছাদিত করলো। এ অবস্থায় আল্লাহ অহী নাযিল করলেন : ..... بِأَيْمَانِ الْمُدْرَبِ ..... “এরপর অব্যাহতভাবে অহী নাযিল হতে থাকলো।” (বুখারী, মুসলিম, মুসর্নাদে আহমাদ, ইবনে জারীর)।

প্রকাশ্যভাবে ইসলামের প্রচার শুরু হওয়ার পর প্রথমবার যক্ষায় হজের মওসুম সমাগত হলে সূরার অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ ৮ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়। ‘সীরাতে ইবনে হিশাম’ গ্রন্থে এ ঘটনা বিশারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা পরে তা উল্লেখ করবো।

### বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সব-প্রথম যে অহী পাঠানো হয়েছিল তা ছিল সূরা ‘আলাকে’র প্রথম পাঁচটি আয়াত। এতে শুধু বলা হয়েছিল :

“পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘জ্যাট’ রক্ত’ থেকে। পড়, তোমার রব বড় মহানুভব। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।”

এটা ছিল অহী নাযিল হওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহসা এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কত বড় মহান কাজের জন্য তিনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আরো কি কি কাজ তাঁকে করতে হবে এ বাণীতে তাঁকে সে বিষয়ে কিছুই জানানো হয়েছিল না। বরং শুধু একটি প্রাথমিক পরিচয় দিয়েই কিছু দিনের জন্য অবকাশ দেয়া হয়েছিল যাতে অহী নাযিলের এ প্রথম অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মন-মানসিকতার ওপর যে কঠিন চাপ পড়েছিল তার প্রভাব বিদ্রূপ হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে অহী গ্রহণ ও নবুওয়াতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যান। এ বিরতির পর পুনরায় অহী নাযিলের ধারা শুরু হলে এ সূরার প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হয় এবং এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ মর্মে আদেশ দেয়া হয় যে, আপনি উঠুন এবং আল্লাহর বাদ্দারা এখন যেভাবে চলছে তার পরিণাম সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দিন। আর এ পৃথিবীতে এখন যেখানে অন্যদের শেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব জোকে বসেছে, সেখানে আল্লাহর শেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের ঘোষণা দিন। এর সাথে সাথে তাঁকে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, এখন থেকে আপনাকে যে কাজ করতে হবে তার দাবী হলো আপনার নিজের জীবন যেন সব দিক থেকে পৃত-পৰিত্র হয় এবং আপনি সব রকমের পার্থিব স্বার্থ উপেক্ষা করে পূর্ণ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে আল্লাহর সৃষ্টির সংক্রান্ত-সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন। অতপর শেষ বাক্যটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যে

কোন কঠিন পরিস্থিতি এবং বিপদ মুসিবতই আসুক না কেন আপনি আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে দৈর্ঘ্য অবলম্বন করুন।

আল্লাহর এ ফরমান কার্যকরী করার জন্য রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের প্রচার শুরু করলেন এবং একের পর এক কুরআন মজীদের যেসব সূরা নাযিল হচ্ছিলো তা শুনাতে থাকলেন তখন মকায় রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেল এবং বিরোধিতার এক তুফান পুর হলো। এ অবস্থায় কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হজ্জের মওসূম এসে পড়লে মকার লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। তারা ভাবলো, এ সময় সমগ্র আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজীদের কাফেলা আসবে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এসব কাফেলার অবস্থান স্থলে হাজির হয়ে হাজীদের সাথে সাক্ষাত করেন এবং বিভিন্ন স্থানে হজ্জের জনসমাবেশসমূহে দায়িত্ব করেন তাহলে সমগ্র আরবের আনাচে কানাচে তৌর আহবান পৌছে যাবে এবং না জানি কত লোক তাতে প্রভাবিত হয়ে পড়বে। তাই কুরাইশ নেতৃত্বে একটি সম্মেলনের ব্যবহা করলো। এতে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, মকায় হাজীদের আগমনের সাথে সাথে তাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে প্রচার প্রোপাগাণ্ডা শুরু করতে হবে। এ বিষয়ে একমত্য হওয়ার পর ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা সমবেত সবাইকে উদ্দেশ করে বললো : আপনারা যদি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে লোকদের কাছে বিভিন্ন রকমের কথা বলেন, তাহলে আমাদের সবার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই কোন একটি বিষয় স্থির করে নিন যা সবাই বলবে। কেউ কেউ প্রস্তাব করলো, আমরা মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গণক বলবো। ওয়ালীদ বললো : তা হয় না। আল্লাহর শপথ, সে গণক নয়। আমরা গণকদের অবস্থা জানি। তারা শুণ শুণ শব্দ করে যেসব কথা বলে এবং যে ধরনের কথা বানিয়ে নেয় তার সাথে কুরআনের সামান্যতম সাদৃশ্যও নেই। তখন কিছু সংখ্যক লোক প্রস্তাব করলো যে, তাকে পাগল বলা হোক। ওয়ালীদ বললো : সে পাগলও নয়। আমরা পাগল ও বিকৃত মষ্টিক লোক সম্পর্কেও জানি। পাগল বা বিকৃত মষ্টিক হলে মানুষ যে ধরনের অসংগঠিত ও আবোল তাবোল কথা বলে এবং খাপছাড়া আচরণ করে তা কারো অজানা নয়। কে একথা বিশ্বাস করবে যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে বাণী পেশ করছে তা পাগলের প্রলাপ অথবা জিনে ধরা মানুষের উকি? লোকজন বললোঃ তাহলে আমরা তাকে কবি বলি। ওয়ালীদ বললো : সে কবিও নয়। আমরা সব রকমের কবিতা সম্পর্কে অবহিত। কোন ধরনের কবিতার সাথে এ বাণীর সাদৃশ্য নেই। লোকজন আবার প্রস্তাব করলো : তাহলে তাকে যাদুকর বলা হোক। ওয়ালীদ বললো : সে যাদুকরও নয়। যাদুকরদের সম্পর্কেও আমরা জানি। যাদু প্রদর্শনের জন্য তারা যেসব পন্থা অবলম্বন করে থাকে সে সম্পর্কেও আমাদের জানা আছে। একথাটিও মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাপারে থাটে না। এরপর ওয়ালীদ বললো : প্রস্তাবিত এসব কথার যেটিই তোমরা বলবে সেটিকেই লোকেরা অযথা অভিযোগ মনে করবে। আল্লাহর শপথ, এ বাণীতে আছে অসম্ভব রকমের মাধুর্য। এর শিকড় মাটির গভীরে প্রোত্তিত আর এর শাখা-প্রশাখা অত্যন্ত ফলবান। একথা শুনে আবু জেহেল ওয়ালীদকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। সে বললো : যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদ সম্পর্কে কোন কথা বলছো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কওমের লোকজন তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। সে বললো

১০ তাহলে উভয়কে কিছুক্ষণ ভেবে দেখতে দাও। এরপর সে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে বললো : তার সম্পর্কে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য যে কথাটি বলা যেতে পারে তা হলো, তোমরা আরবের জনগণকে বলবে যে, এ লোকটি যাদুকর। সে এমন কথা বলে যা মানুষকে তার পিতা, মাতা, শ্রী, পুত্র এবং গোটা পরিবার থেকেই বিছির করে দেয়। ওয়ালীদের একথা সবাই গ্রহণ করলো। অতপর ইজের মওসুমে পরিকল্পনা অনুসারে কুরাইশদের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল হাজীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং বহিরাগত হজ্জযাত্রীদের তারা এ বলে সাবধান করতে থাকলো যে, এখানে একজন বড় যাদুকরের আবির্ত্ব ঘটেছে। তার যাদু পরিবারের পোকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়। তার ব্যাপারে সাবধান থাকবেন। কিন্তু এর ফল দীড়লো এই যে, কুরাইশ বংশীয় লোকেরা নিজেরাই রস্তাগ্রাহ সাক্ষাত্কার আলাইহি ওয়া সাক্ষামের নাম সমগ্র আরবে পরিচিত করে দিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৮-২৮৯। আবু জেহেলের পীড়ীপীড়িতেই যে ওয়ালীদ এ উক্তি করেছিল, সে কথা ইবনে জারীর তার তাফসীরে ইকরিমার রেওয়ায়াত সূত্রে উন্নত করেছেন)।

এ সূরার দ্বিতীয় অংশে এ ঘটনারই পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর বিষয়বস্তুর বিন্যাস হয়েছে এভাবে :

৮ থেকে ১০ আয়াত পর্যন্ত ন্যায় ও সত্যকে অঙ্গীকারকারীদের এ বলে সাবধান করা হয়েছে যে, আজ তারা যা করছে কিয়ামতের দিন তারা নিজেরাই তার খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

১১ থেকে ২৬ আয়াত পর্যন্ত ওয়ালীদ ইবনে মুহাম্মাদ নাম উল্লেখ না করে বলা হয়েছে: মহান আল্লাহ এ ব্যক্তিকে অচেল নিয়ামত দান করেছিলেন। কিন্তু এর বিনিময়ে সে ন্যায় ও সত্যের সাথে চরম দুশ্মনী করেছে। এ পর্যায়ে তার মানসিক দুন্দুর পূর্ণাঙ্গ চিত্র অংকন করা হয়েছে। একদিকে সে মনে মনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের সত্যতা বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু অপরদিকে নিজ গোত্রের মধ্যে সে তার নেতৃত্ব, মর্যাদা ও প্রতাব-প্রতিপন্থিও বিপর করতে প্রস্তুত ছিল না। তাই সে শুধু ইমান গ্রহণ থেকেই বিরত রইলো না। বরং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিজের বিবেকের সাথে বুঝা-পড়া ও দন্ত-সংযোগের পর আল্লাহর বাস্তাদের এ বাণীর ওপর ঈমান আনা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রস্তাব করলো যে, এ কুরআনকে যাদু বলে আখ্যায়িত করতে হবে। তার এ স্পষ্ট ঘূণ্য মানসিকতার মুখোশ খুলে দেয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, নিজের এতো সব অপকর্ম সত্ত্বেও এ ব্যক্তি চায় তাকে আরো পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হোক। অথচ এখন সে পুরস্কারের যোগ্য নয় বরং দোষথের শাস্তির যোগ্য হয়ে গিয়েছে।

এরপর ২৭ থেকে ৪৮ আয়াত পর্যন্ত দোষথের উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোনু ধরনের নৈতিক চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের অধিকারী লোকেরা এর উপযুক্ত বলে গণ্য হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

অতপর ৪৯-৫৩ আয়াতে কাফেরদের রোগের মূল ও উৎস কি তা বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যেহেতু তারা আখ্যায়িত সম্পর্কে বেগরোয়া ও নির্ভীক এবং এ পৃথিবীকেই

জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ বলে মনে করে, তাই তারা কুরআন থেকে এমনভাবে পালায়, যেমন বন্য গাঢ়া বাষ দেখে পালায়। তারা ঈমান আনার জন্য নানা প্রকারের অযৌক্তিক পূর্বশর্ত আরোপ করে। অথচ তাদের সব শর্ত পূরণ করা হলেও আখেরাতকে অস্থীকার করার কারণে তারা ঈমানের পথে এক পাও অগ্রসর হতে সক্ষম নয়।

পরিশেষে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর কারো ঈমানের প্রয়োজন নেই যে, তিনি তাদের শর্ত পূরণ করতে থাকবেন। কুরআন সবার জন্য এক উপদেশবাণী যা সবার সামনে পেশ করা হয়েছে। কারো ইচ্ছা হলে সে এ বাণী গ্রহণ করবে। আল্লাহই একমাত্র এমন সত্তা, যার নাফরমানী করতে মানুষের ডয় পাওয়া উচিত। তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা এমন যে, যে বাণিজি তাকওয়া ও আল্লাহভীতির পথ অনুসরণ করে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। পূর্বে সে যতই নাফরমানী করে থাকুক না কেন।

আয়াত ৫৬

সূরা আল মুদ্বাস্মির-মন্ত্রী

রক্ত' ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يَا يَاهَا الْمَدِيرِ قَرْفَانِ رِوْرِبَكَ فَكِيرِ وَثِيَابَكَ فَطَهِيرِ وَالرَّجَزِ  
فَاهْجَرُ وَلَا تَمْنَنْ تَسْتَكْشِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

হে বন্দু মুড়ি দিয়ে শয়নকারী,<sup>১</sup> ওঠো এবং সাবধান করে দাও,<sup>২</sup> তোমার রবের  
শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো,<sup>৩</sup> তোমার পোশাক পবিত্র রাখো,<sup>৪</sup> অপবিত্রতা থেকে দূরে  
থাকো,<sup>৫</sup> বেশী লাভ করার জন্য ইহসান করো না<sup>৬</sup> এবং তোমার রবের জন্য ধৈর্য  
অবলম্বন করো।<sup>৭</sup>

১. উপরে ভূমিকায় আমরা এসব আয়াত নাখিলের যে পটভূমি বর্ণনা করেছি সে  
সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একথাটি তাল্লুবেই উপলক্ষ্মি করা যায় যে এখানে  
রসূলগ্রাহ সাল্লাগ্রাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামুকে **يَا يَاهَا الْمَدِيرِ** বলে  
সর্বোধন করার পরিবর্তে **يَا يَاهَا الْمَدِيرِ** বলে সর্বোধন কেন করা হয়েছে। নবী (সা)  
যেহেতু হঠাৎ জিবরাইলকে আসমান ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি আসনে উপবিষ্ট দেখে  
তীত হয়ে পড়েছিলেন এবং সে অবস্থায় বাড়ীতে পৌছে বাড়ীর লোকদের বলেছিলেন :  
আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো, আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো। তাই আল্লাহ  
তীকে **يَا يَاهَا الْمَدِيرِ** বলে সর্বোধন করেছেন। সর্বোধনের এ সূক্ষ্ম ভঙ্গী থেকে আপনা  
আপনি এ অর্থ পরিসংকুচিত হয়ে ওঠে যে, হে আমার প্রিয় বান্দা, তুমি চাদর জড়িয়ে  
শয়ে আছো কেন? তোমার উপরে তো একটি মহত কাজের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা  
হয়েছে। এ দায়িত্ব পালন করার জন্য তোমাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উঠে দাঢ়াতে হবে।

২. হ্যরত নূহ আলাইহিস সালামকে নবুওয়াতের পদমর্যাদায় অভিষিঞ্চ করার সময়  
যে আদেশ দেয়া হয়েছিল এটাও সে ধরনের আদেশ। হ্যরত নূহ আলাইহিস সালামকে  
বলা হয়েছিল :

**أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ -**

“তোমার নিজের কওমের লোকদের ওপর এক ভীষণ কষ্টদায়ক আঘাত আসার পূর্বেই  
তাদের সাবধান করে দাও।” (নূহ, ১)

আয়াতটির অর্থ হলো, হে বন্দু আচ্ছাদিত হয়ে শয়নকারী, তুমি ওঠো। তোমার  
চারপাশে আল্লাহর যেসব বান্দারা অবচেতন পড়ে আছে তাদের জাগিয়ে তোল। যদি এ

অবস্থায়ই তারা থাকে তাহলে যে অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতির সম্মুখীন তারা হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে তাদের সাবধান করে দাও। তাদের জ্ঞানিয়ে দাও, তারা 'মগের মুল্লকে' বাস করছে না যে, যা ইচ্ছা তাই করে যাবে, অথচ কোন কাজের জন্য জ্ঞানাবদিহি করতে হবে না।

৩. এ পৃথিবীতে এটা একজন নবীর সর্বপ্রথম কাজ। এখানে এ কাজটিই তাঁকে আজ্ঞাম দিতে হয়। তাঁর প্রথম কাজই হলো, অস্ত ও মৃত্যু লোকেরা এ পৃথিবীতে যাদের প্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ মেনে চলছে তাদের সবাইকে অবীকার করবে এবং গোটা পৃথিবীর সামনে উচ্চ কঠে একথা ঘোষণা করবে যে, এ বিশ্ব-জাহানে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন প্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ নেই। আর এ কারণেই ইসলামে “আল্লাহ আকবার” (আল্লাহই প্রেষ্ঠ) কথাটিকে সবচেয়ে বেশী শুরুত্ব দেয়া হয়েছে। “আল্লাহ আকবার” ঘোষণার মাধ্যমেই আযান শুরু হয়। আল্লাহ আকবার কথাটি বলে মানুষ নামায শুরু করে এবং বার বার আল্লাহ আকবার বলে ওঠে ও বসে। কোন পশ্চকে জবাই করার সময়ও ‘বিসমিল্লাহে আল্লাহ আকবার’ বলে জবাই করে। তাকবীর খনি বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সর্বাধিক স্পষ্ট ও পার্থক্যসূচক প্রতীক। কারণ, ইসলামের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বড়ত্ব ও প্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার মাধ্যমেই কাজ শুরু করেছিলেন।

এখানে আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে যা ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। এ সময়ই প্রথমবারের মত রসূলপ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নবুওয়াতের বিরাট শুরুদায়িত্ব পালনের জন্য তৎপর হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এ আয়াতগুলোর ‘শানে ন্যূন’ খেকেই সে বিষয়টি জানা গিয়েছে। একথা তো স্পষ্ট যে, যে শহর ও সমাজপরিবেশে তাঁকে এ উদ্দেশ্য ও সক্ষ নিয়ে কাজ করার জন্য তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছিল তা ছিল শিরকের কেন্দ্রস্থূলি বা জীলাক্ষেত্র। সাধারণ আরবদের মত সেখানকার অধিবাসীরা যে কেবল মুশরিক ছিল, তা নয়। বরং মক্কা সে সময় গোটা আরবের মুশরিকদের সবচেয়ে বড় তীর্থক্ষেত্রের মর্যাদা লাভ করেছিল। আর কুরাইশরা ছিল তার ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী, সেবায়ত ও পুরোহিত। এমন একটি জায়গায় কোন ব্যক্তির পক্ষে শিরকের বিরুদ্ধে এককভাবে তাওইদীর পতাকা উত্তোলন করা জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করার শামিল। তাই “ওঠো এবং সাবধান করে দাও” বলার পরপরই “তোমার রবের প্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো” বলার অর্থই হলো, যেসব বড় বড় সন্ত্রাসী শক্তি তোমার এ কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে হয় তাদের মোটেই পরোয়া করো না। বরং স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও, যারা আমার এ আহবান ও আদোলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে আমার ‘রব’ তাদের সবার চেয়ে অনেক বড়। আল্লাহর দীনের কাজ করতে উদ্যত কোন ব্যক্তির হিস্তত বৃদ্ধি ও সাহস যোগানের জন্য এর চাইতে বড় পদ্ধা বা উপায় আর কি হতে পারে? আল্লাহর বড়ত্ব ও প্রেষ্ঠত্রের নকশা যে ব্যক্তির হৃদয়-মনে খোদিত সে আল্লাহর জন্য একাই গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে শড়াই করতে সামান্যতম দ্বিধা-বন্দুও অনুভব করবে না।

৪. এটি একটি ব্যাপক অর্থ ব্যঙ্গক কথা। এর অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত।

এর একটি অর্থ হলো, তুমি তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ নাগাক বস্তু থেকে পবিত্র রাখো। কারণ শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা এবং 'রহ' বা আত্মার পবিত্রতা ও তপ্রোতভাবে জড়িত। কোন পবিত্র আত্মা ময়লা-নোঝা ও পৃতিগন্ধময় দেহ এবং অপবিত্র পোশাকের মধ্যে মোটেই অবস্থান করতে পারে না। রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমাজে ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন তা শুধু আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক আবিলতার মধ্যেই নিমজ্জিত ছিল না বরং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে পর্যন্ত সে সমাজের লোক অঙ্গ ছিল। এসব লোককে সব রাকমের পবিত্রতা শিক্ষা দেয়া ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ। তাই তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যেন তাঁর বাহ্যিক জীবনেও পবিত্রতার সর্বোক মান বজায় রাখেন। এ নির্দেশের ফল ব্রহ্ম নবী (সা) মানব জাতিকে শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা সম্পর্কে এমন বিজ্ঞারিত শিক্ষা দিয়েছেন যে, জাহেলী যুগের আরবরা তো দূরের কথা আধুনিক যুগের চরম সভ্য জাতিসমূহে সে সৌভাগ্যের অধিকারী নয়। এমনকি দুনিয়ার অধিকাংশ ভাষাতে এমন কোন শব্দ পর্যন্ত পাওয়া যায় না যা 'তাহারাত' বা পবিত্রতার সমার্থক হতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামের অবস্থা হলো, হাদীস এবং ফিকাহর গ্রন্থসমূহে ইসলামী হহুম-আহকাম তথা বিধি-বিধান সম্পর্কে সব আলোচনা শুরু হয়েছে 'কিতাবুত তাহারাত' বা পবিত্রতা নামে অধ্যায় দিয়ে। এতে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার পার্থক্য এবং পবিত্রতা অর্জনের উপায় ও পন্থসমূহ একত্র খুটিলাটি বিষয়সহ সরিষ্ঠারে আলোচনা করা হয়েছে।

একথাটির দ্বিতীয় অর্থ হলো, নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিকার-পরিচ্ছন্ন রাখো। বৈরাগ্যবাদী ধ্যান-ধারণা পৃথিবীতে ধর্মাচরণের যে মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছিল তাহলো, যে মানুষ যতো বেশী নোঝা ও অপরিচ্ছন্ন হবে সে ততো বেশী পৃত-পবিত্র। কেউ কিছুটা পরিকার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরলেই মনে করা হতো, সে একজন দুনিয়াদার মানুষ। অথচ মানুষের প্রবৃত্তি নোঝা ও ময়লা জিনিসকে অপছন্দ করে। তাই ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে আহবানকারীর বাহ্যিক অবস্থাও এটা পবিত্র ও পরিকার-পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন যেন মানুষ তাকে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেবে এবং তার ব্যক্তিত্বে এমন কোন দোষ-ক্রটি যেন না থাকে যার কারণে রুটি ও প্রবৃত্তিতে তার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

একথাটির তৃতীয় অর্থ হলো, নিজের পোশাক পরিচ্ছদ নৈতিক দোষ-ক্রটি থেকে পবিত্র রাখো। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পরিকার-পরিচ্ছন্ন তো অবশ্যই থাকবে তবে তাতেও কোন প্রকার গর্ব-অহংকার, প্রদর্শনী বা লোক দেখানোর মনোবৃত্তি, ঠাট্টাবাট এবং জৌলুসের নামগন্ধ পর্যন্ত থাকা উচিত নয়। পোশাক এমন একটি প্রাথমিক জিনিস যা অন্যদের কাছে একজন মানুষের পরিচয় তুলে ধরে। কোন ব্যক্তি যে ধরনের পোশাক পরিধান করে তা দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই মানুষ বুঝতে পারে যে, সে কেমন স্বতাব চরিত্রের লোক। নওয়াব, বাদশাহ ও নেতৃ পর্যায়ের লোকদের পোশাক, ধর্মীয় পেশার লোকদের পোশাক, দাঙ্গিক ও আত্মগন্ধী লোকদের পোশাক, বাজে ও নীচ স্বতাব লোকদের পোশাক এবং গুগু-পাণ্ডা ও বখাটে লোকদের পোশাকের ধরন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে থাকে। এসব পোশাকই পোশাক পরিধানকারীর মেজাজ ও মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করে।

আগ্নাহর দিকে আহবানকারীর মেজাজ ও মানসিকতা স্বাভাবিকভাবেই এসব লোকদের থেকে আলাদা হয়ে থাকে। তাই তার পোশাক-পরিচ্ছদ তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে ব্যতুক ধরনের হওয়া উচিত। তাঁর উচিত এমন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা যা দেখে প্রত্যেকেই অনুভব করবে যে, তিনি একজন শরীফ ও তদ্ব মানুষ, যাঁর মন-মানস কোন প্রকার দোষে দৃষ্ট নয়।

এর চতুর্থ অর্থ হলো। নিজেকে পবিত্র রাখো। অন্য কথায় এর অর্থ হলো নৈতিক দোষ-ক্রটি থেকে পবিত্র থাকা এবং উত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া। ইবনে আব্রাস, ইবরাহীম নাথয়ী, শা'বী, 'আতা, মুজাহিদ, কাতাদা, সা'ঈদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বাসরী এবং আরো অনেক বড় বড় মুফাসিসের মতে এটিই এ আয়াতের অর্থ। অর্থাৎ নিজের নৈতিক চরিত্রকে পবিত্র রাখো এবং সব রকমের দোষ-ক্রটি থেকে দূরে থাকো। **فَلَمَّا تَاهَرَ النَّبِيُّ وَفَلَانْ طَاهِرُ الدَّبْلِ** অমুক ব্যক্তির কাপড় বা পোশাক পবিত্র অথবা অমুক ব্যক্তি পবিত্র।” তাহলে এর দ্বারা বুঝানো হয় যে, সে ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র খুবই ভাল। পক্ষান্তরে যদি বলা হয় যে, **فَلَانْ بَنْسُ الْثَّيَابِ** অমুক ব্যক্তির পোশাক নোংরা তাহলে এ দ্বারা বুঝানো হয় যে, লোকটি লেনদেন ও আচার-আচরণের দিক দিয়ে ভাল নয়। তার কথা ও প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রাখা যায় না।

৫. অপবিত্রতার অর্থ সব ধরনের অপবিত্রতা। তা আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার অপবিত্রতা হতে পারে, নৈতিক চরিত্র ও কাজ-কর্মের অপবিত্রতা হতে পারে আবার শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ এবং উঠা বসা চলাফেরার অপবিত্রতাও হতে পারে। অর্থাৎ তোমার চারদিকে গোটা সমাজে হরেক রকমের যে অপবিত্রতা ও নোংরামি ছড়িয়ে আছে তার সবগুলো থেকে নিজেকে মুক্ত রাখো। কেউ যেন তোমাকে একথা বলার সামান্য সুযোগও না পায় যে, তুমি মানুষকে যেসব মন্দ কাজ থেকে নির্মুক্ত করছো তোমার নিজের জীবনেই সে মন্দের প্রতিফলন আছে।

৬. মূল বাক্যাংশ হলো **وَلَا تَمْنَنْ تَسْتَكْبِرْ** একথাটির অর্থ এতো ব্যাপক যে, একটি মাত্র কথায় অনুবাদ করে এর বক্তব্য তুলে ধরা সম্ভব নয়।

এর একটি অর্থ হলো, তুমি যার প্রতিই ইহসান বা অনুগ্রহ করবে, নিষ্পার্থভাবে করবে। তোমার অনুগ্রহ ও বদান্যতা এবং দানশীলতা ও উত্তম আচরণ হবে একমাত্র আগ্নাহর উদ্দেশ্যে। ইহসান বা মহানুভবতার বিনিময়ে কোন প্রকার পার্থিব স্বার্থ লাভের বিলুপ্ত আকাঙ্খাও তোমার থাকবে না। অন্য কথায় একমাত্র আগ্নাহর উদ্দেশ্যে ইহসান করো, কোন প্রকার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ইহসান করো না।

যিতীয় অর্থ হলো, নবুওয়াতের যে দায়িত্ব তুমি পালন করছো। যদিও তা একটি বড় রকমের ইহসান, কারণ তোমার মাধ্যমেই আগ্নাহর গোটা সৃষ্টি হিদায়াত লাভ করছে। তবুও এ কাজ করে তুমি মানুষের বিরাট উপকার করছো এমন কথা বলবে না এবং এর বিনিময়ে কোন প্রকার ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করবে না।

তৃতীয় অর্থ হলো, তুমি যদিও অনেক বড় ও মহান একটি কাজ করে চলেছো কিন্তু নিজের দৃষ্টিতে নিজের কাজকে বড় কাজ বলে কথনো মনে করবে না এবং কোন সময় এ

فَإِذَا نَقَرَ فِي النَّاقُورِ فَنِ لِكَ يَوْمَئِنْ يُوْمَعِسِيرِ عَلَى الْكُفَّارِينَ غَيْرَ يُسِيرِ<sup>⑤</sup>  
 ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتَ لَهُ مَا لَامِدُ وَدَأْ وَبَنِينَ  
 شَمُودًا وَمَهْلَتَ لَهُ تَمْهِيلًا ثُمَّ يَطْعَمُ أَنَّ ازِيدَ<sup>⑥</sup> كَلَّا إِنَّهُ كَانَ  
 لَا يَتَنَا عَنِينَ<sup>⑦</sup> سَارِهِقَهْ صَعُودًا<sup>⑧</sup> إِنَّهُ فَكَرْ وَقَلَرَ<sup>⑨</sup> فَقْتَلَ كَيْفَ قَلَرَ<sup>⑩</sup> ثُمَّ  
 قُتِلَ كَيْفَ قَلَرَ<sup>⑪</sup> ثُمَّ نَظَرَ<sup>⑫</sup> ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ<sup>⑬</sup> ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكَبَرَ<sup>⑭</sup> فَقَالَ  
 إِنَّ هَنَّ الْأَسْحَرِيُّوْثَرَ<sup>⑯</sup>

তবে যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিনটি অভ্যন্ত কঠিন দিন হবে।<sup>১</sup> কাফেরদের জন্য মোটেই সহজ হবে না।<sup>২</sup> আমাকে এবং সে ব্যক্তিকে<sup>৩</sup> ছেড়ে দাও যাকে আমি একা সৃষ্টি করেছি।<sup>৪</sup> তাকে অচেল সম্পদ দিয়েছি এবং আরো দিয়েছি সবসময় কাছে থাকার যত অনেক পুত্র সন্তান।<sup>৫</sup> তার নেতৃত্বের পথ সহজ করে দিয়েছি। এরপরও সে জালায়িত, আমি যেন তাকে আরো বেশী দান করি।<sup>৬</sup> তা কখনো নয়, সে আমার আয়াতসমূহের সাথে শক্রতা পোধণ করে। অচিরেই আমি তাকে এক কঠিন হানে চড়িয়ে দেব। সে চিন্তা-ভাবলা করলো এবং একটা ফন্সি উত্তোলনের চেষ্টা করলো। অভিশঙ্গ হোক সে, সে কি ধরনের ফন্সি উত্তোলনের চেষ্টা করলো? আবার অভিশঙ্গ হোক সে, সে কি ধরনের ফন্সি উত্তোলনের চেষ্টা করলো? অতপর সে মানুষের দিকে চেয়ে দেখলো। তারপর ভ্রকুঝিত করলো এবং চেহারা বিকৃত করলো। অতপর পেছন ফিরলো এবং দৃষ্ট প্রকাশ করলো। অবশেষে বললো : এ তো এক চিরাচারিত যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

চিন্তাও যেন তোমার মনে উদিত না হয় যে, নবুওয়াতের এ দায়িত্ব পালন করে আর এ কাজে প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করে ভূমি তোমার রবের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছো।

৭. অর্থাৎ যে কাজ আজ্ঞাম দেয়ার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হচ্ছে তা অভ্যন্ত কষ্টসাধ্য ও জীবনের ঝুকিপূর্ণ কাজ। এ কাজ করতে গিয়ে তোমাকে কঠিন বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হতে হবে। তোমার নিজের কওম তোমার শক্র হয়ে দাঢ়াবে। সমগ্র আরুব তোমার বিরক্তে কোমর বেঁধে লাগবে। তবে এ পথে চলতে গিয়ে যে কোন বিপদ-মুসিবতই আসুক না কেন তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে সেসব বিপদের মুখে ধৈর্য অবলম্বন করো এবং অভ্যন্ত আটল ও দৃঢ়চিন্ত হয়ে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে থাকো। এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য ভয়-ভীতি, লোভ-জালসা, বন্ধুত, শক্রতা এবং

১০॥  
তালবাসা সব কিছুই তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এসবের মোকাবেলা করতে গিয়ে  
নিজের অবস্থানে স্থির ও অটল থাকবে।

এগুলো ছিল একেবারে প্রাথমিক দিকনির্দেশনা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে যে  
সময় নবুওয়াতের কাজ শুরু করতে আদেশ দিয়েছিলেন সে সময় এ দিকনির্দেশনাগুলো  
তাঁকে দিয়েছিলেন। কেউ যদি এসব ছোট ছোট বাক্য এবং তার অর্থ সম্পর্কে গভীরভাবে  
চিন্তা করে তাহলে স্বত্ত্বাত্ত্বাবে তার মন বলে উঠবে যে, একজন নবীর নবুওয়াতের  
কাজ শুরু করার প্রাকালে তাঁকে এর চাইতে উত্তম আর কোন দিকনির্দেশনা দেয়া যেতে  
পারে না। এ নির্দেশনায় তাঁকে কি কাজ করতে হবে একদিকে যেমন তা বলে দেয়া  
হয়েছে তেমনি এ কাজ করতে গেলে তাঁর জীবন, নৈতিক চরিত্র এবং আচার-আচরণ  
কেমন হবে তাও তাঁকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এর সাথে সাথে তাঁকে এ শিক্ষাও দেয়া  
হয়েছে যে, তাঁকে কি নিয়ত, কি ধরনের মানসিকতা এবং কিরণ চিন্তাধারা নিয়ে এ কাজ  
আঙ্গাম দিতে হবে। আর এতে এ বিষয়েও তাঁকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, এ কাজ  
করার ক্ষেত্রে কিরণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে এবং তার মোকাবিলা কিভাবে  
করতে হবে। বর্তমানেও যারা বিদেশের কারণে খার্মের মোহে অন্ধ হয়ে বলে যে,  
(নেউরুবিগ্রাহ) মৃগী রোগে আক্রান্ত হওয়ার মুহূর্তে রস্তুগ্রাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লামের মুখ থেকে এসব কথা উচ্চারিত হতো, তারা একটু চোখ খুলে এ বাক্যগুলো  
দেখুক এবং নিজেরাই চিন্তা করুক যে, এগুলো কোন মৃগী রোগে আক্রান্ত মানুষের মুখ  
থেকে উচ্চারিত কথা না কি মহান আল্লাহর বাণী যা রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য  
পালনের জন্য তিনি তাঁর বান্দাকে দিচ্ছেন?

৮. আমরা ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি যে, এ সূরার এ অংশটা প্রথম দিকে নাযিলকৃত  
আয়াতসমূহের কয়েক মাস পরে এমন সময় নাযিল হয়েছিল যখন রস্তুগ্রাহ সাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ইসলামের তাবলীগ ও প্রচারের কাজ শুরু  
হওয়ার পর প্রথম বারের মত হজ্জের মওসুম সমাগত হলো এবং কুরাইশ নেতৃত্বে  
একটি সম্মেলন ডেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, বিহিনগত হাজীদের মনে কুরআন ও  
মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টির জন্য অপপ্রচার ও  
কৃৎসা রটনার এক সর্বাত্মক অভিযান চালাতে হবে। এ আয়াতগুলোতে কাফেরদের এ  
কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা করা হয়েছে। আর একথাটি দ্বারাই পর্যালোচনা শুরু করা হয়েছে।  
এর অর্থ হলো, ঠিক আছে, যে ধরনের আচরণ তোমরা করতে চাচ্ছ তা করে নাও।  
এভাবে পৃথিবীতে তোমরা কোন উদ্দেশ্য সাধনে সফল হলেও যেদিন শিংগায় ফুর্কার  
দেয়া হবে এবং কিয়ামত কায়েম হবে সেদিন তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের মল পরিণাম  
থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? (শিংগা সম্পর্কে ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন,  
সূরা আল আন'আম, টীকা ৪৭; ইবরাহীম, টীকা ৫৭; হাত্তা, টীকা ৭৮; আল হাজ্জ,  
টীকা ১, ইয়াসীন, টীকা ৪৬ ও ৪৭, আয় মুমার, টীকা ৭৯ এবং ক্ষাফ, টীক ৫২)

৯. এ বাক্যটি থেকে স্বতঃই প্রতিভাত হয় যে, সেদিনটি ইমানদারদের জন্য হবে খুবই  
সহজ এবং এর সবচেয়ে কঠোরতা সত্যকে অমান্যকারীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। এ ছাড়া  
বাক্যটি থেকে এ অর্থও প্রতিফলিত হয় যে, সেদিনটির কঠোরতা কাফেরদের জন্য স্থায়ী

إِنْ هُنَّ إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ<sup>١٤</sup> سَاصِلِيهِ سَقَرُ<sup>١٥</sup> وَمَا أَدْرِكَ مَا سَقَرُ<sup>١٦</sup> لَا تَبْقِي  
 وَلَا تَنْرِ<sup>١٧</sup> لَوْحَةً لِّلْبَشَرِ<sup>١٨</sup> عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ<sup>١٩</sup> وَمَاجَلَنَا أَصْحَابُ النَّارِ  
 إِلَامِلِكَةً<sup>٢٠</sup> وَمَاجَلَنَا عِنْ تَهْرِ<sup>٢١</sup> إِلَافِتَنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا<sup>٢٢</sup> لِيُسْتَقِنُّ الَّذِينَ  
 أَوْتُوا الْكِتَبَ<sup>٢٣</sup> وَيَرَزَّادُ الَّذِينَ أَمْنَوْا إِيمَانًا<sup>٢٤</sup> وَلَا يَرَأُونَ<sup>٢٥</sup> تَابَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ  
 وَالْمُؤْمِنُونَ<sup>٢٦</sup> وَلَيَقُولَّ<sup>٢٧</sup> الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ<sup>٢٨</sup> وَالْكَفَرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ  
 بِهِنَّ<sup>٢٩</sup> أَمْثَلًا<sup>٣٠</sup> كُنْ لِّكَ يُصْلِ<sup>٣١</sup> اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ<sup>٣٢</sup> وَيَهْمِلُ<sup>٣٣</sup> مِنْ يَشَاءُ<sup>٣٤</sup> وَمَا يَعْلَمُ  
 جِنُودُ رِبِّكَ<sup>٣٥</sup> إِلَاهُ<sup>٣٦</sup> وَمَاهِيَ<sup>٣٧</sup> إِلَاذْكُرِي<sup>٣٨</sup> لِلْبَشَرِ<sup>٣٩</sup>

এ তো মানুষের কথা মাত্র।<sup>১৪</sup> শিগগিরই আমি তাকে দোষখে নিষ্কেপ করবো।  
 তুমি কি জানো, সে দোষখ কি? যা জীবিতও রাখবে না আবার একেবারে মৃত  
 করেও ছাড়বে না।<sup>১৫</sup> গায়ের চামড়া ঝলসিয়ে দেবে।<sup>১৬</sup> সেখানে নিয়োজিত আছে  
 উনিশ জন কর্মচারী। আমি<sup>১৭</sup> ফেরেশতাদের দোষখের কর্মচারী বানিয়েছি।<sup>১৮</sup> এবং  
 তাদের সংখ্যাকে কাফেরদের জন্য ফিতনা বানিয়ে দিয়েছি।<sup>১৯</sup> যাতে আহলে  
 কিতাবদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।<sup>২০</sup> ঈমানদারদের ঈমান বৃক্ষি পায়,<sup>২১</sup> আহলে কিতাব  
 ও ঈমানদাররা সন্দেহ পোষণ না করে।<sup>২২</sup> আর যাদের মনে রোগ আছে তারা এবং  
 কাফেররা যেন বলে, এ অভিনব কথা দ্বারা আল্লাহ কি বুঝাতে চেয়েছে?<sup>২৩</sup>  
 এভাবে আল্লাহ যাকে চান পথচার করেন এবং যাকে চান হিদায়াত দান করেন।<sup>২৪</sup>  
 তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ অবহিত নয়।<sup>২৫</sup> আর  
 দোষখের এ বর্ণনা এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যেই নয় যে, মানুষ তা থেকে উপদেশ  
 গ্রহণ করবে।<sup>২৬</sup>

হয়ে যাবে। তা এমন ধরনের কঠোরতা হবে না যা পরে কোন সময়ে হালকা বা লম্বু হয়ে  
 যাওয়ার আশা করা যাবে।

১০. এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংশোধন করে বলা হচ্ছে : হে  
 নবী, কাফেরদের সে সম্মেলনে যে ব্যক্তি (ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা) তোমাকে বদলাম  
 করার উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিয়েছিল যে, সমগ্র আরব থেকে আগত হাজীদের কাছে তোমাকে  
 যাদুকর বলে প্রচার করতে হবে তার ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। এখন

১০ "আমার কাজ হলো, তার সাথে বুঝাপড়া করা। তোমার নিজের এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার কোন প্রয়োজন নেই।

১১. একধাটির দু'টি অর্থ হতে পারে এবং দু'টি অর্থই সঠিক। এক, আমি যখন তাকে সৃষ্টি করেছিলাম সে সময় সে কোন প্রকার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং মর্যাদা ও নেতৃত্বের অধিকারী ছিল না। দুই, একমাত্র আমিই তার সৃষ্টিকর্তা। অন্য যেসব উপাস্যের খোদায়ী ও প্রভৃতি কায়েম রাখার জন্য সে তোমার দেয়া তাওহীদের দাওয়াতের বিরোধিতায় এত তৎপর, তাদের কেউই তাকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে আমার সাথে শরীক ছিল না।

১২. ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার দশ বারটি পুত্র সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে হ্যরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ ইতিহাসে অনেক বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এসব পুত্র সন্তানদের জন্য পুর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, ক্লাফু রোজগারের জন্য তাদের দৌড় বাপ করতে বা সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে কিংবা বিদেশ যাত্রা করতে হয় না। তাদের বাড়ীতে এত খাদ্য মজুদ আছে যে, তারা সর্বক্ষণ বাপের কাছে উপস্থিত থাকে এবং তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকে। দুই, তার সবগুলো সন্তানই নামকরা এবং প্রতাবশালী, তারা বাপের সাথে দরবার ও সভা-সমিতিতে উপস্থিত থাকে। তিনি, তারা সবাই এমন সামাজিক পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ বা মতামত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

১৩. একথার একটি অর্থ হলো, এসব সন্ত্বেও তার লালসা ও আকাংখার শেষ নেই। এত কিছু লাভ করার পরও সে সর্বক্ষণ এ চিন্তায় বিভোর যে, দুনিয়ার সব নিয়ামত ও তোগের উপকরণ সে কিভাবে লাভ করতে পারবে। দুই, হ্যরত হাসান বাসরী ও আরো কয়েকজন মনীষী বর্ণনা করেছেন যে, সে বলতোঃ : মুহাম্মাদের (সা) একথা যদি সত্য হয়ে থাকে যে, মৃত্যুর পর আরো একটি জীবন আছে এবং সেখানে জারাত বলেও কিছু একটা থাকবে তাহলে সে জারাত আমার জন্যই তৈরী করা হয়েছে।

১৪. মকায় কাফেরদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে সে সম্মেলনে সংঘটিত ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। সূরার ভূমিকায় ঘটনাটির যে বিস্তারিত বিবরণ আমরা উল্লেখ করেছি তা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, এ ব্যক্তি মনে প্রাণে যে বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, কুরআন আগ্রাহ বাণী। কিছু নিজের গোত্রের মধ্যে তার মর্যাদা, প্রভাব প্রতিপন্থি ও নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্যে দ্বিমান আনন্দে প্রস্তুত ছিল না। কাফেরদের সে সম্মেলনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কুরাইশ নেতাদের প্রস্তাবিত অভিযোগসমূহ সে নিজেই যখন খণ্ডন করলো তখন আরবের লোকদের মধ্যে রাটিয়ে দিয়ে নবীকে (সা) বদনাম করা যায় এমন কোন অভিযোগ তৈরি করে পেশ করতে যোদ তাকেই বাধ্য করা হলো। এ সময় সে যেভাবে তার বিবেকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং বেশ কিছু সময় কঠিন মানসিক দ্বন্দ্বে নিষ্প থাকার পর পরিশেষে সে যেভাবে একটি অভিযোগ তৈরি করলো, তার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র এখানে পেশ করা হয়েছে।

১৫. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হলো, যাকেই এর মধ্যে নিষ্কেপ করা হবে তাকেই সে জ্ঞালিয়ে ছাই করে দেবে। কিন্তু জ্ঞলে পুড়ে ছারখার হয়েও সে রক্ষা পাবে না। বরং আবার তাকে জীবিত কুরা হবে এবং আবার জ্ঞালানো হবে। আরেক জায়গায় কথাটা এভাবে বলা হয়েছে : **لَا يَمْوَتُ فِيهَا وَلَا يُحْيَى** 'সেখানে সে মরে নিঃশেষ হয়েও যাবে না আবার বেঁচেও থাকবে না' (আল আ'লা, ১৩)। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে এই যে, আয়াবের উপর্যুক্ত কেউ-ই তার কবল থেকে রক্ষা পাবে না। আর যে তার কবলে পড়বে তাকেই আয়াব থেকে রেহাই দেবে না।

১৬. 'তা দেহের কোন অংশই না জ্ঞালিয়ে ছাড়বে না' একথা বলে আবার "চামড়া ঝলসিয়ে দেবে" কথাটি আলাদা করে উল্লেখ করাটা বাহ্যত অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। কিন্তু এ বিশেষ ধরনের আয়াবের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, মৃত্যু মুখমণ্ডল ও দেহের চামড়াই মানুষের ব্যক্তিত্বকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরে বা প্রকাশ করে। তাই চেহারা ও গাত্রচর্মের কৃৎসিত দর্শন ও কৃত্তী হওয়া তার জন্য সর্বাধিক মানসিক যন্ত্রণার কারণ হবে। শরীরের আত্যন্তরীণ অংগ-প্রত্যঙ্গে তার যত কষ্ট ও যন্ত্রণাই হোক না কেন সে তাতে ততটা মানসিক যাতনাক্রিট হয় না। যতটা হয় তার চেহারা কৃৎসিং হলে কিংবা শরীরের খোলা মেলা অংশের চামড়া বা তুকের ওপর বিশ্রী দাগ পড়লে। কারণ কোন মানুষের চেহারা ও গাত্র চর্মে বিশ্রী দাগ থাকলে সবাই তাকে ঘৃণা করে। তাই বলা হয়েছে : এ সুদর্শন চেহারা এবং অত্যন্ত নিটোল ও কাতিময় দেহধারী যেসব মানুষ নিজেদের ব্যক্তিত্ব গৌরবে আত্মহারা তারা যদি আল্লাহর আয়াতের সাথে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার মত শক্রতার আচরণ করতেই থাকে তাহলে তাদের মুখমণ্ডল ঝলসিয়ে বিকৃত করে দেয়া হবে আর তাদের গাত্রচর্ম পুড়িয়ে কয়লার মত কাল করে দেয়া হবে।

১৭. এখান থেকে "তোমরা রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া আর কেউ অবহিত নয়" পর্যন্ত বাক্যগুলোতে একটি ভিন্ন প্রসংগ আলোচিত হয়েছে। "দোষখের কর্মচারীর সংখ্যা শুধু উনিশ জন হবে" একথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ্যে শুনে যারা সমালোচনামূল্যের হয়ে উঠেছিল এবং কথাটা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে শুরু করেছিল প্রাসংগিক বক্তব্যের মাঝখানে বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় ছেদ টেনে তাদের কথার জবাব দেয়া হয়েছে। তাদের কাছে একথাটি বিশ্বাসের মনে হয়েছে যে, এক দিকে আমাদের বলা হচ্ছে, আদম আলাইহিস সাল্লামের সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ কুফরী করেছে এবং কৰীরা গোনাহে লিঙ্গ হয়েছে তাদের সবাইকে দোষখে নিষ্কেপ করা হবে। অপর দিকে আমাদের জানানো হচ্ছে যে, এত বড় বিশাল দোষখে অসংখ্য মানুষকে আয়াব দেয়ার জন্য মাত্র উনিশ জন কর্মচারী নিয়োজিত থাকবে। একথা শুনে কুরাইশ নেতারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। আবু জেহেল বললো : আরে তাই, তোমরা কি এতই অকর্মা ও অথর্ব হয়ে পড়েছো যে, তোমাদের মধ্য থেকে দশ দশ জনে মিলেও দোষখের এক একজন সিপাইকে কাবু করতে পারবে না? বনী জুমাহ গোত্রের এক পালোয়ান সাহেব তো বলতে শুরু করলোঃ সতের জনকে আমি একাই দেখে নেব। আর তোমরা সবাই মিলে অবশিষ্ট দুই জনকে কাবু করবে। এসব কথার জবাব হিসেবে সাময়িকভাবে প্রসংগ পাস্টে একথাগুলো বলা হয়েছে।

১৮. অর্থাৎ মানুষের দৈহিক শক্তির সাথে তুলনা করে তাদের শক্তি সম্পর্কে অনুমান করা তোমাদের বোকায়ী ও নির্বৃক্ষিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা মানুষ নয়, বরং ফেরেশতা। তোমাদের পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নয় যে, কি সাংঘাতিক শক্তিধর ফেরেশতা আগ্নাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।

১৯. অর্থাৎ দোষথের কর্মচারীদের সংখ্যা বর্ণনা করার বাহ্যত কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু তাদের সংখ্যা আমি এ জন্য উল্লেখ করলাম যাতে তা সেসব লোকের জন্য ফিতনা হয়ে যায় যারা নিজেদের মনের মধ্যে এখনও কৃফরী লুকিয়ে রেখেছে। এ ধরনের লোক বাহ্যিকভাবে ইমানের প্রদর্শনী যতই করলে না কেন তার অন্তরের কোন গভীরতম প্রদেশেও যদি সে আগ্নাহের উল্লিখিত ও তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা কিংবা অঙ্গীকৃত সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ বা দ্বিধা-বন্দুও পোষণ করে থাকে তাহলে আগ্নাহের এত বড় জেলখানায় অসংখ্য অপরাধী মানুষ ও জিনকে শুধু উনিশ জন সিপাই সামলে রাখবে এবং আলাদাভাবে প্রত্যেককে শাস্তি দেবে একথা শোনামাত্র তার লুকিয়ে রাখা কৃফরী স্পষ্ট বেরিয়ে পড়বে।

২০. কোন কোন মুফসুসির এর এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আহলে কিতাবের (ইয়াহুদ ও বৃষ্টান) ধর্মগ্রন্থে যেহেতু দোষথের ফেরেশতাদের এ সংখ্যাটিই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই একথা শোনামাত্র তাদের দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হবে যে, প্রকৃতপক্ষে এটা আগ্নাহের কথাই হবে। কিন্তু আমাদের মতে দু'টি কারণে এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। প্রথম কারণটি হলো, ইয়াহুদ ও বৃষ্টানদের যে ধর্মগ্রন্থ বর্তমানে দুনিয়ায় পাওয়া যায় তাতে অনেক শৌজাখুজির পরও দোষথের কর্মচারী ফেরেশতার সংখ্যা উনিশ জন একথা কোথাও পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় কারণটি হলো, কুরআনের বহসংখ্যক বক্তব্য আহলে কিতাবের ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত বক্তব্যের অনুরূপ। কিন্তু ইয়াহুদ ও বৃষ্টানরা এসব বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে বলে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব কথা তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন। এসব কারণে আমাদের মতে একথাটির সঠিক অর্থ হলো : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাল করেই জানতেন যে, তাঁর মুখে দোষথের কর্মচারী ফেরেশতার সংখ্যা উনিশ, একথা উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর প্রতি হাসি-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের অসংখ্য বাণ নিষ্কিণ্ড হবে। তা সত্ত্বেও আগ্নাহের প্রেরিত অবৈত্তে যে কথা বলা হয়েছে, তা তিনি কোন প্রকার তয়-ভীতি বা দ্বিধা-বন্দু ছাড়াই প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে সবার সামনে পেশ করলেন এবং কোন প্রকার ঠাট্টা-বিদ্রুপের আদৌ পরোয়া করলেন না। জাহেল আরবরা নবীদের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে অবহিত ছিল না ঠিকই, কিন্তু আহলে কিতাব গোষ্ঠী তাল করেই জানতো যে, প্রত্যেক যুগে নবীদের নীতি ও পদ্ধতি এটাই যে, আগ্নাহের পক্ষ থেকে তাঁদের কাছে যা কিছু আসতো মানুষ পছন্দ করলে বা না করলে তারা তা হবহ মানুষের কাছে পৌছিয়ে দিতেন। তাই আশা করা গিয়েছিল যে, এ চরম প্রতিকূল পরিবেশে রসূলকে (সা) বাহ্যত অত্যুত একথাটি কোন প্রকার দ্বিধা-সংকোচ না করে সংসারি পেশ করতে দেখে অন্ত আহলে কিতাব গোষ্ঠীর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবে যে, এটি একজন নবীর কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় আহলে কিতাব গোষ্ঠীর কাছ থেকে এ আচরণ লাভের প্রত্যাশা ছিল বেশী।

উল্লেখ্য যে, রসূলগ্রাহ সান্নাগ্রাহ আলাইছি ওয়া সান্নামের জীবনে এ কর্মনীতি বেশ কয়েকবার প্রতিফলিত হয়েছে। এর মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য হলো মি'রাজের ঘটনা। তিনি কাফেরদের সমাবেশে নিসৎকোচে ও দ্বিহাইন চিন্তে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। এ বিশ্যয়কর ঘটনা শুনে তাঁর বিরোধীরা কত রকমের কাহিনী ফাঁদবে তার এক বিন্দু পরোয়াও তিনি করেননি।

২১. একথাটি ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি পরীক্ষার সময় একজন ঈমানদার যদি তার ঈমানে অটল ও অচল থাকে এবং সন্দেহ-সংশয় কিংবা আনুগত্য পরিহার কিংবা দীনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পথ বর্জন করে দৃঢ় প্রত্যয়, আস্থা, আনুগত্য ও অনুসরণ এবং দীনের প্রতি আস্থা পোষণের পথ অনুসরণ করে তাহলে তার ঈমান দৃঢ়তা ও সমৃদ্ধি লাভ করে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৩; আল আনফাল, আয়াত ২; টীকা ২; আত্ তাওবা, আয়াত ১৪৪ ও ১৪৫; টীকা ১২৫; আল আহযাব, আয়াত ২২; টীকা ৩৮; আল ফাত্হ, আয়াত ৪; টীকা ১)।

২২. কুরআন মজীদে সাধারণত 'মনের রোগ' কথাটি মুনাফেকী অর্থে ব্যবহার করা হয়। তাই এ ক্ষেত্রে এ শব্দটির ব্যবহার দেখে কোন কোন মুফাস্সির মনে করেছেন, এ আয়াতটি মদীনাতে নাযিল হয়েছে। কারণ, মদীনাতেই মুনাফিকদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। কিন্তু এ ধারণা কয়েকটি কারণে ঠিক নয়। প্রথমত এ দাবী ঠিক নয় যে, মকায় মুনাফিক ছিল না। আমরা তাফহীমুল কুরআন সূরা আনকাবুতের ভূমিকায় এবং ১, ১৩, ১৪, ১৫, ও ১৬নং টীকায় এ ভাব্য স্পষ্ট করে তুলে ধরেছি। দ্বিতীয়ত বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের কোন একটি আয়াত সম্পর্কে একথা বলা যে, তা অন্য কোন পরিস্থিতিতে নাযিল হয়েছে এবং কোন পূর্বাপর সম্পর্ক ছাড়তে এখানে জুড়ে দেয়া হয়েছে, এভাবে কুরআনের কোন আয়াতের তাফসীর করা আমরা সঠিক মনে করি না। নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতসমূহ থেকেই আমরা সূরা মুদ্দাস্সিরের এ অংশের ঐতিহাসিক পটভূমি জানতে পারি। মৰ্কী যুগের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে এ অংশটি নাযিল হয়েছিল। ঘটনার সাথে বজ্যের ধারাবাহিকতার পুরোপুরি সামঞ্জস্য রয়েছে। যদি এ একটি বাক্য কয়েক বছর পর মদীনাতেই নাযিল হয়ে থাকে তাহলে তাকে এ বিশেষ বিষয়ের মধ্যে এনে জুড়ে দেয়ার কি এমন অবকাশ বা যুক্তি আছে? এখন একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, 'মনের রোগ' বলতে তাহলে কি বুঝানো হয়েছে? এর জবাব হলো, এর অর্থ সন্দেহের রোগ। অকাট্যভাবে এবং নিসংশয়ে আগ্রাহ, আখেরাত, অহী, রিসালাত, জামাত ও দোয়খ অঙ্গীকার করে এমন লোক শুধু মকায় নয় গোটা পৃথিবীতে আগেও যেমন কম ছিল এখনও তেমনি কম আছে। আগ্রাহ আছেন কিনা, আখেরাত হবে কি হবে না, ফেরেশতা, জামাত ও দোয়খ বাস্তবিকই আছে না কল্পকাহিনী মাত্র? রসূল কি প্রকৃতই রসূল ছিলেন? তাঁর কাছে কি সত্যিই অহী আসতো? প্রত্যেক যুগে এ ধরনের সন্দেহ পোষণকারী লোকের সংখ্যাই অধিক ছিল। এ সন্দেহই অধিকাংশ মানুষকে শেষ পর্যন্ত কুফরীতে নিমজ্জিত করেছে। তা

০ " না হলে যারা এসব সত্য অকাট্যভাবে অধীকার করে পৃথিবীতে এরূপ নির্বোধের সংখ্যা কোন সময়ই বেশী ছিল না। কেননা যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ বিবেক-বৃদ্ধি আছে সেও জানে যে, এসব বিষয়ের সত্য ও সঠিক হওয়ার সত্ত্বাবন্না একেবারে বাতিল করে দেয়া এবং অকাট্যভাবে অসম্ভব ও অবাস্থা বলে সিদ্ধান্ত দেয়ার আদৌ কোন ভিত্তি নেই।

২৩. এর অর্থ এ নয় যে, তারা একে আল্লাহর বাণী বলে মেনে নিছিলো ঠিকই কিন্তু বিশ্ব প্রকাশ করছিলো এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা একথা বললেন কেন? বরং প্রকৃতপক্ষে তারা বলতে চাচ্ছিলো যে, যে বাণীতে এরূপ বিবেক-বৃদ্ধি বিরোধী ও দুর্বোধ্য কথা বলা হয়েছে তা আল্লাহর বাণী কি করে হতে পারে?

২৪. অর্থাৎ এভাবে আল্লাহ তা'আলা মাঝে মধ্যে তাঁর বাণী ও আদেশ-নির্দেশে এমন কিছু কথা বলেন যা মানুষের জন্য পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে কথা শুনে একজন সত্যপক্ষী, সংশ্লিষ্টির এবং সঠিক চিন্তার লোক সহজ সরল অর্থ গ্রহণ করে সঠিক পথ অনুসরণ করে একজন হঠকারী ব্রহ্মচিন্তাধারী এবং সত্যকে এড়িয়ে চলার মানসিকভা সম্পর্ক ব্যক্তি সে একই কথার বীকা অর্থ করে তাকে ন্যায় ও সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার একটা নতুন বাহানা হিসেবে ব্যবহার করে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিজে যেহেতু সত্যপক্ষী তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে হিদায়াত দান করেন। কারণ, হিদায়াত প্রার্থী ব্যক্তিকে জোর করে গোমরাহ বা পথভেষ করা আল্লাহর নীতি নয়। শেষোক্ত ব্যক্তি যেহেতু নিজেই হিদায়াত চায় না, বরং গোমরাহীকেই পছন্দ করে তাই আল্লাহ তাকে গোমরাহীর পথেই ঠেলে দেন। কারণ যে ন্যায় ও সত্যকে ঘৃণা করে তাকে জোর করে হকের পথে টেনে আনা আল্লাহর নীতি নয়। (আল্লাহ তা'আলার হিদায়াত দান করা এবং গোমরাহীর মধ্যে নিষ্কেপ করার বিষয়টি সম্পর্কে এ তাফসীর গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নিচে উল্লেখিত জায়গাসমূহে দেখুন, সূরা আল বাকারাহ, টীকা ১০, ১৬, ১৯, ও ২০; আন নিসা, টীকা ১৭৩; আল আন'য়াম, টীকা ১৭, ২৮ ও ৯০; ইউনুস, টীকা ১৩; আল কাহফ, টীকা ৫৪ এবং আল কাসাস, টীকা ৭১)

২৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্ব-জাহানে তিনি তিনি কত শত রকমের জীব-জন্তু যে সৃষ্টি করে রেখেছেন, তাদের কত রকম শক্তি সামর্থ যে দান করেছেন এবং তাদের দ্বারা কত রকম কাজ যে আজ্ঞাম দিচ্ছেন একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। পৃথিবীর মত ক্ষুদ্র একটি গ্রহে বসবাসকারী মানুষ তার সীমাবদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে তার পাশের ক্ষুদ্র পৃথিবীকে দেখে যদি এ ভুল ধারণা করে বসে যে, সে তার ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে যা কিছু দেখছে ও অনুভব করছে কেবল মাত্র সেগুলোই আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বাধীন তাহলে এটা তার মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বাধীন এ বিশ্ব-জাহান এত ব্যাপক ও বিশাল যে, মানুষের ক্ষুদ্র যষ্টিকে এর ব্যাপকতা ও বিশালতার সবটুকু জ্ঞানের স্থান সংকুলান তো দূরের কথা এর কোন একটি জিনিস সম্পর্কেও পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা তার সাধ্যাতীত।

২৬. অর্থাৎ দোষখের উপযুক্ত হয়ে যাওয়া এবং তার শাস্তিলাভের পূর্বেই লোকেরা যেন তা থেকে নিজেদের রক্ষার চিন্তা করে।

كَلَّا وَالْقَمِرُ<sup>১</sup> وَاللَّيلُ إِذَا دَبَرَ<sup>২</sup> وَالصَّبَرُ<sup>৩</sup> إِذَا أَسْفَرَ<sup>৪</sup> إِنَّمَا لِأَحْلَانِي الْكُبْرَ<sup>৫</sup> نَذِيرًا<sup>৬</sup>  
 لِلْبَشَرِ<sup>৭</sup> لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقدَّمْ<sup>৮</sup> أَوْ يَتَخَرَّجْ<sup>৯</sup> كُلُّ نَفْسٍ<sup>১০</sup> بِمَا كَسَبَتْ  
 وَهِينَةً<sup>১১</sup> إِلَّا أَصْحَابُ الْيَمِينِ<sup>১২</sup> فِي جَنَّةٍ<sup>১৩</sup> يَتَسَاءَلُونَ<sup>১৪</sup> عَنِ الْمُجْرِمِينَ<sup>১৫</sup>  
 مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ<sup>১৬</sup> قَالُوا لَرَنَاكُمْ مِنَ الْمُصَلِّيِّينَ<sup>১৭</sup> وَلَرَنَاكُمْ نَطَعْمَرَ<sup>১৮</sup>  
 الْمَسِكِينِ<sup>১৯</sup> وَكَنَانَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ<sup>২০</sup> وَكَنَانَكَلِبْ بِيَوْ<sup>২১</sup> الدِّينِ<sup>২২</sup>  
 حَتَّىٰ آتَنَا الْيَقِينَ<sup>২৩</sup> فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ السَّفَعِينَ<sup>২৪</sup>

## ২. কৃত্তু'

কথ্যনো না,<sup>২৫</sup> চাঁদের শপথ, আর রাতের শপথ যখন তার অবসান ঘটে। তোরের শপথ যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ দোষখও বড় জিনিসগুলোর একটি,<sup>২৬</sup> মানুষের জন্য তীতিকর। যে অগ্রসর হতে চায় বা পেছনে পড়ে থাকতে চায়<sup>২৭</sup> তাদের সবার জন্য।

প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের কাছে দায়বদ্ধ।<sup>২৮</sup> তবে ডান দিকের লোকেরা ছাড়া<sup>২৯</sup> যারা জানাতে অবস্থান করবে। সেখানে তারা অপরাধীদের জিজ্ঞেস করতে থাকবে<sup>৩০</sup> “কিসে তোমাদের দোষখে নিষ্কেপ করলো।” তারা বলবে : আমরা নামায পড়তাম না।<sup>৩১</sup> অভাবীদের খাবার দিতাম না।<sup>৩২</sup> সত্যের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের সাথে মিলে আমরাও রটনা করতাম; প্রতিফল দিবস মিথ্যা মনে করতাম। শেষ পর্যন্ত আমরা সে নিশ্চিত জিনিসের মুখোমুখি হয়েছি।<sup>৩৩</sup> সে সময় সুপারিশকারীদের কোন সুপারিশ তাদের কাজে আসবে না।<sup>৩৪</sup>

২৭. অর্থাৎ এটা কোন ভিত্তিহীন কথা নয় যে তা নিয়ে এভাবে হাসি তামাসা বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যাবে।

২৮. অর্থাৎ চন্দ্র এবং রাত-দিন যেমন আল্লাহর কুদরতের বিরাট বিরাট নির্দশন ঠিক তেমনি দোষখও আল্লাহর বিশাল সৃষ্টিসমূহের একটি। চাঁদের অস্তিত্ব যদি অসম্ভব না হয়ে থাকে। রাত ও দিনের নিয়মানুবর্তিতার সাথে আগমন তথা আবর্তন যদি অসম্ভব না হয় তাহলে তোমাদের মতে দোষখের অস্তিত্ব অসম্ভব হবে কি কারণে? রা. দিন সব সময় যেহেতু তোমরা এসব জিনিস দেখছো তাই এগুলো সম্পর্কে তোমাদের মনে কোন বিশ্য জাগে না। অন্যথায় এগুলোর প্রত্যেকটি আল্লাহর কুদরতের একেকটি বিশ্যকর মুঁজিয়া।

কোন সময় এসব জিনিস যদি তোমরা না দেখতে। আর এ অবস্থায় কেউ যদি তোমাদের বলতো যে, চাঁদের মত একটি জিনিস এ পৃথিবীতে আছে অথবা স্বৰ্য এমন একটি বস্তু যা আড়ালে চলে গেলে দুনিয়া আধারে ঢাকা পড়ে এবং আড়াল থেকে বেরিয়ে আসলে দুনিয়া আলোকোভাসিত হয়ে ওঠে তাহলে একথা শুনেও তোমাদের মত লোকেরা অট্টহাসিতে ঠিক তেমনি ফেটে পড়তে যেমন দোষখের কথা শুনে আজ ফেটে পড়ছো।

২৯. এর অর্থ হলো, এ জিনিসটি দারা মানুষকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এখন কেউ ইচ্ছা করলে এ জিনিসটিকে ভয় করে কল্পাণের পথে আরো এগিয়ে যেতে পারে। আবার কেউ ইচ্ছা করলে পেছনে সরে যেতে পারে।

৩০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন সূরা তৃরের ১৬নং টীকা।

৩১. অন্য কথায় বাম দিকের লোকেরা তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে পাকড়াও হবে। কিন্তু ডান দিকের লোকেরা দায়বদ্ধ অবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেবে। (ডান ও বাঁ দিকের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ওয়াকিয়া, টীকা ৫ ও ৬)

৩২. ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে যে, জান্নাত ও জাহানামের অধিবাসীরা পরম্পর থেকে লাখ লাখ মাইল দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও যখনই ইচ্ছা করবে কোন যত্নের সাহায্য ছাড়াই একে অপরকে দেখতে পাবে এবং সরাসরি কথাবার্তাও বলতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ, আয়াত ৪৪ থেকে ৫০, টীকা ৩৫; আস সাফ্ফাত, আয়াত ৫০ থেকে ৫৭, টীকা ৩২।

৩৩. এর অর্থ হলো, যেসব মানুষ আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং তাঁর কিতাবকে মেনে নিয়ে মানুষের কাছে আল্লাহর প্রাথমিক হক অর্থাৎ নামায ঠিকঘত আদায় করেছে আমরা তাদের মধ্যে অন্তরভুক্ত ছিলাম না। এ ক্ষেত্রে একথাটি খুব ভাল করে বুঝে নেয়া দরকার যে, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়তেই পারে না যতক্ষণ না সে ঈমান আনে। তাই নামাযী হওয়ার অর্থ হচ্ছে ঈমানদার হওয়া। কিন্তু নামাযী না হওয়াকে দোষখে যাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করার মাধ্যমে স্পষ্ট করে একথাই বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও সে দোষখ থেকে বাঁচতে পারবে না।

৩৪. এ থেকে জানা যায় কোন মানুষকে স্ফুর্ধার্ত দেখার পর সামর্থ থাকা সত্ত্বেও খাবার না দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে কত বড় গোনাহ যে, মানুষের দোষখে যাওয়ার কারণসমূহের মধ্যে এটাকেও একটা কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এ নীতি ও কর্মপদ্ধা অনুসরণ করেছি। শেষ পর্যন্ত সে নিশ্চিত বিষয়টি আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে যে সম্পর্কে আমরা গাফিল হয়ে পড়েছিলাম। নিশ্চিত বিষয় বলে মৃত্যু ও আখেরাত উভয়টিকেই বুবানো হয়েছে।

৩৬. অর্থাৎ যারা মৃত্যু পর্যন্ত এ নীতি অনুসরণ করেছে তাদের জন্য শাফায়াত করলেও সে ক্ষমা লাভ করতে পারবে না। শাফায়াত সম্পর্কে কুরআন মজীদের বহু স্থানে এত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কে শাফায়াত করতে সক্ষম আর কে সক্ষম নয়, কোন

فَمَا لَهُمْ عِنِ التَّذَكِّرَةِ مُعْرِضُينَ<sup>৩৫</sup> كَانُهُمْ حِمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَتْ مِنْ قَسْوَرَةِ<sup>৩৬</sup>  
 بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أَمْرٍ مِنْهُمْ أَنْ يَؤْتَى سَحَافَامِشَرَةَ<sup>৩৭</sup> كَلَّا بَلْ لَا  
 يَخَافُونَ الْآخِرَةَ<sup>৩৮</sup> كَلَّا إِنَّهُ تَذَكِّرَةَ<sup>৩৯</sup> فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ<sup>৪০</sup> وَمَا  
 يَنْكِرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ<sup>৪১</sup> هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْغَيْرَةِ<sup>৪২</sup>

এদের হলো কি যে এরা এ উপদেশ বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচে যেন তারা বাঘের ভয়ে পলায়নপর বন্য গাধা।<sup>৩৭</sup> বরং তারা প্রত্যেকে চায় যে, তার নামে খোলা চিঠি পাঠানো হোক।<sup>৩৮</sup> তা কথ্যনো হবে না। আসল কথা হলো, এরা আখেরাতকে আদৌ ভয় করে না।<sup>৩৯</sup> কথ্যনো ন।<sup>৪০</sup> এ তো একটা উপদেশ বাণী। এখন কেউ চাইলে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক। আর আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা কোন শিক্ষা গ্রহণ করবে না।<sup>৪১</sup> একমাত্র তিনিই তাকওয়া বা ভয়ের যোগ্য।<sup>৪২</sup> এবং (তাকওয়ার নীতি গ্রহণকারীদের) ক্ষমার অধিকারী।<sup>৪৩</sup>

অবস্থায় শাফায়াত করা যায় আর কোন্ অবস্থায় যায় না। কার জন্য করা যায় আর কার জন্য যায় না এবং কার জন্য তা কল্যাণকর আর কার জন্য তা কল্যাণকর নয় তা জানা কারো জন্য কঠিন নয়। পৃথিবীতে মানুষের গোমরাহীর বড় বড় কারণের মধ্যে একটি হলো শাফায়াত সম্পর্কে ভাস্ত আকীদা-বিশ্বাস পোষণ। তাই বিষয়টি কুরআন এত খোলামেলা ও স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছে যে, এ ক্ষেত্রে সন্দেহের আর কোন অবকাশই বাকি রাখেনি। উদাহরণ স্বরূপ নিচে নির্দেশিত আয়তসমূহ দেখুন, সূরা আল বাকারাহ, ২৫৫; আল আনআম, ১৪; আল আ'রাফ, ৫৩; ইউনস, ৩ ও ১৮; মারযাম, ৮৭; ত্বা-হা, ১০৯; আল আবিয়া, ২৮; সাবা ২৩, আয় যুমার, ৪৩ ও ৪৪, আল মু'মিন, ১৮; আদ দুখান, ৮৬; আল নাজ্ম, ২৬ এবং আল না'বা, ৩৭ ও ৩৮। যেসব স্থানে এসব আয়াত আছে তাফহীমুল কুরআনের সেসব জায়গায় আমরা বিস্তারিতভাবে তার ব্যাখ্যা পেশ করেছি।

৩৭. এটা প্রচলিত একটি আরবী প্রবাদ। বন্য গাধার বৈশিষ্ট হলো বিপদের আতঙ্গ পাওয়া মাত্র এত অস্থির হয়ে পালাতে থাকে যে আর কোন জন্তু তেমন করে না। এ জন্য আরবরা অস্থাভাবিক রকম অস্থির ও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়নপর ব্যক্তিকে বাঘের গুরু বা শিকারীর মৃদু পদশব্দ শোনামাত্র পলায়নরত বন্য গাধার সাথে তুলনা করে থাকে।

৩৮. অর্থাৎ তারা চায় যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সত্যি সত্যিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে তিনি মকার প্রত্যেক নেতৃ ও সমাজপতিদের কাছে যেন একখানা করে পত্র লিখে পাঠান যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

৩০। আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই আমার নবী, তোমরা তাঁর আনুগত্য করো। পত্রখানা এমন হবে যেন তা দেখে তারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহই এ পত্র নিখে পাঠিয়েছেন। কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় ঘক্কার কাফেরদের এ উত্তিরও উচ্ছেব করা হয়েছে যে, “আল্লাহর রসূলদের যা দেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তা আমাদের দেয়া না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মেনে নেব না।” (আল আন’আম, ২৪) অন্য এক জায়গায় তাদের এ দাবীও উত্তৃত করা হয়েছে যে, “আপনি আমাদের চেতের সামনে আসমানে উঠে যান এবং সেখান থেকে লিখিত কিতাব নিয়ে আসেন, আমরা তা পড়ে দেখবো।” (বনী ইসরাইল, ৯৩)

৩১. অর্থাৎ এদের ইমান না আনার আসল কারণ এটা নয় যে, তাদের এ দাবী পূরণ করা হচ্ছে না। বরং এর আসল কারণ হলো এরা আখেরাতের ব্যাপারে বেপরোয়া ও নিভীক। এরা এ পৃথিবীকেই পরম পাওয়া মনে করে নিয়েছে। তাই তাদের এ ধারণাটুকু পর্যন্ত নেই যে, এ দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার পর আরেকটি জীবন আছে যেখানে তাদেরকে নিজ নিজ কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে। এ জিনিসটাই তাদেরকে এ পৃথিবীতে নিরাদিশ ও দায়িত্বহীন বানিয়ে দিয়েছে। হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার প্রশংকে তারা অর্থহীন মনে করে। কারণ দুনিয়াতে এমন কোন সত্য তারা দেখতে পায় না যা অনুসরণ করার ফলাফল এ দুনিয়াতে সবসময় ভালই হয়ে থাকে এবং এমন কোন বাতিল বা মিথ্যাও তারা দুনিয়াতে দেখতে পায় না যার ফলাফল এ দুনিয়াতে সবসময় মন্দই হয়ে থাকে। তাই প্রকৃতপক্ষে সত্য কি আর মিথ্যা কি তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা তারা নির্বর্ধক মনে করে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার এ জীবনকে অঙ্গায়ী জীবন বলে মনে করে এবং সাথে সাথে এও বিশ্বাস করে যে, সত্যিকার এবং চিরস্থায়ী জীবন হলো আখেরাতের জীবন যেখানে সত্যের ফলাফল অনিবার্যরূপে ভাল এবং মিথ্যার ফলাফল অনিবার্যরূপে মন্দ হবে, হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার প্রশংক কেবলমাত্র সে ব্যক্তির কাছেই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হতে পারে। এ প্রকৃতির লোক কুরআনের পেশকৃত যুক্তিপূর্ণ দলীল-প্রমাণ এবং পবিত্র শিক্ষাসমূহ দেখেই তার প্রতি ইমান আনবে এবং নিজের বিবেক-বৃদ্ধি প্রয়োগ করে বুঝার চেষ্টা করবে যে, কুরআন যেসব আকীদা-বিশ্বাস এবং কাজ-কর্মকে ভাস্ত বলছে তার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কি কি ভুল-ভাস্তি আছে। কিন্তু আখেরাতকে অঙ্গীকারকরী, যে সত্যের অনুসন্ধানে নিষ্ঠাবান নয় সে ইমান গ্রহণ না করার জন্য নতুন নতুন দাবী পেশ করতে থাকবে। অথচ তার যে কোন দাবীই পূরণ করা হোক না কেন সত্যকে অঙ্গীকার করার জন্য সে আরেকটি নতুন বাহানা খাড়া করবে। এ কথাটাই সূরা আন’আমে এভাবে বলা হয়েছে : “হে নবী, আমি যদি কাগজে লিখিত কোন গ্রন্থ তোমার প্রতি নাযিল করতাম আর এসব লোকেরা তা হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখতো তার পরও যারা সত্যকে অঙ্গীকার করেছে তারা বলতো, এতো স্পষ্ট যাদু।” (সূরা আল আন’আম, ৭)

৩২. অর্থাৎ তাদের এ ধরনের কোন দাবী কখনো পূরণ করা হবে না।

৩৩. অর্থাৎ নসীহত গ্রহণ করা শুধু কোন ব্যক্তির নিজের ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে না বরং নসীহত গ্রহণ করার সৌভাগ্য সে তখনই লাভ করে যখন আল্লাহর ইচ্ছা তাকে নসীহত গ্রহণ করার সুযোগ ও সুবুদ্ধি দান করে। অন্য কথায় এখানে এ সত্য তুলে ধরা

হয়েছে যে, বান্দার কোন কাজই এককভাবে বান্দার নিজের ইচ্ছায় সংঘটিত হয় না। বরং প্রতিটি কাজ কেবল তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন আল্লাহর ইচ্ছা বান্দার ইচ্ছার অনুকূল হয়। এ সৃষ্টি বিষয়টি সঠিকভাবে না বুঝার কারণে মানুষের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা অনেক ক্ষেত্রেই হোঁচ্ট থায়। অন্ধ কথায় বিষয়টি এভাবে বুঝা যেতে পারে, প্রতিটি মানুষ যদি পৃথিবীতে এতটা ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী হতো যে, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে তাহলে গোটা পৃথিবীর নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙে পড়তো। বর্তমানে এ পৃথিবীতে যে নিয়ম শৃঙ্খলা আছে তা এ কারণেই আছে যে, আল্লাহর ইচ্ছা সব ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষ যা-ই করতে ইচ্ছা করুক না কেন তা সে কেবল তখনই করতে পারে যখন আল্লাহর ইচ্ছা হয় যে, সে তা করুক। হিদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারটিও ঠিক অনুরূপ। নিজের জন্য হিদায়াত কামনা করাই মানুষের হিদায়াত পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সে হিদায়াত কেবল তখনই লাভ করে যখন আল্লাহ তার এ আকাংখা পূরণ করার ফায়সালা করেন। একইভাবে বান্দার পক্ষ থেকে গোমরাহীর পথে চলার ইচ্ছাই তার গোমরাহীর জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তার মধ্যে গোমরাহীর দাবী ও আকাংখা দেখে আল্লাহর ইচ্ছা যখন তাকে গোমরাহী ও ভাস্তির পথে চলার মন্ত্রী ও ফায়সালা দেন তখনই কেবল সে ভাস্তি ও গোমরাহীর পথে চলতে থাকে। এভাবে সে গোমরাহীর সেসব পথে চলতে পারে যেসব পথে চলার অবকাশ আল্লাহ তাকে দেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কেউ যদি চোর হতে চায়, তাহলে তার এ ইচ্ছাটুকুই এ জন্য যথেষ্ট নয় যে, সে যেখানে ইচ্ছা, যে ঘর থেকে ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা চুরি করে নিয়ে যেতে পারবে। বরং আল্লাহ তাঁর নিজের ব্যাপক জ্ঞান, যুক্তি ও প্রজ্ঞা অনুসারে তার এ ইচ্ছাকে যখন, যতটা এবং যেভাবে পূরণ করার সুযোগ দেন সে কেবল ততটুকুই পূরণ করতে পারে।

৪২. অর্থাৎ আল্লাহর অস্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে নসীহত তোমাদের করা হচ্ছে তা এ জন্য নয় যে, তাতে আল্লাহর নিজের কোন প্রয়োজন আছে এবং তোমরা তা না করলে আল্লাহর কোন ক্ষতি হবে। বরং এ নসীহত করা হচ্ছে এ জন্য যে, বান্দা তাঁর স্তুষ্টি কামনা করুক এবং তাঁর ইচ্ছার বিরক্তে না চলুক এটা আল্লাহর হক বা অধিকার।

৪৩. অর্থাৎ কেউ আল্লাহর নাফরমানী যতই করে থাকুক না কেন যখনই সে এ আচরণ থেকে বিরত হয় তখনই আল্লাহ তার প্রতি নিজের রহমতের হাত বাড়িয়ে দেন। যেহেতু তিনি বান্দা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের কোন ইচ্ছা আদৌ পোষণ করেন না তাই এমন হঠকারী তিনি নন যে, কোন অবস্থায়ই তাকে ক্ষমা করবেন না বা শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না।

# আল কিয়ামাহ

৭৫

## নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের **الْفِتْمَةُ** শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি শুধু সূরাটির নামই নয়, বরং বিষয়ভিত্তিক শিরোনামও। কারণ এ সূরায় শুধু কিয়ামত সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

## নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন হাদীস থেকে যদিও এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানা যায় না। কিন্তু এর বিষয়বস্তুর মধ্যেই এমন একটি প্রমাণ বিদ্যমান যা থেকে বুঝা যায়, এটি নবুওয়াতের একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। সূরার ১৫ আয়াতের পর হঠাৎ ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ করে রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোধন করে বলা হচ্ছে : এ অঙ্গকে দ্রুত মুক্ত করার জন্য তুমি জিহবা নাড়বে না। এ বাণীকে শরণ করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। অতএব আমি যখন তা পড়ি তখন তুমি তা মনযোগ দিয়ে শুনতে থাকো। এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। এরপর ২০ নম্বর আয়াত থেকে আবার সে পূর্বের বিষয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে যা প্রথম থেকে ১৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলেছিল। যে সময় হ্যরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এ সূরাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনাছিলেন পরে ভুলে যেতে পারে। এ আশংকায় তিনি এর কথাগুলো বার বার মুখে আওড়াচ্ছিলেন। এ কারণে পূর্বাপর সম্পর্কহীন এ বাক্যটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং হাদীসের বর্ণনা উভয় দিক থেকেই বজ্রবের মাঝখানে সন্নিবেশিত হওয়া যথৰ্থ হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এ ঘটনা সে সময়ের যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবেমাত্র অহী নাযিলের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছেন এবং অহী গ্রহণের পাকাপোক্ত অভ্যাস তাঁর তখনও গড়ে ওঠেনি। কুরআন মজীদে এর আরো দুটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি সূরা ত্বা-হা যেখানে রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোধন করে বলা হয়েছে :

**وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ**

“আর দেখো, কুরআন পড়তে তাড়াহড়া করো না, যতক্ষণ না তোমাকে অহী পূর্ণরূপে পৌছিয়ে দেয়া হয়। (আয়াত ১১৪)

দ্বিতীয়টি সূরা আ'লায়। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে : **سَنَقْرِئُكَ فَلَا تَنْسِى** “আমি অচিরেই তোমাকে পড়িয়ে দেব তারপর

তুমি আর ভুলে যাবে না।" (আয়াত, ৬) পরবর্তী সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই গ্রহণে ভালভাবে অভ্যন্ত হয়ে গেলে এ ধরনের নির্দেশনা দেয়ার আর প্রয়োজন থাকেনি। তাই কুরআনের এ তিনটি স্থান ছাড়া এর আর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

### বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য

এ সূরা থেকে কুরআন মজীদের শেষ পর্যন্ত যতগুলো সূরা আছে তার অধিকাংশের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাতঙ্গী থেকে বুঝা যায় যে, সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর যখন অবিশ্বাস্ত ধারায় বৃষ্টি বর্ষণের মত কুরআন নাযিলের সিলসিলা শুরু হলো, এ সূরাটিও তখনকার অবতীর্ণ বলে মনে হয়। পর পর নাযিল হওয়া এসব সূরায় জোরালো এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় অভ্যন্ত ব্যাপক কিন্তু সংক্ষিপ্ত বাক্যে ইসলাম এবং তার মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক শিক্ষাসমূহ পেশ করা হয়েছে এবং মুক্তাবাসীদেরকে তাদের গোমরাহী সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। এ কারণে কুরাইশ নেতারা অস্থির হয়ে যায় এবং প্রথম হজ্জের মওসুম আসার আগেই তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রার্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য নানা রকম ফন্দি-ফিকির ও কোশল উদ্ভাবনের জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। সূরা মুদ্দাস্সিরের ভূমিকায় আমরা এ বিষয়ের উদ্দেশ্য করেছি।

এ সূরায় আব্দেরাত অবিশ্বাসীদের সম্বোধন করে তাদের একেকটি সন্দেহ ও একেকটি আপত্তি ও অভিযোগের জওয়াব দেয়া হয়েছে। অভ্যন্ত মজবুত প্রমাণাদি পেশ করে কিয়ামত ও আব্দেরাতের সম্ভাব্যতা, সংঘটন ও অনিবার্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। আর একথাও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিই আব্দেরাতকে অঙ্গীকার করে, তার অঙ্গীকৃতির মূল কারণ এটা নয় যে, তার জ্ঞানবৃদ্ধি তা অসম্ভব বলে মনে করে। বরং তার মূল কারণ ও উৎস হলো, তার প্রবৃত্তি তা মেনে নিতে চায় না। সাথে সাথে মানুষকে এ বলে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, যে সময়টির আগমনকে তোমরা অঙ্গীকার করছো তা অবশ্যই আসবে। তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম তোমাদের সামনে পেশ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে আমলনামা দেখার পূর্বেই তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই জানতে পারবে যে, সে পৃথিবীতে কি কি কাজ করে এসেছে। কেননা কোন মানুষই নিজের ব্যাপারে অজ্ঞ বা অনবহিত নয়। দুনিয়াকে প্রতারিত করার জন্য এবং নিজের বিবেককে তুলানোর জন্য নিজের কাজকর্ম ও আচরণের পক্ষে যত যুক্তি, বাহানা ও ওয়র সে পেশ করুক না কেন।

আয়াত ৪০

## সুরা আল কিয়ামাহ-মক্কী

রুক্ত ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

لَا أَقْسِرُ بِيَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝ وَلَا أَقْسِرُ بِالنَّفْسِ الْوَاهِمَةِ ۝ أَيَحْسَبُ  
 الْإِنْسَانُ أَنَّ نَجْمَعَ عَظَامَهُ ۝ بَلْ يُقْدِرُ إِنْ غَلَىٰ أَنْ نَسُوِي بِنَانَهُ ۝  
 بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝ فَإِذَا بَرَقَ  
 الْبَصَرُ ۝ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝ وَجَمَعَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ ۝ يَقُولُ الْإِنْسَانُ  
 يُوْمَئِنُ أَيْنَ الْمَفْرُ ۝ كَلَّا لَا وَزَرَ ۝ إِلَى رِبِّكَ يُوْمَئِنُ ۝ الْمُسْتَقْرُ ۝ يَنْبُؤُ  
 الْإِنْسَانُ يُوْمَئِنُ بِمَا قَدِّمَ أَوْ أَخْرَى ۝ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝ وَلَوْلَا فِي  
 مَعَادِنِهِ ۝

না,<sup>১</sup> আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিনের। আর না, আমি শপথ করছি  
 তিরক্কারকারী নফসের।<sup>২</sup> মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাড়সমূহ একত্র  
 করতে পারবো না!<sup>৩</sup> কেন পারবো না! আমি তো তার আঁগলের জোড়গুলো পর্যন্ত  
 ঠিকমত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।<sup>৪</sup> কিন্তু মানুষ ভবিষ্যতেও কুকর্ম করতে চায়।<sup>৫</sup>  
 সে জিজ্ঞেস করে, কবে আসবে কিয়ামতের সেদিন?<sup>৬</sup> অতপর চক্ষু যখন হির হয়ে  
 যাবে।<sup>৭</sup> চৌদ আলোহীন হয়ে পড়বে এবং চৌদ ও সূর্যকে একত্র করে একাকার করে  
 দেয়া হবে।<sup>৮</sup> সেদিন এ মানুষই বলবে, পালাবার স্থান কোথায়? কথ্যনো না,  
 সেখানে কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না। সেদিন তোমার রবের সামনেই গিয়ে দাঁড়াতে  
 হবে। সেদিন মানুষকে তার আগের ও পরের কৃতকর্মসমূহ জানিয়ে দেয়া হবে।<sup>৯</sup>  
 বরং মানুষ নিজে নিজেকে খুব ভাল করে জানে। সে যতই অজুহাত পেশ করুক না  
 কেন।<sup>১০</sup>

১. 'না' শব্দ দ্বারা বক্তব্য শুরু করাই প্রমাণ করে যে, আগে থেকেই কোন বিষয়ে আলোচনা চলছিল যার প্রতিবাদ করার জন্য এ সূরা নাযিল হয়েছে। পরবর্তী বক্তব্য স্বতঃই স্পষ্ট করে দেয় যে, আলোচনার বিষয় ছিল কিয়ামত ও আখেরাতের জীবন। আর মক্কার লোকেরা এটি শুধু অস্থীকারই করে আসছিলো না বরং অস্থীকৃতির সাথে সাথে তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করে আসছিলো। একটি উদাহরণ দ্বারা এ বর্ণনাতঙ্গি ভাল করে বুরো যেতে পারে। আপনি যদি শুধু রসূলের সত্যতা অস্থীকার করতে চান তাহলে বলবেন : আল্লাহর কসম রসূল সত্য। "কিন্তু কিছু লোক যদি রসূলকে অস্থীকার করতে থাকে তবে তার উভয়ের আপনি কথা বলতে শুরু করবেন এভাবে : না, আল্লাহর কসম, রসূল সত্য। এর অর্থ হবে, তোমরা যা বলছো তা ঠিক নয়। আমি কসম করে বলছি, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এটি।

২. কুরআন মজীদে মানুষের নফসের তিনটি রূপ উল্লেখ করা হয়েছে। এক, একটি 'নফস' মানুষকে মন্দ কাজে প্ররোচিত করে। এটির নাম 'নফসে আমরা'। দুই, একটি 'নফস' ভুল বা অন্যায় কাজ করলে অথবা ভুল বা অন্যায় বিষয়ে চিন্তা করলে কিংবা খারাপ নিয়ত রাখলে সজ্জিত হয় এবং সে জন্য মানুষকে তিরঙ্গার ও ভৎসনা করে। এটির নাম 'নফসে লাউয়ামাহ'। আধুনিক পরিতায়ায় একেই আমরা বিবেক বলে থাকি। তিনি, যে নফসটি সঠিক পথে চললে এবং ভুল ও অন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করলে তৃষ্ণি ও প্রশান্তি অনুভব করে তাকে বলে 'নফসে মৃত্মাইনাহ'।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কি কারণে কিয়ামতের দিন এবং তিরঙ্গারকারী নফসের কসম করেছেন তা বর্ণনা করেননি। কারণ প্রবর্তী আয়াতটি সে বিষয়টির প্রতিই ইংগিত করছে। যে জন্য কসম করা হয়েছে তাহলো, মানুষের যরার পর আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাকে অবশ্যই সৃষ্টি করবেন; তা করতে তিনি পুরোপুরি সক্ষম। এখন প্রশ্ন হলো এ বিষয়টির জন্য এ দু'টি জিনিসের কসম করার পেছনে কি মৌকিকতা আছে?

কিয়ামতের দিনের কসম খাওয়ার কারণ হলো, কিয়ামতের আগমন নিশ্চিত ও অনিবার্য। গোটা বিশ-জাহানের ব্যবস্থাপনাই প্রমাণ করছে যে, এ ব্যবস্থাপনা অনাদী ও অতিশীঘ্ৰ নয়। এর বৈশিষ্ট ও প্রকৃতিই বলে দিচ্ছে এটা চিরদিন ছিল না এবং চিরদিন থাকতেও পারে না। মানুষের জ্ঞান-বৃদ্ধি এ ভিত্তিশীল ধ্যান-ধারণার সপক্ষে ইতিপৰ্বেও কোন মজবুত দলীল-প্রমাণ খুঁজে পায়নি যে, প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল এ পৃথিবী কখনো অনাদি ও অবিনশ্বর হতে পারে। কিন্তু এ পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে এ বিষয়টি তার কাছে ততই নিশ্চিত হতে থাকে যে, এ চাকচ্চল্য মুখ্য বিশ-জাহানের একটি শুরু বা সূচনা বিদ্যু আছে যার পূর্বে এটি ছিল না। আবার অনিবার্যরূপে এর একটি শেষও আছে যার পরে এটি আর থাকবে না। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কিয়ামতেরই কসম করেছেন। এ কসমটির ধরন একপ যেমন আমরা অতিশয় সন্দেহবাদী কোন মানুষকে—যে তার আপন অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ করছে—সংবোধন করে বলি : তোমার প্রাণ সন্তান কসম, তুমি তো বর্তমান। অর্থাৎ তোমার অস্তিত্বই সাক্ষী যে তুমি আছ।

কিয়ামতের দিনের কসম শুধু এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, একদিন বিশ-জাহানের এ ব্যবস্থা ধ্রংস হয়ে যাবে। এরপর মানুষকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে। তাকে

নিজের সমস্ত কাজের হিসেবে দিতে হবে এবং সে নিজের কৃতকর্মের ভাল বা মন্দ ফলাফল দেখবে। এর জন্য পুনরায় 'নফসে লাউয়ামার' কসম করা হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যার মধ্যে বিবেক বলে কোন জিনিস নেই। এ বিবেকের মধ্যে অনিবার্যরূপে ভাল এবং মন্দের একটি অনুভূতি বিদ্যমান। মানুষ ভাল এবং মন্দ যীচাইয়ের যে মানদণ্ডই স্থির করে থাকুক না কেন এবং তা ভুল হোক বা নির্ভুল হোক, চরম অধঃগতিত ও বিভ্রান্ত মানুষের বিবেকও মন্দ কাজ করলে কিংবা তাল কাজ না করলে তাকে তিরঙ্গাৰ করে। এটাই প্রমাণ করে যে, মানুষ নিছক একটি জীব নয়, বরং একটি নৈতিক সদ্বাও বটে। প্রকৃতিগতভাবেই তার মধ্যে ভাল এবং মন্দের উপলব্ধি বিদ্যমান। সে নিজেই ভাল এবং মন্দ কাজের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে। সে অন্যের সাথে যখন কোন খারাপ আচরণ করে তখন সে ব্যাপারে নিজের বিবেকের দশ্শনকে দমন করে আজ্ঞাত্বষ্টি সাড় করলেও অন্য কেউ যখন তার সাথে একই আচরণ করে তখন আপনা থেকেই তার বিবেক দাবী করে যে, এ ধরনের আচরণকারীর শাস্তি হওয়া উচিত। এখন কথা হলো, মানুষের নিজ সত্তার মধ্যেই যদি এ ধরনের একটি 'নফসে লাউয়ামা' বা তিরঙ্গারকারী বিবেকের উপস্থিতি একটি অনৰ্বীকার্য সত্য হয়ে থাকে, তাহলে এ সত্যটিও অনৰ্বীকার্য যে, এ 'নফসে লাউয়ামা'ই মৃত্যুর পরের জীবনের এমন একটি প্রমাণ যা মানুষের আপন সপ্তার মধ্যে বিদ্যমান। কেননা যেসব ভাল এবং মন্দ কাজের জন্য মানুষ দায়ী সেসব কাজের জন্য পুরঙ্গার বা শাস্তি তার অবশ্যই পাওয়া উচিত। এটাই প্রকৃতির স্বাতান্ত্রিক দাবী। কিন্তু মৃত্যুর পরের জীবন ছাড়া আর কোনভাবেই তার এ দাবী পূরণ হতে পারে না। মৃত্যুর পরে মানুষের সত্তা যদি বিলীন ও নিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে তার অনেক ভাল কাজের পুরঙ্গার থেকে সে নিষ্ঠিতরূপে বাস্তিত থেকে যাবে। আবার এমন অনেক মন্দ কাজ আছে যার ন্যায্য শাস্তি থেকে সে অবশ্যই নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। বিবেক-বৃক্ষ সম্পর্ক কোন মানুষই এ সত্য অবৰ্কার করতে পারে না। অযৌক্তিক একটি বিশে বিবেক-বৃক্ষ সম্পর্ক মানুষ জন্মলাভ করে বসেছে এবং নৈতিক উপলব্ধি সম্পর্ক মানুষ এমন এক পৃথিবীতে জন্য নিয়ে বসেছে মৌলিকভাবে যার পুরা ব্যবহারপন্থয় নৈতিকতার কোন অস্তিত্বই নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ এ অবস্থীন ও অযৌক্তিক কথাটি শীর্কার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মৃত্যুর পরের জীবনকে অবৰ্কার করতে পারে না। একইভাবে পুনর্জন্ম বা জন্মাত্তরবাদী দর্শন প্রকৃতির এ দাবীর যথার্থ জ্বাব নয়। কারণ মানুষ যদি নিজের নৈতিক কাজ-কর্মের পুরঙ্গার বা শাস্তিলাভের জন্য একের পর এক এ পৃথিবীতে জন্য নিতে থাকে তাহলে প্রত্যেক জন্যে সে পুনরায় আরো কিছু নৈতিক কাজ-কর্ম করতে থাকবে যা নতুন করে পুরঙ্গার বা শাস্তির দাবী করবে। আর এ অস্তিত্বে ধারাবাহিকতার ঘূণিপাকে পড়ে তার হিসেব-নিকেশের কোন ফায়সালা হবে না। বরং তা ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। সুতরাং প্রকৃতির এ দাবী কেবল একটি অবস্থায়ই পূরণ হতে পারে। তা হলো, এ পৃথিবীতে মানুষের একটি মাত্র জীবন হবে এবং গোটা মানব জাতির আগমনের ধারা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আরেকটি জীবন হবে। সে জীবনে মানুষের সমস্ত কাজকর্ম যথাযথভাবে হিসেব-নিকেশ করে তাকে তার প্রাপ্য পুরো পুরঙ্গার বা শাস্তি দেয়া হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, চীকা ৩০)

৩. কসম আকারে ওপরে বর্ণিত দু'টি দলীল শুধু দু'টি বিষয় প্রমাণ করে। এক, এ দুনিয়ার পরিসম্যাপ্তি (অর্থাৎ কিয়ামতের প্রথম পর্যায়) একটি নিষ্ঠিত ও অনিবার্য ব্যাপার।

দুই, মৃত্তুর পরে আরেকটি জীবন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ তা ছাড়া মানুষের একটি নেতৃত্ব সম্পূর্ণ হওয়ার যৌক্তিক ও প্রকৃতিগত দাবী পূরণ হতে পারে না। আর এ ব্যাপারটি অবশ্যই সংঘটিত হবে। মানুষের মধ্যে বিবেক থাকাটাই তা প্রমাণ করে। মৃত্তুর পরের জীবন যে সম্ভব একথা প্রমাণ করার জন্যই এ তৃতীয় দলীলটি পেশ করা হয়েছে। মৃত্তুর যেসব লোক মৃত্তুর পরের জীবনকে অঙ্গীকার করতো তারা বার বার একথা বলতো যে, যেসব লোকের মৃত্তুর পর হাজার হাজার বছর অভিবাহিত হয়ে গেছে, যাদের দেহের প্রতিটি অগু-পরমাণু মাটিতে মিশে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, যাদের হাড়গোড় পচে গলে পৃথিবীর কত জায়গায় যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে তার কোন হিসেব নেই, যাদের কেউ যরেছে আগুনে পুড়ে, কেউ হিংস্র জন্মের আহারে পরিণত হয়েছে। আবার কেউ সমৃদ্ধে ভূবে মাছের খোরাক হয়েছে তাদের সবার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আবার একত্র হবে এবং প্রতিটি মানুষ আবার হবহ সে মানুষটি হয়ে জীবনলাভ করবে, যে মানুষটি দশ-বিশ হাজার বছর আগে কোন এক সময় ছিল, এটা কি করে সম্ভব? মৃত্তুর লোকদের এসব কথার জবাব আগ্নাহ তা'আলা একটি ছোট প্রশ্নের আকারে অত্যন্ত যুক্তিশায় ও বলিষ্ঠভাবে দিয়েছেন। তিনি বলছেন : "মানুষ কি মনে করছে যে, আমি তার হাড়গোড় আদৌ একত্রিত করতে পারবো না"? অর্থাৎ যদি তোমাদেরকে বলা হতো, তোমাদের দেহের বিক্ষিপ্ত এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন এক সময় আপনা থেকেই একত্রিত হয়ে যাবে এবং তোমরাও আপনা থেকেই হবহ এই দেহ নিয়েই জীবিত হয়ে যাবে তাহলে এরূপ হওয়াটাকে অসম্ভব মনে করা তোমাদের জন্য নিসদ্দেহে যুক্তিসংগত হতো। কিন্তু তোমাদের তো বলা হয়েছে এ কাজটি আপনা থেকেই হবে না। বরং তা করবেন আগ্নাহ তা'আলা নিজে। তাহলে কি তোমরা প্রকৃতপক্ষেই মনে করো যে, সারা বিশ-জাহানের সৃষ্টিকর্তা—যাকে তোমরা নিজেরাও সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করে ধাকো—এ কাজ করতে অক্ষম? এটি এমন একটি প্রশ্ন যে, যারা আগ্নাহ তা'আলাকে বিশ-জাহানের মষ্টো বলে স্বীকার করে, সে যুগেও তারা বলতে পারতো না এবং বর্তমান যুগেও বলতে পারে না যে, আগ্নাহ তা'আলা নিজেও এ কাজ করতে চাইলে করতে পারবেন না। আর কোন নির্বোধ যদি এমন কথা বলেও ফেলে তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে যে, তুমি আজ যে দেহের অধিকারী তার অসংখ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাতাস, পানি, মাটি এবং অজ্ঞাত আরো কত জায়গা থেকে এনে একত্রিত করে সে আগ্নাহ এ দেহটি কিভাবে তৈরী করলেন যার সম্পর্কে তুমি বলছো যে, তিনি পুনরায় এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্রিত করতে সক্ষম নন?

৪. অর্থাৎ বড় বড় হাড়গুলো একত্রিত করে পুনরায় তোমার দেহের কাঠামো প্রস্তুত করা এমন কিছুই নয়। আমি তো তোমার দেহের সূচ্ছতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি তোমার আঙ্গুলের জোড়গুলোও পুনরায় ঠিক তেমন করে বানাতে সক্ষম যেমন তা এর আগে ছিল।

৫. এ ছোট বাক্যটিতে আখেরাত অবিশ্যাসকারীদের আসল রোগ কি তা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। যেসব জিনিস এসব লোককে আখেরাত অঙ্গীকার করতে উদ্দুক করতো তা মূলত এ নয় যে, প্রকৃতই তারা কিয়ামত ও আখেরাতকে অসম্ভব মনে করতো। বরং তারা যে কিয়ামত ও আখেরাতকে অঙ্গীকার করে তার মূল কারণ হলো, আখেরাতকে মেনে নিলে তাদের ওপর অনিবার্যভাবে কিছু নেতৃত্ব বাধ্যবাধকতা আরোপিত

হয়। সে বাধ্যবাধকতা মেনে নেয়া তাদের কাছে মোটেই মনঃপূত নয়। তারা চায় আজ পর্যন্ত তারা পৃথিবীতে যেকোন লাগামহীন জীবন যাপন করে এসেছে ভবিষ্যতেও ঠিক তেমনি করতে পারে। আজ পর্যন্ত তারা যে ধরনের জুনুম-অত্যাচার, বেদমানী, পাপচার ও দুর্ক্ষর্ম করে এসেছে ভবিষ্যতেও তা করার অবাধ স্বাধীনতা যেন তাদের থাকে। একদিন তাদেরকে আল্লাহর বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে এসব কাজের জবাবদিহি করতে হবে এ বিশ্বাস যেন তাদের অবৈধ লাগামহীন স্বাধীনতা ও বেছচারিতার পথ রোধ করতে না পারে। তাই প্রকৃতপক্ষে তাদের বিবেক-বুদ্ধি তাদেরকে আখেরাতের প্রতি দীমান আনতে বাধা দিছে না। বরং তাদের প্রবৃত্তির কামনা বাসনাই এ পথের প্রতিবন্ধক।

৬. এ প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে জানার জন্যে নয়। বরং তা অঙ্গীকৃতিমূলক ও বিদ্যুপাত্তক প্রশ্ন অর্থাৎ কিয়ামত কবে আসবে তা জানতে চায়নি তারা। বরং তারা একথা বলছিলো বিদ্যুপ করে যে, জনাব, আপনি যে দিনটির আসার খবর দিছেন তা আসার পথে আবার কোথায় আটকে রইলো?

৭. মূল আয়াতে **البصَرِ شَدِّ بَرْقِ** ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো বিদ্যুতের বলকে চোখ ধীরিয়ে যাওয়া। কিন্তু প্রচলিত আরবী বাকরীতিতে একথাটি শুধু এ একটি অর্থ জ্ঞাপকই নয়। বরং ভৌতি-বিহুবলতা, বিশ্বয় অথবা কোন দৃঢ়চন্তার অক্ষণ্যিকতায় যদি কেউ হতবুদ্ধি হয়ে যায় এবং সে ভৌতিকর দৃশ্যের প্রতি তার চক্ষু স্থির-নিবন্ধ হয়ে যায় যা সে দেখতে পাচ্ছে তাহলে এ অবস্থা বুঝাতেও একথাটি বলা হয়ে থাকে। একথাটিই কুরআন যজীদের আরেক জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে:

**إِنَّمَا يُؤْخِرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ**

“আল্লাহ তো তাদের অবকাশ দিছেন সেদিন পর্যন্ত যেদিন চক্ষুসমূহ স্থির হয়ে যাবে।”

সূরা ইবরাহীম, ৪২।

৮. এটা কিয়ামতের প্রথম পর্যায়ে বিশ-জাহানের ক্ষণস হয়ে যাওয়ার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। চাঁদের আলোহীন হয়ে যাওয়া এবং চাঁদ ও সূর্যের পরম্পর একাকার হয়ে যাওয়ার অর্থ এও হতে পারে যে, সূর্য থেকে প্রাণ চাঁদের আলোই শুধু ফুরিয়ে যাবে না। বরং সূর্য নিজেও অক্ষকার হয়ে যাবে এবং আলোহীন হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ের অবস্থা হবে একই। দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, হাতাং পৃথিবী উন্টা দিকে চলতে শুরু করবে এবং সেদিন চাঁদ ও সূর্য একই সাথে পক্ষিম দিক থেকে উদিত হবে। এর তৃতীয় আরেকটি অর্থ এও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, চাঁদ অক্ষযাত পৃথিবীর মহাকর্ষ থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে যাবে এবং সূর্যের ওপরে গিয়ে আছড়ে পড়বে। এ ছাড়া এর আরো কোন অর্থ হতে পারে যা বর্তমানে আমাদের বোধগম্য নয়।

৯. মূল বাক্যটি হলো **بِمَا قَدْمُ وَآخْرُ**। এটা একটা ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক বাক্য। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত সবগুলোই এখানে প্রযোজ্য। এর একটি অর্থ হলো, দুনিয়ার জীবনে মানুষ মৃত্যুর পূর্বে কি কি নেক কাজ বা বদ কাজ করে আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছিল সেদিন তাকে তা জানিয়ে দেয়া হবে। আর দুনিয়াতে সে নিজের ভাল এবং মন্দ কাজের কি ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে এসেছিল যা তার দুনিয়া ছেড়ে চলে আসার পরও পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত চলেছিল সে হিসেবও তার

لَا تَحِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝ إِنَّ عَلَيْنَا جَمِيعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ  
فَاتَّبَعَ قَرَآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ۝ كَلَابِلَ تَحْبُونَ الْعَاجِلَةَ ۝ وَتَنْرُونَ  
الْآخِرَةَ ۝ وَجْهَ يَوْمَئِنْ نَاصِرٍ ۝ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرٌ ۝ وَرَجُوْهَ يَوْمَئِنْ بَاسِرَةَ ۝

হে নবী,<sup>১১</sup> এ অহীকে দ্রুত আয়ত করার জন্য তোমার জিহবা দ্রুত সঞ্চালন করো না। তা মুখস্ত করানো ও পড়ানো আমারই দায়িত্ব। তাই আমি যখন তা পড়ি<sup>১২</sup> তখন এর পড়া মনযোগ দিয়ে শুনবে। অতপর এর অর্থ বুবিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব।<sup>১৩</sup> কথখনো না<sup>১৪</sup> আসল কথা হলো, তোমরা দ্রুত লাভ করা যায় এমন জিনিসকেই (অর্থাৎ দুনিয়া) তালবাস এবং আখেরাতকে উপেক্ষা করে থাক।<sup>১৫</sup> সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা তরতাজা থাকবে।<sup>১৬</sup> নিজের রবের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখবে।<sup>১৭</sup> আর কিছু সংখ্যক চেহারা থাকবে উদাস-বিরণ।

সামনে পেশ করা হবে। দ্বিতীয় অর্থ হলো, তার যা কিছু করা উচিত ছিল অর্থ সে তা করেনি আর যা কিছু করা উচিত ছিল না অর্থ সে তা করেছে তাও সব তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। তৃতীয় অর্থ হলো, যেসব কাজ সে আগে করেছে এবং যেসব কাজ সে পরে করেছে দিন তারিখ সহ তার পূরো হিসেব তার সামনে পেশ করা হবে। চতুর্থ অর্থ হলো, যেসব তাল বা মন্দ কাজ সে করেছে তাও তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। আর যেসব তাল বা মন্দ কাজ করা থেকে সে বিরত থেকেছে তাও তাকে অবহিত করা হবে।

১০. মানুষের সামনে তার আমলনামা পেশ করার উদ্দেশ্য আসলে অপরাধীকে তার অপরাধ সম্পর্কে অবহিত করা নয়। বরং একপ করা জরুরী এই কারণে যে, প্রকাশ্য আদালতে অপরাধের প্রমাণ পেশ করা ছাড়া ইনসাফের দাবী পূরণ হয় না। অত্যেক মানুষই জানে, সে নিজে কি? সে কি, একথা তাকে অন্য কারো বলে দিতে হয় না। একজন মিথ্যাবাদী গোটা দুনিয়াকে ধৌকা দিতে পারে। কিন্তু সে নিজে একথা জানে যে, সে যা বলছে তা মিথ্যা। একজন চোর তার চৌর্যবৃত্তিকে ঢাকার জন্য অসংখ্য কৌশল অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু সে যে চোর তা তার নিজের কাছে গোপন থাকে না। একজন পথদ্রুষ লোক হাজারো প্রমাণ পেশ করে মানুষকে একথা বিশ্বাস করাতে পারে যে, সে যে কুফরী, নাস্তিকতা ও শিরকের সমর্থক তা তার মনের বিশ্বাসভিত্তিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু তার নিজের বিবেক একথা তাল করেই জানে যে, সে ঐ সব আকীদা-বিশ্বাসকে আৰক্ষে ধরে আছে কেন এবং তার মধ্যকার ভুল বুঝতে ও মেনে নিতে কিসে তাকে বাধা দিচ্ছে? জালেম, অসচরিত্র, দুর্কর্মশীল এবং হারামখোর মানুষ নিজের অপকর্মের পক্ষে নানা রকম ওজর-আপন্তি ও কৌশল পেশ করে নিজের বিবেকের মুখ পর্যন্ত বক্ষ করার চেষ্টা চালাতে পারে যাতে বিবেক তাকে তিরস্তার করা থেকে বিরত থাকে এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, সভিকারভাবেই কিছু বাধ্যবাধকতা, কিছু বুহস্তর কল্পন এবং কিছু অনিবার্য প্রয়োজনে সে এসব করছে। কিন্তু তা সন্ত্রেণ সর্বাবস্থায় তার এটা জানা থাকে যে,

সে কার প্রতি কতটা জুলুম করেছে, কার হক মেরে খেয়েছে, কার সতীত্ব নষ্ট করেছে, কাকে প্রতারণা করেছে এবং কোনু অবৈধ পছ্যায কি কি স্থার্থ উদ্ধার করেছে। তাই আবেরাতের আদালতে হাজির করার সময় প্রত্যেক কাফের, মুনাফিক, পাপী ও অপরাধী নিজেই বুঝতে পারবে যে, সে কি কাজ করে এসেছে এবং কোন অবস্থায নিজ প্রভূর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

১১. এখান থেকে শুরু করে “এর অর্থ বুবিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব” কথাটি পর্যন্ত পুরা বাক্যটি একটি ভিন্ন প্রসংগের বাক্য, যা মূল কথার ধারাবাহিকতা ছিল করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সরোধন করে বলা হয়েছে। আমরা সূবার ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি যে, নবুওয়াতের প্রাথমিক ঘূণ—যে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অহী গ্রহণ করার অভ্যাস পুরোপুরি রঙ হয়নি—যখন তাঁর ওপর অহী নাযিল হতো তখন তিনি আশংকা করতেন যে, আল্লাহর যে বাণী জিবরাস্তল আলাইহিস সালাম তাঁকে শুনাচ্ছেন তা হয়তো তিনি ঠিকমত স্ফূর্তিতে ধরে রাখতে পারবেন না। তাই অহী শোনার সাথে সাথে তিনি তা মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন। জিবরাস্তল আলাইহিস সালাম যখন সূরা কিয়ামার এ আয়াতগুলো তাঁকে শুনাচ্ছিলেন তখনও ঠিক একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই কথার ধারাবাহিকতা ছিল করে তাঁকে বলা হয় যে, আপনি অহীর কথা মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন না, বরং গভীর মনযোগ সহকারে তা শুনতে থাকুন। তা অরণ করানো এবং পরবর্তী সময়ে আপনাকে তা পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। আপনি নিশ্চিত থাকুন, এ বাণীর একটি শব্দও আপনি তুলবেন না এবং তা উচ্চারণ করা বা পড়ার ব্যাপারে আপনার কোন ভুল হবে না। এ নির্দেশনায়া দেয়ার পর পুনরায় মূল কথার ধারাবাহিকতা “কখনো না, আসল কথা হলো” কথাটি দ্বারা শুরু হয়েছে। যারা এ পটভূমি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় তারা এখানে এ বাক্যাংশ দেখে মনে করে যে, এখানে একথাটি একেবারেই খাপ ছাড়। কিন্তু এ পটভূমি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কথার মধ্যে কোন অসংলগ্নতা আছে বলে মনে হয় না। এর উদাহরণ এভাবে দেয়া যায়, একজন শিক্ষক পাঠদানের সময় হঠাৎ দেখলেন যে, তাঁর ছাত্রের ঘন অন্য কোন দিকে আকৃষ্ট। তাই তিনি পাঠ দানের ধারাবাহিকতা ছিল করে বললেন : “আমার কথা মনযোগ দিয়ে শোন।” এরপর তিনি পুনরায় নিজের কথা শুরু করলেন। এ পাঠ দান যদি হবহ ছাপিয়ে প্রকাশ করা হয় তাহলে যেসব লোক এ ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন তারা বজ্রতার ধারাবাহিকতার মধ্যে একথাটাকে খাপছাড়া মনে করবেন। কিন্তু যে কারণে একথাটি বাকের মধ্যে সংযোজিত হয়েছে যে ব্যক্তি সে আসল ঘটনা সম্পর্কে অবহিত থাকবেন তিনি নিশ্চিত হয়ে যাবেন যে, পাঠ দানের বক্তব্যটি আসলে হবহ উদ্ভৃত করা হয়েছে। তা বর্ণনা বা উদ্ভৃত করতে কোন প্রকার কমবেশী করা হয়নি।

এসব আয়াতের মাঝখানে এ বাক্যাংশটির অপ্রাসঙ্গিকতাবে আন্দারও যে কারণ আমরা উপরে বিশ্বেষণ করেছি তা শুধু অনুমান নির্ভর নয়। বরং নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতসমূহে তার এ একই কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, তাবারানী, বাযহাকী এবং অন্যসব মুহাদিসসগণ বিভিন্ন সনদে হয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আবাসের এ বর্ণনাটি উদ্ভৃত করেছেন যে, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কুরআন নাযিল হতো তখন পাছে তিনি তুলে যান এ ডয়ে

জিবরাইল আলাইহিস সালামের সাথে কথাগুলো বার বার আওড়াতে থাকতেন। তাই বলা হয়েছে..... تَحْرِكْ بِ لَسَانِكَ لَتَعْجَلْ بِهِ ৪ শাব্দী, ইবনে যায়েদ, ঘাহাক, হাসান বাসরী, কাতাদা, মুজাহিদ এবং আরো অনেক বড় বড় মুফাস্সির থেকেও একথাটিই উদ্ভৃত হয়েছে।

১২. জিবরাইল আলাইহিস সালাম যদিও রসূলগ্রাহ সালামাহ আলাইহি ওয়া সালামকে কুরআন পাঠ করে শুনতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি নিজের পক্ষ থেকে তা শুনতেন না, বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পড়ে শুনতেন। তাই একথাটিও আল্লাহ তা'আলাই বলেছেন : "যখন আমি তা পাঠ করতে থাকবো।"

১৩. এ থেকে ধারণা জন্মে যে, সভ্রবত নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগেই অহী নাযিল হওয়ার সময় রসূলগ্রাহ সালামাহ আলাইহি ওয়া সালাম কুরআনের কোন আয়াত অথবা কোন শব্দ অথবা কোন বিষয়ের অর্থ জিবরাইল আলাইহিস সালামের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। তাই তাঁকে শুধু এ নির্দেশই দেয়া হয়েন যে, যখন অহী নাযিল হতে থাকবে তখন নিরবে তিনি তা শুনবেন, কিংবা শুধু এ নিশ্চয়তা ও সান্ত্বনাই দেয়া হয়েন যে, অহীর প্রতিটি শব্দ তাঁর স্মৃতিতে অবিকল সংরক্ষিত করে দেয়া হবে এবং কুরআনকে তিনি ঠিক সেভাবে পাঠ করতে সক্ষম হবেন যেভাবে তা নাযিল হয়েছে। বরং সাথে সাথে তাঁকে প্রতিশ্রূতিও দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি নির্দেশ ও বাণীর মর্ম এবং উদ্দেশ্যও তাঁকে পুরোপুরি বুঝিয়ে দেয়া হবে।

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত। এ আয়াত দ্বারা এমন কয়েকটি মৌলিক বিষয় প্রমাণিত হয়, যা কোন ব্যক্তি ভালভাবে বুঝে নিলে এমন কিছু গোমরাহী থেকে রক্ষা পেতে পারে যা ইতিপূর্বেও কিছুলোক ছড়িয়েছে এবং বর্তমানেও ছড়াচ্ছে।

প্রথমত, এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শুধু কুরআনে লিপিবদ্ধ অহী-ই রসূলগ্রাহ সালামাহ আলাইহি ওয়া সালামের উপর নাযিল হতো না। বরং এ অহী ছাড়াও তাঁর প্রতি আরো অহী নাযিল হতো এবং সে অহীর মাধ্যমে তাঁকে এমন জ্ঞান দেয়া হতো যা কুরআনে লিপিবদ্ধ নেই। তাই কুরআনের হকুম-আহকাম ও নির্দেশাবলী, তাঁর ইংগিত, তাঁর শব্দমালা এবং তাঁর বিশেষ পরিভাষার যে অর্থ ও মর্ম নবী সালামাহ আলাইহি ওয়া সালামকে বুঝানো হতো তা যদি কুরআনের মধ্যেই সংযোজিত থাকবে তাহলে একথা বলার কোন প্রয়োজনই হিল না যে, তাঁর অর্থ বুঝিয়ে দেয়া বা তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেয়া আমারই দায়িত্ব। কারণ এমতাবস্থায় তা আবার কুরআনের মধ্যেই পাওয়া যেতো! অতএব, একথা মানতে হবে যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের শব্দমালা বহির্ভূত অন্য কিছু। এটা "অহীয়ে খফীর" আরো একটি প্রমাণ যা খোদ কুরআন থেকেই পাওয়া যায়। (কুরআন মজীদ থেকে এর আরো প্রমাণ আমি আমার "সুরাত কি আইনী হাইসিয়াত" গ্রন্থের ৯৪-৯৫ এবং ১১৮ থেকে ১২৫ পৃষ্ঠায় তুলে ধরেছি।)

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রসূলগ্রাহ সালামাহ আলাইহি ওয়া সালামকে কুরআনের অর্থ ও মর্ম এবং হকুম-আহকামের যে ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল তা তো এ জন্যই দেয়া হয়েছিল যে, তিনি তদনৃয়ায়ী নিজের কথা ও কাজ দ্বারা মানুষকে কুরআন

বুঝিয়ে দেবেন এবং তার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী কাজ করা শেখাবেন। একথার মর্ম ও অর্থ যদি তা না হয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যদি শুধু এ জন্য এ ব্যাখ্যা বলে দেয়া হয়ে থাকে যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজের কাছেই সে জ্ঞান সীমাবদ্ধ রাখবেন তাহলে এটা হতো একটা অর্থহীন কাজ। কারণ, নবুওয়াতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তা থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যেতো না। সূতরাং কোন নির্বাচনী ক্ষেত্রে একথা বলতে পারে যে, ব্যাখ্যামূলক এ জ্ঞানের শরীয়তের বিধান রচনার ক্ষেত্রে আদৌ কোন ভূমিকা ছিল না। সূরা 'নাহলের' ৪৪ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন :

**وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ**

"হে নবী, আমি তোমার কাছে এ 'মিকর' নায়িল করেছি এ জ্ঞান, যেন তুমি মানুষের জ্ঞান নায়িলকৃত শিক্ষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে থাকো।" (ব্যাখ্যার জ্ঞান দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল নাহল, টিকা ৪০)

কুরআন মজীদের চারটি স্থানে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ শুধু আল্লাহর কিভাবের আয়াতসমূহ শুনিয়ে দেয়াই ছিল না। বরং এ কিভাবের শিক্ষা দেয়াও ছিল তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। (আল বাকারাহ, আয়াত ১২৯ ও ১৫১; আলে ইমরান, ১৬৪ এবং আল জুম'আ, ২। আমি 'সুন্নাত কি আইনী হাইসিয়াত' গ্রন্থে ৭৪ থেকে ৭৭ পৃষ্ঠায় এসব আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি।) এরপর কোন মানুষ কি করে একথা অঙ্গীকার করতে পারে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে কুরআনের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন তা-ই প্রকৃতপক্ষে কুরআনের সঠিক, নির্ভরযোগ্য ও সরকারী ব্যাখ্যা। কেননা, তা তাঁর নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা নয়, বরং কুরআন নায়িলকারী আল্লাহর বলে দেয়া ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে কিংবা তা পাশ কাটিয়ে যে ব্যক্তিই কুরআনের কোন আয়াতের অর্থবা কোন শব্দের মনগড়া অর্থ বর্ণনা করে সে এমন ধৃষ্টতা দেখায় যা কোন ঈমানদার ব্যক্তি দেখাতে পারে না।

তৃতীয়ত, কেউ যদি সাধারণভাবেও কুরআন অধ্যয়ন করে থাকে তাহলেও সে দেখবে যে, তাতে এমন অনেক বিষয় আছে একজন আরবী জানা লোক শুধু কুরআনের শব্দ বা বাক্য পড়ে তার অর্থ বা মর্ম উদ্বার করতে এবং তার মধ্যে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কিভাবে মেনে চলবে তা জানতে পারবে না। উদাহরণ হিসেবে স্লো সোলাত শব্দটির কথাই ধরুন। কুরআন মজীদে যদি ঈমানের পরে অন্য কোন আমলের ওপরে সর্বাধিক গুরুত্বারূপ করা হয়ে থাকে তবে তা হলো সালাত বা নামায। কিন্তু কেবল আরবী ভাষার সাহায্যে কেউ এর অর্থ পর্যন্ত নির্ণয় করতে পারতো না। কুরআন মজীদে এ শব্দটির বার বার উল্লেখ দেখে কেউ বড়জোর এতটুকু বুঝতে সক্ষম যে, আরবী ভাষার এ শব্দটিকে কোন বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর অর্থ সম্ভবত এমন কোন বিশেষ কাজ যা আঞ্জাম দেয়ার জন্য ঈমানদারদের কাছে দাবী জানানো হচ্ছে। কিন্তু শুধু কুরআন পাঠ করে কোন আরবী জানা লোক এ সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হবে না যে, সে বিশেষ কাজটি কি এবং কিভাবে তা আঞ্জাম দিতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, কুরআন

প্রেরণকারী যদি তাঁর পক্ষ থেকে একজন শিক্ষক নিয়োগ করে এ পারিভাষিক অর্থ তাঁকে যথাযথভাবে না বলে দিতেন এবং 'সালাত' আদায় করার নির্দেশ পালনের পক্ষা-পক্ষতি স্পষ্টভাবে তাঁকে না শেখাতেন তাহলে দুনিয়াতে দু'জন মুসলমানও এমন পাওয়া যেতো না যারা শুধু কুরআন পাঠ করে 'সালাত' আদায় করার নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে কোন একটি পক্ষ মেনে নিতে একমত হতে পারতো? দেড় হাজার বছর ধরে মুসলমানরা যে পুরুষাগৃহে একই নিয়ম ও পক্ষায় নামায পড়ে আসছে এবং দুনিয়ার আনাচে-কানাচে কোটি কোটি মুসলমান একই নিয়ম-পক্ষায় যেতাবে নামাযের হকুম পালন করছে তার কারণ তো শুধু এই যে, মহান আল্লাহ অহীর মাধ্যমে শুধু কুরআনের শব্দ বা বাক্যই নায়িল করেননি। বরং ঐ সব শব্দ এবং বাক্যের অর্থ এবং মর্মও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরোপুরি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আর যারা তাঁকে আল্লাহর রসূল এবং কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন তিনি সেসব লোককেই এর অর্থ ও মর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন।

চতুর্থত, কুরআনের শব্দসমূহের যে ব্যাখ্যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে (সা) বুঝিয়েছেন এবং রসূল (সা) তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে উপস্থিতকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, হাদীস এবং সুনাত ছাড়া তা জানার আর কেন উপায় আমাদের কাছে নেই। হাদীস বলতে বুঝায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজ সম্পর্কে যেসব বর্ণনা সনদসহ তৎকালীন লোকদের নিকট থেকে আমাদের কালের লোকদের পর্যন্ত পৌছেছে। আর সুনাত বলতে বুঝায় সেসব নিয়ম-কানুনকে যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৌখিক ও বাস্তব শিক্ষার দ্বারা মুসলিম সমাজের ব্যক্তিগত ও সামরিক জীবনে চালু হয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ নির্তরযোগ্য রেওয়ায়াতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী লোকদের নিকট থেকে প্রবর্তী লোকেরা লাভ করেছে এবং প্রবর্তী যুগের লোকেরা পূর্ববর্তী যুগের লোকদের মধ্যে তা কার্যকর হতে দেখেছে। জ্ঞানের এ উৎসকে যে ব্যক্তি অঙ্গীকার করে প্রকারাত্মে সে যেন একথাই বলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে (সা) কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝিয়ে দেয়ার যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তা পূরণ করতে (না'উয়ুবিল্লাহ) তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, শুধু রসূলকে ব্যক্তিগতভাবে কুরআনের অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছিল না। বরং এর উদ্দেশ্য ছিল রসূলের মাধ্যমে উপস্থিতকে আল্লাহর কিতাবের অর্থ বুঝানো। হাদীস ও সুনাত আইনের উৎস একথা অঙ্গীকার করলে আপনা থেকেই তাঁর অনিবার্য অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা সে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। না'উয়ুবিল্লাহ! এর জবাবে যারা বলে যে, অনেক লোক তো মিথ্যা হাদীস রচনা করেছিল, তাকে আমরা বলবো, মিথ্যা হাদীস রচনা করাই সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে গোটা মুসলিম উম্মাহ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজকে আইনের মর্যাদা দান করতো। তা না হলে গোমরাহী বিস্তারকারীদের মিথ্যা হাদীস রচনার প্রয়োজন হবে কেন? মুদ্রা জালকারীরা কেবল সে মুদ্রাই জাল করে যা বাজারে চালু থাকে। বাজারে যেসব নোটের কোন মূল্য নেই কে এমন নির্বোধ আছে যে, সেসব নোট জাল করে ছাপাবে? তাহাও এ ধরনের কথা যারা বলে তারা হয়তো জানে না যে, যে পবিত্র সত্তার (সা) কথা ও কাজ আইনের মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর সাথে যাতে কোন মিথ্যা কথা সম্পর্কিত হতে না পারে প্রথম দিন থেকেই মুসলিম উম্মাহ গুরুত্বসহ সে ব্যবহা নিয়েছিলেন। এ পবিত্র

সন্তার (সা) প্রতি কোন মিথ্যা কথা আরোপের আশংকা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল এ উচ্চতের কল্যাণকারীরা তত অধিক মাত্রায় কঠোর ব্যবহাৰ গ্ৰহণ কৰছিলেন সত্য ও মিথ্যাকে আলাদা কৰে চিহ্নিত কৰাৰ জন্য। সত্য ও মিথ্যা হাদীস পৃথকীকৰণেৰ এ জন্য এমন একটি অভুত পৰ্যায়েৰ জ্ঞান যা একমাত্ৰ মুসলিম জাতি ছাড়া আজ পৰ্যন্ত পৃথিবীৰ আৱ কেউ আবিষ্কাৰ কৰেনি। যারা এ জ্ঞান অৰ্জন না কৰেই শুধু মাত্ৰ পাচাত্যেৰ প্রাচ্যবিদদেৱ প্ৰতাৱণা ও প্ৰলোভনেৰ শিক্কাৱ হয়ে হাদীস ও সুন্নাতকে অনৰ্ত্তৰযোগ্য সাৰ্বজন কৰে এবং একথাও জানে না যে, তাৱা তাদেৱ এ মূখ্যতন্ত্ৰৰ ধৃষ্টতা দ্বাৰা ইসলামেৰ কত মাৰাত্তক ক্ষতি সাধন কৰছে। তাৱা আসলেই বড় হতভাগা।

১৪. মাবেৰ অপ্রাসংগিক কথাটিৰ আগে বজব্যেৰ যে ধাৰাবাহিকতা ছিল এখনে এসে আৰাবৰ সে ধাৰাবাহিকতা শুলু হয়েছে। কথ্যনো না, অৰ্থ হলো, তোমাদেৱ আখেৱাতকে অৰ্হীকাৱ কৰাৰ আসল কাৱণ এটা নয় যে, বিশ্ব-জাহানেৰ সৃষ্টিকৰ্তা কিয়ামত সংঘটিত কৰতে কিংবা মৃত্যুৰ পৱ তোমাদেৱকে আৰাবৰ জীবিত কৰতে পাৱবেন না বলে তোমৱা মনে কৱো বৱেং আসল কাৱণ হলো এটি।

১৫. এটি আখেৱাতকে অৰ্হীকাৱ কৰাৰ দ্বিতীয় কাৱণ। প্ৰথম কাৱণটি ৫৬ং আয়াতে বৰ্ণনা কৱা হয়েছিল। কাৱণটি হলো, মানুষ যেহেতু অবাধে পাপাচাৱ চালাতে চায় এবং আখেৱাতকে মনে নিলে অনিবার্যজন্মে যেসব নৈতিক বিধিবন্ধন মনে চলার দায়িত্ব বৰ্তায় তা থেকে বীচতে চায়। তাই তাৱা কুপবৃত্তি তাকে আখেৱাতকে অৰ্হীকাৱ কৰতে উন্মুক্ত কৰে এবং তাৱা এ অৰ্হীকৃতিকে যুক্তিসংহাত বলে প্ৰমাণ কৰাৰ জন্য সে সুন্দৰ কৰে সাজিয়ে যৌক্তিক প্ৰমাণাদি পেশ কৰে। এখন দ্বিতীয় কাৱণটি বৰ্ণনা কৱা হচ্ছে। আখেৱাত অৰ্হীকাৱকাৰীৱা যেহেতু সংকীৰ্ণমনা ও ব্ৰহ্মবৃত্তি সম্পৰ্ক হয় তাই তাদেৱ দৃষ্টি কেবল এ দুনিয়াৰ ফলাফলেৰ প্ৰতি নিবন্ধ থাকে। আৱ আখেৱাতে যে ফলাফলেৰ প্ৰকাশ ঘটবে তাকে তাৱা আদৌ কোন গুৰুত্ব দেয় না। তাৱা মনে কৰে, যে স্বাৰ্থ বা তোগেৱ উপকৰণ বা আনন্দ এখনে লাভ কৱা সম্ভব তাৱেই অৰ্বেষণে সবটুকু পৱিত্ৰণ কৱা এবং প্ৰচেষ্টা চালানো উচিত। কাৱণ, তা যদি তাৱা লাভ কৰে তাহলে যেন সবকিছুই তাৱা পেয়ে গেল। এতে আখেৱাতে তাদেৱ পৱিত্ৰণ যত খারাপই হোক না কেন। একইভাৱে তাৱা এ ধাৱণাও পোষণ কৰে যে, যে ক্ষতি, কষ্ট বা দুঃখ-বেদনা এখনে হবে তা থেকে মূলত নিজেদেৱ রক্ষা কৰতে হবে। এ ক্ষেত্ৰে দেখাৰ দৱকাৰ নেই যে, তা বৱদাশত কৰে নিলে আখেৱাতে তাৱ বিনিময়ে কত বড় পুৱন্ধাৱ লাভ কৱা যাবে। তাৱা চায় নগদ সওদা। আখেৱাতেৰ মত বহু দূৰেৱ জিনিসেৰ জন্য তাৱা আজকেৱ কোন স্বাৰ্থ যেমন ছাড়তে চায় না তেমনি কোন ক্ষতিও বৱদাশত কৰতে পাৱে না। এ ধৱনেৰ চিত্তাধাৱা নিয়ে যখন তাৱা আখেৱাত সম্পর্কে যৌক্তিক বিভক্তে অবতীৰ্ণ হয় তখন আৱ তা কৰ্ণি যুক্তিবাদ থাকে না। বৱেং তখন তাৱ শেছনে এ ধ্যান-ধ্যানণাটিই কাজ কৰতে থাকে। আৱ সে কাৱণে সৰ্বাবহুয়া তাৱ সিদ্ধান্ত এটাই থাকে যে, আখেৱাতকে মানা যাবে না। যদিও ভেতৱ থেকে তাৱ বিবেক চিত্কাৱ কৰে বলতে থাকে যে, আখেৱাত সংঘটিত হওয়াৰ সম্ভাবনা এবং তাৱ অনিবার্যতা সম্পৰ্কে কুৱানে যেসব দলীল-প্ৰমাণ পেশ কৱা হয়েছে তা অত্যন্ত যুক্তিসংগত আৱ তাৱ বিপক্ষে যেসব যুক্তি তাৱা দেখাছে তা অত্যন্ত তৌতা ও অস্তসাৱ-শূন্য।

১৬. অর্থাৎ খুশীতে তারা দীপ্তিময় হয়ে উঠবে। কারণ, তারা যে আখেরাতের প্রতি ইমান এনেছিল তা হবহ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী চোখের সামনে বিদ্যমান থাকবে। যে আখেরাতের প্রতি ইমান আনার কারণে তারা দুনিয়ার যাবতীয় অবৈধ স্বার্থ পরিভ্যাগ করেছিল এবং সত্ত্বিকার অর্থেই ক্ষতি স্বীকার করেছিল তা চোখের সামনে বাস্তবে সংঘটিত হতে দেখে নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তারা নিজেদের জীবনচরণ সম্পর্কে অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এখন তার সর্বোভ্যুম ফলাফল দেখার সময় এসে গেছে।

১৭. মুফাস্সিরগণের কেউ কেউ একথাটিকে রূপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন : “কারো প্রতি তাকিয়ে থাকা” কথাটি প্রচলিত প্রবাদ হিসেবে তার কাছে কোন কিছু আশা করা, তার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করা এবং তার দয়া প্রাপ্তি হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। এমন কি অঙ্গ ব্যক্তিও অনেক সময় বলে যে, আমি তো অমুকের দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি আমার জন্য কি করেন তা দেখার জন্য। কিন্তু বহু সংখ্যক হাদীসে এর যে ব্যাখ্যা রসূলগ্রাহ সান্নাগ্রাহ আলাইহি ওয়া সান্নাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তাহলো, আখেরাতে আপ্তাহর নেক্কার বান্দাদের আগ্রাহৰ সাক্ষাত সাতের সৌতাগ্য হবে। বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে : **أَنْكُمْ سَتَرْفَنَ رِبْكُمْ عَيْنَانِ** “তোমরা প্রকাশে সুস্পষ্টভাবে তোমাদের রবকে দেখতে পাবে।” মুসলিম এবং তিরমিয়ীতে হ্যরত সুহাইব থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী সান্নাগ্রাহ আলাইহি ওয়া সান্নাম বলেছেন : বেহেশতবাসীরা বেহেশতে প্রবেশ করার পর আগ্রাহ তা’আলা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের আরো কিছু দান করি? তারা আরয় করবে, আপনি কি আমাদের চেহারা দীপ্তিময় করেননি? আপনি কি আমাদের জানাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেননি? তখন আগ্রাহ তা’আলা পর্দা সরিয়ে দেবেন। ইতিপূর্বে তারা যেসব পুরুষার লাভ করেছে তার কোনটিই তাদের কাছে তাদের ‘রবের’ সাক্ষাত্তাতের স্থান ও সৌতাগ্য থেকে অধিক প্রিয় হবে না। এটিই সে অভিরিক্ষ পুরুষার যার কথা কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে : **لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ** অর্থাৎ “যারা নেক কাজ করেছে তাদের জন্য উন্নয় পুরুষার রয়েছে। আর এ ছাড়া অভিরিক্ষ পুরুষারও রয়েছে।” (ইউনুস, ২৬) বুখারী ও মুসলিমে হ্যরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হ্যরত আবু হরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জিজ্ঞেস করলেন : হে আগ্রাহৰ রসূল, আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাবো? জবাবে নবী (সা) বললেন : যখন মেঘের আড়াল থাকে না তখন সূর্য ও চাঁদকে দেখতে তোমাদের কি কোন কষ্ট হয়? সবাই বললো ‘না।’ তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের রবকে এ রকমই স্পষ্ট দেখতে পাবে। বুখারী ও মুসলিমে হ্যরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে এ বিষয়ের প্রায় অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ, তিরমিয়ী, দারকুতনী, ইবনে জারীর, ইবনুল মুন্যির, তাবরানী, বায়হাকী, ইবনে আবী শায়বা এবং আরো কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস কিছুটা শান্তিক তারতম্যসহ হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের একটি বর্ণনা উদ্ভৃত করেছেন, যার বিষয়বস্তু হলো, জানাতবাসীদের মধ্যে সর্বনিম্ন মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিও দুই হাজার বছরের দূরত্ব পর্যন্ত তার সাম্রাজ্যের বিস্তার দেখতে পাবে এবং সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি প্রতিদিন দুই বার তার রবকে দেখতে পাবে। একথা বলার পর নবী সান্নাগ্রাহ আলাইহি ওয়া সান্নাম এ আয়াতটি পাঠ করলেন যে, ‘সেদিন কিছু সংখ্যক চেহারা তরতজা থাকবে। নিজের রবের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখবে।’ ইবনে মাজাতে হ্যরত

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি তাকাবেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি তাকাবে। অতপর যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে অন্তর্হিত না হবেন ততক্ষণ তারা জাগ্রাতের কোন নিয়ামতের প্রতি মনযোগ দেবে না এবং আল্লাহর প্রতি তাকিয়ে থাকবে। এটি এবং অন্য আরো বহু হাদীসের ভিত্তিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ প্রায় সর্বসমতভাবেই এ আয়াতের যে অর্থ করেন তাহলো, জাগ্রাতবাসীগণ অবেরাতে মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে। কুরআন ক্লান্তের এ আয়াত থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। **بِمِنْ رَبِّكُمْ يُرْمَنُونَ** “কথ্যনো নয়, তারা (অর্থাৎ পাশীগণ) সেদিন তাদের রাবের সাক্ষাৎ থেকে বক্ষিত হবে।” (আল মুতাফিফীন, ১৫) এ থেকে স্বতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এ বশ্বনা হবে পাপীদের জন্য, মেক্কারদের জন্য নয়।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। তাহলো, মানুষের পক্ষে আল্লাহকে দেখা কিভাবে সম্ভব? কোন জিনিসকে দেখতে পাওয়ার জন্য যা অনিবার্যরূপে প্রয়োজন তাহলো, সে জিনিসটিকে কোন বিশেষ দিক, হান, আকৃতি ও বর্ণ নিয়ে সামনে বিদ্যমান থাকতে হবে। আলোক রশ্মি তাতে প্রতিফলিত হয়ে চোখের উপর পড়বে এবং চোখ থেকে তার ছবি বা প্রতিবিবি মন্ডিলের দর্শনকেন্দ্রে পৌছবে। মানুষের আল্লাহ রাবুল আলামীনের পরিপ্রেক্ষাকে এভাবে দেখতে পাওয়ার কল্পনাও কি করা যায়? কিন্তু এ ধরনের প্রশ্ন মূলত একটি বড় ভাস্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ক্ষেত্রে দু'টি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। একটি হলো, দেখার তাৎপর্য। আর অপরটি হলো দেখার কাজটি সংযুক্ত হওয়ার সেই বিশেষ অবস্থা বা প্রক্রিয়াটি যার সাথে আমরা এ পৃথিবীতে পরিচিত। দেখার তাৎপর্য হলো, দর্শনকারী ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্টিশক্তি থাকতে হবে। অর্থাৎ সে অঙ্গ হবে না। দৃশ্যমান বস্তু তার কাছে স্পষ্ট হবে, অদৃশ্য বা চোখের আড়াল হবে না। কিন্তু দুনিয়াতে আমরা যে জিনিসের অভিজ্ঞতা লাভ করি বা তা পর্যবেক্ষণ করে থাকি তা দেখার সে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয় যার সাহায্যে কোন মানুষ বা পশু কার্যত কোন জিনিসকে দেখে থাকে। এ জন্য অনিবার্যরূপে যা প্রয়োজন তা হলো, দর্শনকারীর দেহে চোখ নামক একটি অংগ থাকবে। সে অংগটিতে দেখার শক্তি বর্তমান থাকবে। তার সামনে একটি সমীম রঙিন বা বর্ণময় দেহ বিদ্যমান থাকবে যা থেকে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে চোখের পর্দার উপর পড়বে এবং চোখের পর্দায় তার আকৃতির স্থান সংকুলান হতে হবে। এখন যদি কেউ মনে করে যে, দেখতে পাওয়ার মূলে এ দুনিয়াতে যে প্রক্রিয়াটি কার্যকর বলে আমরা জানি শুধু সে প্রক্রিয়াতেই দেখার কাজটি কার্যত প্রকাশ পেতে বা ঘটতে পারে তাহলে তা তার নিজের মন-ঘণ্টা তথা ধী-শক্তির সংরক্ষণ। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার নিজের সাম্রাজ্যে দেখার জন্য এত অসংখ্য উপায় ও প্রক্রিয়া থাকা সম্ভব যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এ প্রশ্ন নিয়ে যে ব্যক্তি বিতর্কে লিঙ্গ হয় সে নিজেই বনুক, তার রব চক্ষুশ্যান না অঙ্গ? তিনি যদি চক্ষুশ্যান তথা দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন এবং গোটা বিশ্ব-জ্ঞান ও তার প্রতিটি বস্তু দেখে থাকেন তাহলে কি তিনি চোখ নামের একটি অংগ দিয়ে দেখছেন যা দিয়ে দুনিয়ায় মানুষ ও অন্য সব জীবজন্ম দেখে থাকে এবং আমাদের দ্বারা যেভাবে দেখার কাজটা সংযুক্ত হচ্ছে তাঁর দ্বারাও কি সেভাবেই সংঘটিত হচ্ছে? সবাইই জানা যে, এর জবাব হবে নেতৃত্বাচক। এর জবাব যখন নেতৃত্বাচক, তখন কোন বিবেক ও বোধ সম্পর্ক মানুষের একথা বুঝতে কষ্ট হবে কেন যে, দুনিয়ায় মানুষ যে নির্দিষ্ট

١٦٠ تَطْنِي أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ۚ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ ۗ وَقِيلَ مَنْ عَنْ رَأْقٍ  
وَظَنَ أَنَّهُ الْغِرَاقُ ۗ وَالنَّفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۗ إِلَى رِبْكَ يَوْمَئِنْ الْمَسَاقِ

মনে করতে থাকবে যে, তাদের সাথে কঠোর আচরণ করা হবে। কথ্যনো না,<sup>১৮</sup> যখন প্রাণ কঠনালীতে উপনীত হবে এবং বলা হবে, ঝাড় ফুক করার কেউ আছে কি?<sup>১৯</sup> মানুষ বুঝে নেবে এটা দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময়। উভয় পায়ের গোছা বা নলা একত্র হয়ে যাবে।<sup>২০</sup> সেদিনটি হবে তোমার প্রভূর কাছে যাত্রা করার দিন।

প্রক্রিয়ায় কোন জিনিসকে দেখে থাকে জাগ্রাতবাসীগণ সে নিদিষ্ট প্রক্রিয়ায় আল্লাহর দর্শন লাভ করবেন না। বরং সেখানে দেখার ধরন, প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া হবে অন্য রকম যা এখানে আমাদের পক্ষে জানা সত্ত্ব নয়। দাস্পত্য জীবন কি এবং কেমন একটি দুই বছরের শিশুর পক্ষে তা বুঝা যতটা কঠিন, প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের সবকিছু সঠিকভাবে বুঝা আমাদের জন্য তার চেয়েও অনেক বেশী কঠিন। অথচ যৌবনে উপনীত হয়ে এ শিশু নিজেই দাস্পত্য জীবন যাপন করবে।

১৮. এ ‘কথ্যনো না’ কথাটি সেই ধারাবাহিক কথাটির সাথে সম্পৃক্ত যা আগে থেকে চলে আসছে। অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ভুল যে, তোমরা মনে বিশীন ও নিচিহ্ন হয়ে যাবে এবং নিজ প্রভূর সামনে তোমাদের ফিরে যেতে হবে না।

১৯. মূল আয়তে **رَأَيْتَ** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি **ধাতু** থেকেও উৎপন্ন হতে পারে। এর অর্থ তাৰীজ-কবচ এবং ঝাড়-ফুক। আবার **رَأَيْتَ** ধাতু থেকেও উৎপন্ন হতে পারে। এর অর্থ ওপর দিকে ঘোঁটা। যদি প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে যা বুঝাবে তাহলো, শেষ মুহূর্তে যে সময় গ্রোগীর সেবা শুঙ্খাকারীরা সব রকমের উষ্ণ প্রতি সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যাবে তখন বলবে : আবে, কোন ঝাড় ফুককারীকেই অস্ত খুজে আনো যে এর জীবনটা রক্ষা করবে। আবার যদি দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে যা বুঝাবে তা হলো, সে সময় ফেরেশতারা বলবে : কে এ ঝুঁটা নিয়ে যাবে? আয়াবের ফেরেশতারা না রহমতের ফেরেশতারা? অন্য কথায় সে সময় সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, ঐ বাস্তি আখেরাতের দিকে কি মর্যাদা নিয়ে যাত্রা করছে। সৎ মানুষ হলে রহমতের ফেরেশতারা নিয়ে যাবে। অসৎ মানুষ হলে রহমতের ফেরেশতারা তার ছায়াও মাড়াবে না। আয়াবের ফেরেশতারাই তাকে পাকড়াও করে নিয়ে যাবে।

২০. তাফসীরকারদের অনেকেই **سَاق** (পায়ের নলা) শব্দটির সাধারণ আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। এ হিসেবে কথাটির অর্থ হয় মরার সময় যখন পা শুকিয়ে একটি আরেকটির সংগে লেগে যাবে। আবার কেউ কেউ প্রচলিত আরবী বাকরীতি অনুসারে শব্দটিকে কঠোরতা, রুচ্ছতা ও বিপদাপদ অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ সে সময় দুঁটি বিপদ একসাথে এসে হাজির হবে। একটি এ পুঁথিবী এবং এর সবকিছু থেকে বিছির হয়ে যাওয়ার বিপদ। আরেকটি, একজন অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার হয়ে পরকালীন জগতে যাওয়ার বিপদ। আরেকটি, একজন অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার হয়ে পরকালীন জগতে যাওয়ার মুখোমুখি হতে হবে প্রত্যেক কাফের মুনাফিক এবং পাপীকে।

فَلَا مُلْقٰ وَلَا مُلْقٰ وَلِكَنْ كَذَبٌ وَتَوْلٰيٌ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ  
 يَتَمَطِّيٌّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَىٰ آيَ بِحَسْبِ الْإِنْسَانَ  
 أَنْ يَتَرَكَ سَلَّىٰ الْمَرِيكَ نُطْفَةً مِنْ مِنْيٍ بِمِنْيٍ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً  
 فَخَلَقَ فَسَوْيٌ فَجَعَلَ مِنْهُ الرِّزْقَيْنِ الَّذِي كَرَّ وَالْأَنْشَىٰ أَلِيسَ  
 ذَلِكَ بِقُلْ رَعِيَ أَنْ يَحْيِي الْمَوْتَىٰ

## ২ রূক্ষ'

কিন্তু সে সত্যকে অনুসরণও করেনি। নামাযও পড়েনি। বরং সে অঙ্গীকার  
 করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারপর গবিত ভঙ্গিতে নিজের পরিবার পরিজনের  
 কাছে ফিরে গিয়েছে।<sup>২১</sup> এ আচরণ তোমার পক্ষেই শোভনীয় এবং তোমার পক্ষেই  
 মানানসই। হাঁ, এ আচরণ তোমার পক্ষেই শোভনীয় এবং তোমার পক্ষেই  
 মানানসই।<sup>২২</sup>

মানুষ<sup>২৩</sup> কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? <sup>২৪</sup> সে কি বীর্যরূপ  
 এক বিন্দু নগণ্য পানি ছিল না যা (মায়ের জরাযুতে) নিষ্কিঞ্চ হয়। অতপর তা মাংস-  
 পিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তার সুন্দর দেহ বানালেন এবং তার  
 অং-প্রত্যাংগন্তে সুসামঝস্য করলেন। তারপর তা থেকে নারী ও পুরুষ দু' রকম  
 মানুষ বানালেন। সেই মুঠো কি মৃতদের পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন?<sup>২৫</sup>

২১. অর্থ হলো, যে ব্যক্তি আথেরাতকে মানতে প্রস্তুত ছিল না সে পূর্ব বর্ণিত  
 আয়াতগুলোতে উল্লেখিত সবকিছু শোনার পরেও তা অঙ্গীকার করে যেতে থাকলো এবং  
 এসব আয়াত শোনার পর দর্শ তরে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল। মুজাহিদ, কাতাদা ও  
 ইবনে যায়েদের মতে এ লোকটি ছিল আবু জেহেল। আয়াতের শব্দসমূহ থেকেও এটাই  
 প্রকাশ পায় যে, সে এমন কোন ব্যক্তি ছিল যে সূরা কিয়ামার উপরে বর্ণিত আয়াতগুলো  
 শোনার পর এ আচরণ ও কর্মপর্হা গ্রহণ করেছিল।

এ আয়াতের “সে সত্যকে অনুসরণও করেনি, নামাযও পড়েনি” কথাটি বিশেষভাবে  
 মনযোগলাভের যোগ্য। এর থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ও তাঁর  
 কিতাবের সত্যতা স্বীকার করার পর তার প্রাথমিক এবং অনিবার্য দাবী হলো, মানুষ যেন  
 নামায পড়ে। আল্লাহর দেয়া শরীয়াতের অন্য সব ইকুম-আহকাম তামীল করার পর্যায় বা  
 অবকাশ তো আসে আরো পরে। কিন্তু ইমান আনার পর কিছু সময় যেতে না যেতেই  
 নামাযের সময় এসে হাজির হয়। আর তখনই জানা যায় সে যা মেনে নেয়ার অঙ্গীকার মুখ

থেকে উচ্চারণ করেছিল তা সত্যিই তার হৃদয়ের প্রতিমনি, না কি কয়েকটি শব্দের আকারে মুখ থেকে উচ্চারিত ফোকা বুলি মাত্র।

২২. تَأْفِسِيرَكَارَغَنْ أُولَى لَكَ آيَاتَهُ شَرِيكَتِي অর্থ বর্ণনা করেছেন। যেমন, ঠিক তোমাকে। সর্বনাশ হোক তোমার! মন্দ, খৎস এবং দুর্ভাগ্য হোক তোমার! তবে বাক্যটির অবস্থান বিবেচনা করলে আমার মতে এর দু'টি উপযুক্ত অর্থ হতে পারে যা হাফেয় ইবনে কাসীর তার তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ স্তুমি যখন তোমার সৃষ্টিকর্তাকে অধীকার করার ধৃষ্টা দেখিয়েছো তখন তোমার মত মানুষের পক্ষে এ আচরণই শোতা পায় যা স্তুমি করছো।” এটি একটি শ্রেষ্ঠ বাক্য। কুরআন মজীদের আরো এক জায়গায় এ ধরনের বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দোষখে আয়াব দেয়ার সময় পাপী লোকদের বলা হবে : دُقْ: أَنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ “নাও, এর মজা চাখো। স্তুমি অতি বড় সমানী মানুষ কিন্না।” (আদ দুখান, ৪৯)

২৩. এখানে বক্তব্যের সমাপ্তি টানতে গিয়ে সেই একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে যা দিয়ে বক্তব্য শুরু করা হয়েছিল। অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জীবন অনিবার্যও এবং তা সম্ভবও।

২৪. أَبْلَ سَدِّي আরবী ভাষায় বলা হয় এমন উটকে যা বেঁধে রাখা হয় না, উদ্দেশ্যহীনভাবে যত্নত্ব দ্বারে বেড়ায়, এবং তার খৌজ-খবর নেয়ার কেউ থাকে না। লাগামহীন উট বলে আমরা এ অর্থটিই প্রকাশ করে থাকি। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো, মানুষ কি নিজেকে লাগামহীন উট মনে করে যে, তার স্মষ্টা তাকে এ পৃথিবীতে দায়িত্বহীন করে ছেড়ে দিয়েছেন? তার কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য নেই? কোন জিনিস তার জন্য নিষিদ্ধ নয়? আর এমন কোন সময়ও কি তার আসবে না যখন তাকে তার কাজ-কর্মের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে? একথাটিই কুরআন মজীদের অন্য একশানে এভাবে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আন্তাহ তা’আলা কাফেরদের বলবেন :

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْئًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

“তোমরা কি মনে করেছো যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি? তোমাদেরকে কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না!” (আল মু’মিনুন, ১১৫)

এ দু'টি স্থানে মৃত্যুর পরের জীবনের অনিবার্যতার প্রমাণ প্রশ্নের আকারে পেশ করা হয়েছে। প্রশ্নের সারমর্ম হলো, তোমরা কি প্রকৃতই নিজেদেরকে নিছক পশ্চ বলে মনে করে নিয়েছো? তোমরা কি তোমাদের ও পশ্চদের মধ্যে এ স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পাও না যে, পশ্চদের কোন ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা নেই, কিন্তু তোমাদের ইখতিয়ার ও স্বাধীনতা আছে? পশ্চর কাজ-কর্মে নৈতিক ভাল-মন্দের প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু তোমাদের কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন অনিবার্যরূপে ওঠে। এসব সম্বন্ধে তোমরা নিজেদের ব্যাপারে কি করে মনে করতে পারলে যে, পশ্চরা যেমন দায়িত্বযুক্ত, তাদের যেমন কোন জবাবদিহি করতে হবে না, তোমাদের ব্যাপারটাও ঠিক তাই? পশ্চদের পুনরায় জীবিত করে না উঠানোর যুক্তিশাহ কারণ বুঝা যায়। তারা তাদের সহজাত ও প্রকৃতিগত ধরাবাঁধা দাবী পূরণ করেছে মাত্র। নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে কোন দর্শন রচনা করেনি, কোন

বিশেষ মত ও পথের অনুসারী গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেনি, কাউকে উপাস্য বানায়নি এবং নিজেও কারো উপাস্য হয়নি, এমন কোন কাজ করেনি যাকে নেক্কাজ বা বদকাজ বলে অভিহিত করা যায়। কোন ভাল বা মন্দ রীতি-প্রথার প্রচলন করেনি যার প্রতাব পুরুষাঙ্গুক্রমে চলেছে এবং সে জন্য সে পুরুষার বা শাস্তিলাভের উপযুক্ত। তাই তারা যদি মরার পর নিষিদ্ধ হয়ে যায় তাহলে সেটা বোধগম্য ব্যাপার। কারণ তার ওপর কোন কাজের দায়-দায়িত্ব বর্তায় না যে, তার জ্বাবদিহির জন্য পুনরায় তাকে জীবিত করে উঠানের প্রয়োজন হবে। কিন্তু তোমাদেরকে মৃত্যুর পরের জীবন থেকে কিভাবে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে? কারণ মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মৃহৃত পর্যন্তও তোমরা এমন সব নৈতিক কাজ-কর্ম করতে থাকো যার ভাল বা মন্দ হওয়া এবং পুরুষার বা শাস্তির উপযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি সিদ্ধান্ত দেয়। যে ব্যক্তি কোন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে এবং পরক্ষণেই আকর্ষিক কোন দৃঢ়টনার শিকার হয়েছে তোমাদের মতে কি তার অবাধে (Scourge) বেঁচে যাওয়া এবং এ জুলুমের প্রতিফল কোন দিনই না পাওয়া উচিত? যে ব্যক্তি দুনিয়ায় এমন কোন বিপর্যয়ের বীজ বপন করে গিয়েছে মানব সন্তানেরা শত শত বছর ধরে যার বিষময় ফল তোগ করলো বা দুর্ভোগ পোহালো সে-ও নগণ্য পোকা মাকড় ও কীট পতঙ্গের মত মৃত্যুর পর বিলীন ও নিষিদ্ধ হয়ে যাক, যার কৃতকর্মের ফলে হাজার হাজার ও লাখ লাখ মানুষের জীবন বরবাদ হয়ে গিয়েছে পুনরায় জীবিত হয়ে তাকে সেসব কৃতকর্মের জ্বাবদিহি করতে না হোক এরূপ ব্যবহায় কি তোমাদের বুদ্ধি-বিবেকে সত্যিই স্বৃষ্টি হতে পারবে? পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জীবন ব্যাপী হক ও ইনসাফ এবং কল্যাণ ও সৎকর্মশীলতার জন্য নিজের জীবনপাত করলো এবং জীবনতর শুধু বিপদ-মুসিবতই পোহালো তোমাদের বিবেচনায় কি সে পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গের মতই কোন নগণ্য সৃষ্টি, যার নিজের ভালকাজের পুরুষার লাভের কোন অধিকারই নেই?

২৫. এটি মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাব্যতার প্রমাণ। যারা একথা বিশ্বাস করে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে বীর্য দ্বারা সৃষ্টির সূচনা করে পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি করা পর্যন্ত গোটা কাজটাই মহান আল্লাহর শক্তি ও কৌশলের একটা বিশ্বয়কর নমুনা, তাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে এ প্রমাণের কোন জ্বাব নেই। কেননা, তারা যতই উদ্বৃত্ত্য দেখাক না কেন তাদের বিবেক-বুদ্ধি একথা না মেনে পারে না যে, যে আল্লাহ এতাবে দুনিয়ায় মানুষ সৃষ্টি করেন তিনি পুনরায় এ মানুষকে অস্তিত্ব দান করতেও সক্ষম। তবে যারা এ স্পষ্ট জ্ঞানগত ও যুক্তিসংগত কাজকে কেবল আকর্ষিকতার ফল বলে মনে করে তারা যদি হঠকারী আচরণ করতে বন্ধপরিকর না হয়ে থাকে তাহলে একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা তাদের দিতে হবে। বিশয়টি হলো, একই ধরনের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর প্রতিটি অংশে প্রত্যেক জাতির মধ্যে নারী ও পুরুষের জন্মের যে অনুপাত চলে আসছে তাতে কোথাও কোন ঝুঁকে এমন অবস্থা কখনো দেখা দেরিনি যে, কোন জনপদ দ্রুমাগত শুধু পুরুষ অথবা শুধু নারীই জন্ম লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে তাদের বংশধারা ঢিকে থাকার কোন সম্ভবনাই থাকেনি। তাদের কাছে এরূপ না হওয়ার কি যুক্তি ও ব্যাখ্যা আছে? এ কাজটিও কি আকর্ষিকভাবেই হয়ে চলেছে? এত বড় দাবী করার জন্য কোন মানুষকে অস্তত এতটা নির্ণজ্ঞ ও বেশরম হওয়া চাই যাতে সে একদিন এ দাবীও করে বসতে পারে

যে, সওন, নিউইয়র্ক, মঙ্গো এবং পিকিং-এর মত শহর আকস্মিকভাবে আপনা আপনি অস্তিত্ব লাভ করেছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আর ঝুম, টাকা ২৭ থেকে ৩০; আশু শুরা, টাকা ৭৭)

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলগ্রাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটি পড়তেন তখন আল্লাহ তা'আলুর এ প্রশ্নের জবাবে কথনো **بَلِّي** (কেন সক্ষম নন), কথনো **سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ فَبِلِّي** (তোমার সত্তা অতি পবিত্র, হে আল্লাহ, কেন সক্ষম নয়) এবং কথনো **سُبْحَنَكَ وَبِلِّي** অথবা **سُبْحَنَكَ فَبِلِّي** অথবা বলতেন। (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও আবু দাউদ) আবু দাউদে হয়রত আবু হরাইরা থেকে এ ঘর্ষে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :  
**إِنَّمَا أَعْلَمُ بِأَعْلَمَ الْحَكَمَيْنِ** (আল্লাহ কি সব  
**بَلِّي وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ نِعَمِكَ** (কেন নয়, আমি বিজ্ঞেও এর একজন সাক্ষিদাতো), সূরা কিয়ামাহৰ  
**فَبِأَيِّ حَدِيثٍ** আয়াতটি যখন পড়বে তখন বলবে এবং যখন সূরা মুরসালাতের আয়াত  
**فَبَعْدَهُ يَقُولُونَ** (এ কুরআন ছাড়ু আর কোনু জিনিসের প্রতি তারা বিশ্বাস পোষণ  
**করবে?**) পড়বে তখন বলবে : **أَنَا بِاللَّهِ** (আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি)।  
 ইমাম আহমাদ, তিমিয়ী, ইবনুল মুনফির, ইবনে মালদুইয়া, বায়হাকী এবং হাকেমও  
 অনুরূপ বিষয় সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

# আদ দাহুর

৭৬

## নামকরণ

সূরার একটি নাম আদ দাহুর এবং আরেকটি নাম আল ইনসান। দুটি নামই এর প্রথম আয়াতের **هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ** এবং **حِينَ مِنَ الدُّهْرِ** থেকে গৃহীত হয়েছে।

## নাযিল হওয়ার সময়-কাল

তাফসীরকারদের অধিকাংশই বলেছেন যে, এটি মকায় অবতীর্ণ সূরা। আল্লামা যামাখশারী (র), ইমাম রায়ী, কাজী বায়য়াবী, আল্লামা নিজামুদ্দীন নীশাপুরী, হাফেয় ইবনে কাসীর এবং আরো অনেক তাফসীরকার এটিকে মক্কী সূরা বলেই উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আলুসীর মতে এটিই অধিকাংশ মুফাস্সিরের মত। কিন্তু অপর কিছু সংখ্যক তাফসীরকারের মতে পুরা সূরাটিই মাদানী। আবার কারো কারো মতে এটি মক্কী সূরা হলেও এর ৮ থেকে ১০ পর্যন্ত আয়াতগুলো মদীনায় নাযিল হয়েছে।

অবশ্য এ সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি মদানী সূরাসমূহের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বরং এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে স্পষ্ট বুঝা যায়। এটি যে মকায় অবতীর্ণ শুধু তাই নয়, বরং মক্কী যুগেরও সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর যে পর্যায়টি আসে সে সময় নাযিল হয়েছিল। ৮ থেকে ১০ (وَيَطْعَمُونَ الطَّفَالَ) পর্যন্ত আয়াতগুলো গোটা সূরার বর্ণনাক্রমের সাথে থেকে (بِعْصًا قَمْطَرِيًّا) পর্যন্ত আয়াতগুলো গোটা সূরার বর্ণনাক্রমের সাথে এমনভাবে গাঁথা যে, যদি কেউ পূর্বাপর মিলিয়ে তা পাঠ করে তাহলে তার মনেই হবে না যে, এর আগের এবং পরের বিষয়বস্তু ১৫-১৬ বছর পূর্বে নাযিল হয়েছিল এবং এর কয়েক বছর পর নাযিল হওয়া এ তিনটি আয়াত এখানে এনে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

আসলে যে কারণে এ সূরা অথবা এর কয়েকটি আয়াতের মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তা হলো, ইবনে আবুস রাদিয়াল্লাহ আনহ থেকে আতা বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত হাসান ও হসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহমা অসুস্থ হয়ে পড়েন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং বহু সংখ্যক সাহাবী (রা) তাদের দেখতে ও রোগ সংক্রান্ত খোজ-খবর নিতে যান। কোন কোন সাহাবী (রা) হযরত আলীকে (রা) পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন শিশু দু'টির রোগমুক্তির জন্যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন মানত করেন। অতএব হযরত আলী (রা), হযরত ফাতেমা (রা) এবং তাদের কাজের মেয়ে ফিদা (রা) মানত করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যদি শিশু দু'টিকে রোগমুক্ত করেন তাহলে শুকরিয়া হিসেবে তাঁরা সবাই তিনি দিন রোয়া রাখবেন। আল্লাহর

মেহেরবানীতে উভয়ে সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং তারা তিন জনে মানতের রোয়া রাখতে শুরু করলেন। ইয়রত আলীর (রা) ঘরে খাবার কিছুই ছিল না। তিনি তিন সা' পরিমাণ যব ধার-কর্জ করে আনলেন (একটি বর্ণনা অনুসারে মেহনত মজবুরী করে নিয়ে আসলেন)। প্রথম রোয়ার দিন ইফতারী করে যখন খাওয়ার জন্য বসেছেন সেসময় একজন মিসকীন এসে খাবার চাইলো। তারা সব খাবার সে মিসকীনকে দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা শুধু পানি পান করে রাত্রি কাটালেন। দ্বিতীয় দিনও ইফতারীর পর যে সময় খেতে বসেছেন সে সময় একজন ইয়াতীম এসে কিছু চাইলো। সেদিনও তারা সব খাবার তাকে দিয়ে দিলেন এবং নিজেরা শুধু পানি পান করে রাত কাটিয়ে দিলেন। তৃতীয় দিন ইফতার করে খাবার জন্য সবেমাত্র বসেছেন সে সময় একজন বন্দী এসে একইভাবে খাদ্য চাইলো। সেদিনের সব খাবারও তাকে দিয়ে দেয়া হলো। চতুর্থ দিন হ্যরত আলী (রা) বাচ্চা দু'টিকে নিয়ে রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হলে নবী (সা) দেখতে পেলেন, অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় পিতা ও দুই ছেলে তিনজনের অবস্থাই অত্যন্ত সংগীন। তিনি সেখান থেকে উঠে তাঁদের সাথে ফাতেমার (রা) কাছে বাড়ীতে গিয়ে দেখতে পেলেন তিনিও ঘরের এককোণে ক্ষুধার তীব্র জ্বালার নিরব নিখর হয়ে পড়ে আছেন। এ অবস্থা দেখে নবীর (সা) হৃদয়-মন আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন : আল্লাহহ তা'আলা আপনার পরিবার পরিজনের ব্যাপারে আপনাকে মোবারকবাদ দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজেস করলেন : সেটা কি? জবাবে তিনি গোটা সুরাটা পাঠ করে শোনালেন। (ইবনে মিহরানের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, إنَّ الْأَبْرَارَ يُشَرِّبُونَ থেকে সুরার শেষ আয়াত পর্যন্ত শোনালেন। কিন্তু ইবনে মারদুইয়া ইবনে আবুস থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে শুধু এতটুকু বর্ণনা করা হয়েছে যে, وَيَطْعَمُنَ الظَّعَامَ آয়াতটি হ্যরত আলী ও হ্যরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাতে এ ঘটনার কোন উল্লেখ নেই)। আলী ইবনে আহমাদ আল ওয়াহেদী তার তাফসীর গ্রন্থ 'আল বাসীতে' এ ঘটনাটি পূরা বর্ণনা করেছেন। যামাখশারী, রায়ী, নীশাপুরী এবং অন্যান্য মুফাস্সিরগণ সম্ভবত সেখান থেকেই এ ঘটনাটি গ্রহণ করেছেন।

এ রেওয়ায়াতটি সনদের দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল। তাছাড়া দেরায়াত বা বুদ্ধি-বিবেক ও বিচার-বিশ্লেষণের দিক থেকে দেখলেও এ ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত মনে হয় যে, একজন মিসকীন, একজন ইয়াতীম এবং একজন বন্দী এসে খাদ্য চাচ্ছে আর তাকে বাড়ীর পাঁচ পাঁচজন লোকের খাদ্য সবটাই দিয়ে দেয়া হচ্ছে। এটা কি কোন যুক্তিসংগত ব্যাপার? একজনের খাদ্য তাকে দিয়ে বাড়ীর পাঁচ জন মানুষ চারজনের খাদ্য নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করতে পারতেন। তাছাড়া একথা ও বিশাস করা কঠিন যে, দু' দু'টি বাচ্চা যারা সবে মাত্র রোগ থেকে নিরাময় লাভ করেছিল এবং দুর্বল ছিল তাঁদেরকেও তিন দিন যাবত অঙ্গুত্ত রাখা হ্যরত আলী ও হ্যরত ফাতেমার (রা) মত দীন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদ্বয়ও নেকীর কাজ মনে করে থাকবেন! তাছাড়াও ইসলামী শাসন যুগে কয়েদীদের ব্যাপারে কখনো এ নীতি ছিল না যে, তাদেরকে ভিক্ষা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হবে। তারা সরকারের হাতে বন্দী হয়ে থাকলে তাদের খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা সরকারই করতেন। আবার কোন ব্যক্তির হাতে সোপন্দ করা হয়ে থাকলে তাদের খাদ্য ও বস্ত্র দান করা সে ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য হতো। তাই কোন বন্দী ভিক্ষা করতে বের

হবে মদীনায় এটা ছিল অসভ্য ব্যাপার। তা সন্দেশে সমস্ত বর্ণনা ও যুক্তি-তর্কের দুর্বলতাসমূহ উপেক্ষা করে এ কাহিনীকে পূরোপূরি সত্য বলে ধরে নিলেও তা থেকে বড়জোর যা জানা যায় তা শুধু এতটুকু যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের লোকদের দ্বারা এ নেক কাজটি সম্পাদিত হওয়ার কারণে জিবরাইল (আ) এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুখবর শুনিয়েছেন যে, আল্লাহর কাছে আপনার আহলে বায়তের এ কাজটি অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। কারণ তারা ঠিক সে পছন্দনীয় কাজটি করেছেন আল্লাহ তা'আলা যার প্রশংস্না সূরা দাহৰের এ আয়াতগুলোতে করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, আয়াত কয়টি এ উপলক্ষ্মৈ নাযিল হয়েছিল। শানে নুয়ুলের ব্যাপারে বিপুল সংখ্যক রেওয়ায়াতের অবস্থা হলো, কোন আয়াত সম্পর্কে যখন বলা হয় যে, এ আয়াতটি অমুক উপলক্ষ্মৈ নাযিল হয়েছিল তখন প্রকৃতপক্ষে তার এ অর্থ দাঁড়ায় না যে, যখন এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ঠিক তখনই এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। বরং এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আয়াতটি এ ঘটনার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রযোজ্য। ইয়াম সুয়তী তাঁর ‘ইতকান’ গ্রহে হাফেয ইবনে তাইমিয়ার এ বক্তব্য উদ্ভৃত করেছেন যে, “স্বাবী যখন বলেন, এ আয়াতটি অমুক ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, তখন কোন কোন ক্ষেত্রে তার অর্থ হয়, এ ব্যাপারটিই তার নাযিল হওয়ার কারণ। আবার কোন কোন সময় তার অর্থ হয়, এ ব্যাপারটি এ আয়াতের নির্দেশের অন্তরভুক্ত, যদিও তা তার নাযিল হওয়ার কারণ নয়।” এরপর তিনি ইয়াম বদরুন্দীন যারকাশীর গ্রন্থ ‘আল বুরহান ফী উলুমিল কুরআন’ থেকে তাঁর বক্তব্য উদ্ভৃত করেছেন। বক্তব্যটি হলো, “সাহাবা ও তাবেয়ীদের ব্যাপারে এ নীতি সাধারণ ও সর্বজনবিদিত যে, তাঁদের কেউ যখন বলেন, এ আয়াতটি অমুক ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল তখন তার অর্থ হয়, এ আয়াতের নির্দেশ এ ব্যাপারে প্রযোজ্য। তার এ অর্থ কখনো হয় না যে, উক্ত ঘটনাই এ আয়াতটির নাযিলের কারণ। প্রকৃতপক্ষে এ ক্ষেত্রে আয়াতটি থেকে দলীল পেশ করা হয় মাত্র। তা দ্বারা ঘটনা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হয় না।” (আল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১, মুদ্রণ ১৯২৯ ইং)

### বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হলো দুনিয়ায় মানুষকে তার প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করা। তাকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, সে যদি তার এ মর্যাদা ও অবস্থানকে সঠিকভাবে উপলক্ষ্মী করে শোকর বা কৃতজ্ঞতামূলক আচরণ করে তাহলে তার পরিণতি কি হবে এবং তা না করে যদি কুফরীর পথ অবলম্বন করে তাহলেই বা কি ধরনের পরিণতির সম্মুখীন হবে। কুরআনের বড় বড় সূরাগুলোতে এ বিষয়টি সবিষ্ঠারে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মক্কী যুগের প্রথম পর্যায়ে অবর্তীণ স্ন্যাগুলোর একটি বিশেষ বর্ণনাভঙ্গি হলো পরবর্তী সময়ে যেসব বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে এ যুগে সে বিষয়গুলোই অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত স্বদয়গ্রাহী ও স্মরণশীল পছায় মন-মগজে গৌরে দেয়া হয়েছে। এ জন্য সুন্দর ও ছোট ছোট এমন বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে যা আপনা আপনি শ্রোতার মুখ্য হয়ে যায়।

এতে সর্বপ্রথম মানুষকে শরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এক সময় এমন ছিল, যখন সে কিছুই ছিল না। তারপর সংমিশ্রিত বীর্য দ্বারা এত সূক্ষ্মভাবে তার সৃষ্টির সূচনা করা

হয়েছে যে, তার মা পর্যন্তও বুঝতে পারেনি যে, তার অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে। অন্য কেউও তার এ অণুবীক্ষণিক সভা দেখে একথা বলতে সক্ষম ছিল না যে, এটাও আবার কোন মানুষ, যে পরবর্তী সময়ে এ পৃথিবীতে সৃষ্টির সেরা হিসেবে গণ্য হবে। এরপর মানুষকে এ বলে সাবধান করা হয়েছে যে, এভাবে তোমাকে সৃষ্টি করে এ পর্যায়ে তোমাকে পৌছানোর কারণ হলো তোমাকে দুনিয়াতে রেখে আমি পরীক্ষা করতে চাই। তাই অন্যান্য সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিপরীত তোমাকে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছি এবং তোমার সামনে শোকর ও কুফরের দু'টি পথ স্পষ্ট করে রেখে দেয়া হয়েছে। এখানে কাজ করার জন্য তোমাকে কিছু সময়ও দেয়া হয়েছে। এখন আমি দেখতে চাই এ সময়ের মধ্যে কাজ করে অর্থাৎ এভাবে গৃহীত পরীক্ষার মাধ্যমে তুমি নিজেকে শোকরগোজার বান্দা হিসেবে প্রমাণ করো না কাফের বান্দা হিসেবে প্রমাণ করো।

অতপর যারা এ পরীক্ষায় কাফের বলে প্রমাণিত হবে আখেরাতে তাদের কি ধরনের পরিণতির সন্মুখীন হতে হবে তা শুধু একটি আয়াতের মাধ্যমেই পরিকার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে।

তারপর আয়াত নং ৫ থেকে ২২ পর্যন্ত একাদিক্রমে সেসব পূরুষার ও প্রতিদানের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা দিয়ে সেসব লোকদের তাদের রবের কাছে অভিষিঞ্চ করা হবে, যারা এখানে যথাযথভাবে বল্দেগী করেছে। এ আয়াতগুলোতে শুধুমাত্র তাদের সর্বোত্তম প্রতিদান দেয়ার কথা বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়নি। বরং সংক্ষেপে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, কি কি কাজের জন্য তারা এ প্রতিদান লাভ করবে। যকী যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট হলো, তাতে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়ার সাথে সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিতে অতি মূল্যবান নৈতিক গুণাবলী এবং নেক কাজের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এমন সব কাজ-কর্ম ও এমন সব মন্দ নৈতিক দিকের উল্লেখ করা হয়েছে যা থেকে ইসলাম মানুষকে পবিত্র করতে চায়। আর দুনিয়ার এ অঙ্গীয়ী জীবনে তাল অথবা মন্দ কি ধরনের ফলাফল প্রকাশ পায় সেদিক বিবেচনা করে এ দু'টি জিনিস বর্ণনা করা হয়নি। বরং আখেরাতের চিরহায়ী জীবনে তার স্থায়ী ফলাফল কি দাঁড়াবে কেবল সে দিকটি বিবেচনা করেই তা বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়ার এ জীবনে কোন খারাপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট কল্যাণকর প্রমাণিত হোক বা কোন তাল চারিত্রিক গুণ ক্ষতিকর প্রমাণিত হোক তা এখানে বিবেচ্য নয়।

এ পর্যন্ত প্রথম রংকু'র বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হলো। এরপর দ্বিতীয় রংকু'তে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোধন করে তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, এ কুরআনকে অল্প অল্প করে তোমার ওপরে আমিই নাযিল করছি। এর উদ্দেশ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাবধান করে দেয়া নয়, বরং কাফেরদের সাবধান করে দেয়া। কাফেরদের সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, কুরআন মজীদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনগড়া বা স্বরচিত গ্রন্থ নয়, বরং তার নাযিলকর্তা আমি নিজে। আমার জ্ঞান ও কর্মকৌশলের দাবী হলো, আমি যেন তা একবারে নাযিল না করি বরং অল্প অল্প করে বারে বারে নাযিল করি। দ্বিতীয় যে কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে তাহলো, তোমার রবের ফায়সালা আসতে যত

দেরীই হোক না কেন এবং এ সময়ের মধ্যে তোমার ওপর দিয়ে যত কঠিন ঝড়-ঝঁঝাই বয়ে যাক না কেন তুমি সর্বাবস্থায় ধৈর্যের সাথে তোমার রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে থাকো। কখনো এসব দুর্ভূতি ও সত্য অঙ্গীকারকারী লোকদের কারো চাপে পড়ে নতি স্বীকার করবে না। তৃতীয় যে কথাটি তাঁকে বলা হয়েছে তা হলো, রাত দিন সবসময় আল্লাহকে শ্রণ করো, নামায পড় এবং আল্লাহর ইবাদাতে রাত কাটিয়ে দাও। কারণ কুফরের বিধ্বংসী প্লাবনের মুখে এ জিনিসটিই আল্লাহর পথে আহবানকারীদের পা-কে দৃঢ় ও মজবুত করে।

এরপর আরেকটি ছোট বাক্যে কাফেরদের ভাস্ত আচরণের মূল কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তারা আখেরাতকে ভুলে দুনিয়ার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় আরেকটি বাক্যে তাদের এ মর্মে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজে নিজেই জন্ম লাভ করোনি। আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, বুকের এ চঙড়া ছাতি এবং মজবুত ও সবল হাত-পা তুমি নিজেই নিজের জন্য বানিয়ে নাও নি। ওগুলোও আমিই তৈরী করেছি। আমি তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। সবসময়ের জন্য সে ক্ষমতা আমার করায়ত্ব। আমি তোমাদের চেহারা ও আকৃতি বিকৃত করে দিতে পারি। তোমাদের ধৰ্ম করে অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্তুলাভিষিক্ত করতে পারি। তোমাদের মেরে ফেলার পর যে চেহারা ও আকৃতিতে ইচ্ছা পুনরায় তোমাদের সৃষ্টি করতে পারি।

সবশেষে এ বলে বক্তব্য শেষ করা হয়েছে যে, এ কুরআন একটি উপদেশপূর্ণ বাণী। যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করে তার প্রভূর পথ অবলম্বন করতে পারে। তবে দুনিয়াতে মানুষের ইচ্ছা সব কিছু নয়। আল্লাহর ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত কারো ইচ্ছাই প্রণ হতে পারে না। তবে আল্লাহর ইচ্ছা অযৌক্তিকভাবে হয় না। তিনি যা-ই ইচ্ছা করুন না কেন তা হয় নিজের জ্ঞান ও কর্মকৌশলের আলোকে। এ জ্ঞান ও কর্মকৌশলের ভিত্তিতে তিনি যাকে তাঁর রহমতলাভের উপযুক্ত মনে করেন তাকে নিজের রহমতের অন্তরভুক্ত করে নেন। আর তাঁর কাছে যে জালোম বলে প্রমাণিত হয় তার জন্য তিনি অত্যন্ত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

জয়ত ৩১

সূরা আদ দাহর-মাদানী

জন্ম ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করণময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِنْ كُوْرَا<sup>①</sup>  
إِنَّا خَلَقْنَا إِلَّا نَسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ فَنَبْتَلِيهُ فَجَعَلْنَاهُ سَيِّعًا

بِصِيرًا<sup>②</sup>

মানুষের ওপরে কি অত্তীন মহাকালের এমন একটি সম্ভাবনা অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন জিনিসই ছিল না<sup>৩</sup>? আমি মানুষকে এক সংযোগিত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি যাতে তার পরীক্ষা নিতে পারি।<sup>৪</sup> এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি।<sup>৫</sup>

১. আয়াতের প্রথমাংশ হলো । এখানে অধিকাংশ মুফাস্সির ও অনুবাদক মুল শব্দটিকে এক শব্দের অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং এর অর্থ করেছেন নিঃসন্দেহে মানুষের ওপরে এরূপ একটি সময় এসেছিল। তবে মুল আরবী ভাষায় মূলতঃ ‘কি’র অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সর্বাবস্থায় এর দ্বারা প্রশ্ন করা বুকায় না। বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাহ্যিক ভাবে প্রশ্নবোধক এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে বলা হয়ে থাকে। যেমন, কখনো আমরা জানতে চাই যে, অমুক ঘটনা ঘটেছিল না ঘটেনি আর সে জন্য কাউকে জিজ্ঞেস করি, এ ধরনের ঘটনা কি ঘটেছিল? কোন কোন সময় আবার প্রশ্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য হয় না, বরং উদ্দেশ্য হয় কোন বিষয় অঙ্গীকার করা। তখন যে বাচনভঙ্গি ব্যবহার করে আমরা তা অঙ্গীকার করি তাহলো অন্য কেউও কি এ কাজ করতে পারে? কোন সময় আমরা কারো থেকে কোন বিষয়ে স্বীকৃতি পেতে চাই এবং এ উদ্দেশ্যে তাকে জিজ্ঞেস করি, আমি কি তোমার টাকা পরিশোধ করেছি? কোন সময় আবার শুধু স্বীকৃতি আদায় করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য হয় না। বরং তখন আমরা প্রশ্ন করি শ্রোতার মন মগজকে আরো একটি বিষয় ভাবতে বাধ্য করার জন্য যা তার স্বীকৃতির অনিবার্য ফল স্বরূপ দেখা দেয়। যেমন আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করি : আমি কি তোমার সাথে কোন খারাপ আচরণ করেছি? এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুই নয় যে, সে স্বীকার করুক, আপনি তার সাথে সত্যিই কোন খারাপ আচরণ করেননি। বরং এর উদ্দেশ্য তাকে একথাও চিন্তা করতে বাধ্য করা যে, যে ব্যক্তি আমার সাথে কোন খারাপ আচরণ করেননি। তার সাথে আমার খারাপ আচরণ করা কতটুকু ন্যায় সংগত? আলোচ্য আয়াতের

প্রশ্নবোধক অংশটুকু প্রকৃতপক্ষে এ শেষ অর্থেই বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য মানুষকে শুধু এতটুকু স্থীকার করানো নয় যে, তার ওপরে এমন একটি সময় সত্যিই অতিবাহিত হয়েছে। বরং এর দ্বারা তাকে এ বিষয়ও চিন্তা করতে বাধ্য করা উদ্দেশ্য যে, যে আগ্নাহ এমন নগণ্য অবস্থা থেকে সৃষ্টির সূচনা করে তাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন তিনি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে অক্ষম হবেন কেন?

আয়াতের দ্বিতীয় অংশ হলো **حِبْنَ مَنْ الدُّهْرِ** অর্থ- অন্তহীন মহাকাল যার আদি-অন্ত কিছুই মানুষের জানা নেই। আর **حِبْنَ** অর্থ অন্তহীন এ মহাকালের বিশেষ একটি সময়, মহাকাল প্রবাহের কোন এক পর্যায়ে যার আগমন ঘটেছিল। বজ্রব্যের সারমর্ম হলো, এ অন্তহীন মহাকালের মধ্যে একটি দীর্ঘ সময় তো এমন অতিবাহিত হয়েছে যখন মানব প্রজাতির আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না। তারপর এ মহাকাল প্রবাহে এমন একটি সময় আসলো যখন মানুষ নামের একটি প্রজাতির সূচনা করা হলো। এ সময়-কালে প্রত্যেক মানুষের জন্য এমন একটি সময় এসেছে যখন তাকে শুন্য মাত্রা বা অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বদানের সূচনা করা হয়েছে।

আয়াতের তৃতীয় অংশ হলো **لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا** অর্থাৎ তখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল না। তার একটি অংশ বাপের পুত্রের মধ্যে অণুবীক্ষণিক জীবাণু আকারে এবং আরেকটি অংশ মায়ের বীর্যে একটি অণুবীক্ষণিক ডিব্রের আকারে বর্তমান ছিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষ এ বিষয়ও জানতো না যে, একটি শুক্রকীট এবং একটি ডিব্রকোষের মিলনের ফলেই সে অস্তিত্ব লাভ করে। বর্তমানে অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সে এ দু'টিকে দেখতে সক্ষম হয়েছে বটে, কিন্তু এখনো কেউ বলতে পারে না যে, পিতার এ শুক্রকীটে এবং মায়ের ডিব্রকোষে কত সংখ্যক মানুষের অস্তিত্ব থাকে। গর্ভসঞ্চারকালে এ দু'টি জিনিসের মিলনে যে প্রাথমিক কোষ (C<sub>3</sub>) সৃষ্টি হয় তা পরিমাণহীন এমন একটি পরমাণু যা কেবল অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যেতে পারে। আর তা দেখার পরেও আপাত দৃষ্টিতে কেউ একথা বলতে পারে না যে, এভাবে কোন মানুষ জন্মাবল করছে কিংবা এ নগণ্য সূচনা বিন্দু থেকে বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে কোন মানুষ যদি সৃষ্টি হয়ও তাহলে সে কেমন দৈহিক উচ্চতা ও কাঠামো, কেমন আকার-আকৃতি এবং কেমন যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বধারী মানুষ হবে তাও বলতে পারে না। সে সময় সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই ছিল না, এ বাণীর তাৎপর্য এটাই। যদিও মানুষ হিসেবে সে সময় তার অস্তিত্বের সূচনা হয়ে গিয়েছিল।

২. এক সংমিশ্রিত বীর্য দ্বারা অর্থ হলো, মানুষের সৃষ্টি পুরুষ ও নারীর দু'টি আলাদা বীর্য দ্বারা হয়নি। বরং দু'টি বীর্য সংমিশ্রিত হয়ে যখন একটি হয়ে গিয়েছে তখন সে সংমিশ্রিত বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে।

৩. এটাই হলো দুনিয়ায় মানুষের এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা। মানুষ নিছক গাছপালা বা জীব-জন্মের মত নয় যে, তার সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এখানেই পূরণ হয়ে যাবে এবং প্রকৃতির নিয়মানুসারে একটি নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত তার নিজের অংশের করণীয় কাজ সম্পাদন করার পর এখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং নিচিহ্ন হয়ে যাবে। তাছাড়া এ দুনিয়া তার জন্য আয়াব বা শাস্তির স্থান নয় যেমনটা খৃষ্টান পাদ্রীরা মনে করে, প্রতিদানের ক্ষেত্রেও নয় যেমনটা জন্মাত্রবাদীরা মনে করে, চারণ ক্ষেত্রে বা

বিনোদন কেন্দ্র নয় যেমনটা বন্দুবাদীরা মনে করে আবার দন্ত ও সংগ্রাম ক্ষেত্রেও নয় যেমনটা ডারউইন ও মার্কসের অনুসারীরা মনে করে থাকে। বরং দুনিয়া মূলত তার জন্য একটা পরীক্ষাগার। যে জিনিসকে সে বয়স বা আয়ুকাল বলে মনে করে আসলে তা পরীক্ষার সময় যা তাকে এ দুনিয়ায় দেয়া হয়েছে। দুনিয়ায় যে ক্ষমতা ও যোগ্যতা তাকে দেয়া হয়েছে, যেসব বস্তুকে কাজে লাগানোর সুযোগ তাকে দেয়া হয়েছে, যে মর্যাদা নিয়ে বা অবস্থানে থেকে সে এখানে কাজ করছে এবং তার ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তার সবই মূলত অসং্যুৎ পরীক্ষা পত্র। জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্মস্ত নিরবিচ্ছিন্নতাবে এ পরীক্ষা চলবে। এ পরীক্ষার ফলাফল দুনিয়ায় প্রকাশ পাবে না। বরং আখেরাতে তার সমস্ত পরীক্ষা পত্র পরীক্ষা ও যাঁচাই বাছাই করে ফায়সালা দেয়া হবে। সে সফল না বিফল। তার সফলতা ও বিফলতার সবটাই নির্ভর করবে এ বিষয়ের ওপর যে, সে তার নিজের সম্পর্কে কি ধারণা নিয়ে এখানে কাজ করেছে এবং তাকে দেয়া পরীক্ষার পত্রসমূহে সে কিভাবে জবাব নিখেছে। নিজের সম্পর্কে সে যদি মনে করে থাকে যে, তার কোন আগ্রাহ নেই অথবা নিজেকে সে বহু সংযুক্ত ইলাহৰ বান্দা মনে করে থাকে এবং পরীক্ষার সবগুলো পত্রে এ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে জবাব নিখে থাকে যে, আখেরাতে তাকে তার মুষ্টার সামনে কোন জবাবদিহি করতে হবে না তাহলে তার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড ভুল হয়ে গিয়েছে। আর যদি সে নিজেকে একমাত্র আগ্রাহৰ বান্দা মনে করে আগ্রাহৰ মনোনীত পথ ও পথ অনুসারে কাজ করে থাকে এবং আখেরাতে জবাবদিহির চেতনা বিবেচনায় রেখে তা করে থাকে তাহলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলা। (এ বিষয়টি কুরআন মজীদে এত অধিক জায়গায় ও এত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখানে স্থানগুলোর নাম উল্লেখ করা বেশ কঠিন। যারা এ বিষয়টি আরো তালিভাবে বুবতে চান তারা তাফহীমুল কুরআনের প্রত্যেক খণ্ডের শেষে সংযুক্ত বিষয়সূচীর মধ্যে ‘পরীক্ষা’ শব্দটি বের করে সেসব স্থান দেখুন যেখানে কুরআন মজীদে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কুরআন ছাড়া পৃথিবীতে এমন আর কোন গ্রন্থ নেই যার মধ্যে এ সত্যটি এত বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।)

৪. আসলে বলা হয়েছে আমি তাকে স্মৃত ও বানিয়েছি। বিবেকবুদ্ধির অধিকারী করেছি বললে এর সঠিক অর্থ প্রকাশ পায়। কিন্তু অনুবাদে আমি **স্মৃত** শব্দের অর্থ ‘শ্রবণশক্তির অধিকারী’ এবং **বস্তি** শব্দের অর্থ ‘দৃষ্টিশক্তির অধিকারী’ করেছি। যদিও এটিই আরবী ভাষার এ দু’টি শব্দের শাব্দিক অনুবাদ কিন্তু আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন যে, জস্তু-জানোয়ারের জন্য কখনো **বস্তি** ও **স্মৃত** শব্দ ব্যবহৃত হয় না। অথচ জস্তু-জানোয়ারও দেখতে এবং শুনতে পায়। অতএব এখানে শোনা এবং দেখার অর্থ শোনার ও দেখার সে শক্তি নয় যা জস্তু-জানোয়ারকেও দেয়া হয়েছে। এখানে এর অর্থ হলো, শোনা ও দেখার সেসব উপায়-উপকরণ যার সাহায্যে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাছাড়া শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি যেহেতু মানুষের জ্ঞানার্জনের উপায়-উপকরণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাই সংক্ষেপে এগুলোরই উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ যেসব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করে থাকে আসলে এসব ইন্দ্রিয়ের সবগুলোকেই এখানে বুবানো হয়েছে। তাছাড়া মানুষকে যেসব ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি শক্তি দেয়া হয়েছে তা ধরন ও প্রকৃতিগত দিক দিয়ে পশুদের ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি শক্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের পেছনে একটি চিন্তাপীল মন-মগজ

إِنَّا هَلْ يَنْهَا مِنَ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ① إِنَّا أَعْتَنَاهُ لِكُفَّارِينَ  
سَلِسِلًا وَأَغْلَبًا وَسَعِيرًا ②

আমি তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর হয় সে শোকরগোজার হবে নয়তো হবে কুফরের পথ অনুসরণকারী।<sup>১</sup> আমি কাফেরদের জন্য শিকল, বেড়ি এবং জুলন্ত আশুন প্রস্তুত করে রেখেছি।

বর্তমান যা ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে লক্ষ জ্ঞান ও তথ্যসমূহকে একত্রিত ও বিন্যস্ত করে তা থেকে ফলাফল বের করে, যতামত হির করে এবং এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার উপরে তার কার্যকলাপ ও আচরণের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাই মানুষকে সৃষ্টি করে আমি তাকে পরীক্ষা করতে চাহিলাম একথাটি বলার পর আমি এ উদ্দেশ্যেই তাকে সম্মুখ ও অর্থাত্ শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি<sup>২</sup> কথাটি বলার অর্থ দৌড়ায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির শক্তি দিয়েছেন যাতে সে পরীক্ষা দেয়ার উপর্যুক্ত হতে পারে। বাক্যটির অর্থ যদি এটা না হয় এবং সম্মুখ ও বধির ব্যক্তিরা এ পরীক্ষা থেকে বাদ পড়ে যায় অথচ জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি থেকে যদি কেউ পূরোপুরি বক্ষিত না হয় তাহলে তার এ পরীক্ষা থেকে বাদ পড়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

৫. অর্থাত্ আমি তাকে শুধু জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই ছেড়ে দেইনি। বরং এগুলো দেয়ার সাথে সাথে তাকে পথও দেখিয়েছি যাতে সে জ্ঞানতে পারে শোকরিয়ার পথ কোনটি এবং কুফরীর পথ কোনটি। এরপর যে পথই সে অবলম্বন করুক না কেন তার জন্য সে নিজেই দায়ী। এ বিষয়টিই সূরা বালাদে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে “وَهُدٌ بِنَتِ النَّجَدَيْنِ” আমি তাকে দু’টি পথ (অর্থাৎ ভাল ও মন্দ পথ) স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছি।<sup>৩</sup> সূরা শামসে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবেঃ **وَمَا نَفْسٌ** **مِمَّا** **سُوْمَا فَالْهُمَّا فُجُورُهَا وَتَقْوَمَا** “শ্রপণ” (মানুষের) প্রবৃত্তির আর সে সত্তার যিনি তাকে (সব রকম বাহ্যিক) ও আভ্যন্তরীণ শক্তি দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। আর পাপাচার ও তাকওয়া-পরাহেজগারীর অনুভূতি দু’টোই তার ওপর ইসহাম করেছেন।” এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সামনে রেখে বিচার করলে এবং পৃথিবীতে মানুষের হিন্দায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যেসব ব্যবস্থার কথা কুরআন মজীদে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন তাও সামনে রাখলে বুঝা যায় যে, এ আয়াতে পথ দেখানোর যে কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা পথপ্রদর্শনের কোন একটি যাত্র পথ ও উপর্য বুঝানো হয়েন। বরং এর দ্বারা অনেক পথ ও উপায়ের কথা বলা হয়েছে যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। যেমনঃ

এক :: প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির যোগ্যতা দেয়ার সাথে সাথে তাকে একটি নৈতিক বোধ ও অনুভূতি দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে প্রকৃতিগতভাবেই ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে, কিছু কাজ-কর্ম ও বৈশিষ্টকে খারাপ বলে জানে যদিও সে

নিজেই তাতে লিঙ্গ। আবার কিছু কাজ-কর্ম ও গুণাবলীকে ভাল বলে মনে করে যদিও সে নিজে তা থেকে দূরে অবস্থান করে। এমন কি যেসব লোক তাদের স্বার্থ ও লোভ-লালসার কারণে এমন সব দর্শন রচনা করেছে যার ডিস্টিতে তারা অনেক খারাপ ও পাপকার্যকেও নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছে তাদের অবস্থাও এমন যে, সে একই মন কাজ করার অভিযোগ যদি কেউ তাদের উপর আরোপ করে, তাহলে তারা প্রতিবাদে চিন্তকার করে উঠবে এবং তখনই জানা যায় যে, নিজেদের মিথ্যা ও অলীক দর্শন সত্ত্বেও বাস্তবে তারা নিজেরাও সেসব কাজকে খারাপই মনে করে থাকে। অনুরূপ ভাল কাজ ও গুণাবলীকে কেউ মূর্খতা, নির্বৃষ্টিতা এবং সেকেলে ঠাওরিয়ে রাখলেও কোন মানুষের কাছ থেকে তারা যখন নিজেরাই নিজেদের সদাচরণের সূফল বা উপকার লাভ করে তখন তারা সেটিকে মূল্যবান মনে করতে বাধ্য হয়ে যায়।

দুই : প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা বিবেক (তিরঙ্গারকারী নফস) বলে একটি জিনিস রেখে দিয়েছেন। যখন সে কোন মন্দ কাজ করতে উদ্যত হয় অথবা করতে থাকে অথবা করে ফেলে তখন এ বিবেকই তাকে দংশন করে। যতই হাত বুলিয়ে বা আদর-সোহাগ দিয়ে মানুষ এ বিবেককে ঘূর্ম পাড়িয়ে দিক, তাকে অনুভূতিহীন বানানোর যত চেষ্টাই সে করলে সে তাকে একদম নিষ্ঠিত করতে সক্ষম নয়। হঠকারী হয়ে দুনিয়ায় সে নিজেকে চরম বিবেকহীন প্রমাণ করতে পারে, সে সুন্দর সুন্দর অজুহাত খাড়া করে দুনিয়াকে ধোকা দেয়ার সব রকম প্রচেষ্টা চালাতে পারে, সে নিজের বিবেককে প্রতারিত করার জন্য নিজের কর্মকাণ্ডের সপক্ষে অসংখ্য ওজর পেশ করতে পারে; কিন্তু এসব সত্ত্বেও আল্লাহ তার স্বত্ত্ব-প্রকৃতিতে যে হিসেব পরীক্ষককে নিয়োজিত রেখেছেন সে এত জীবন্ত ও সজাগ যে, সে নিজে প্রকৃতপক্ষে কি তা কোন অসৎ মানুষের কাছেও গোপন থাকে না। সূরা আল কিয়ামাহতে একথাটিই বলা হয়েছে যে, “মানুষ যত ওজরই পেশ করুক না কেন সে নিজেকে নিজে খুব ভাল করেই জানে।” (আয়াত ১৫)

তিনি : মানুষের নিজের সত্ত্বায় এবং তার চারাগাশে যদীন থেকে আসমান পর্যন্ত গেটা বিশ্ব-জাহানের সর্বত্র এমন অসংখ্য নির্দশনাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, এসব জিনিস কোন আল্লাহ ছাড়া হতে পারে না কিংবা বহু সংখ্যক খোদা এ বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা বা পরিচালক হতে পারে না। বিশ্ব চরাচরের সর্বত্র এবং মানুষের আপন সত্ত্বার অভাবের বিদ্যমান এ নির্দশনাবলীই কিয়ামত ও আখেরাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছে। মানুষ যদি এসব থেকে চোখ বন্ধ করে থাকে অথবা বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগিয়ে এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা না করে অথবা তা যেসব সত্ত্বের প্রতি ইঁধগিত করছে তা মেনে নিতে টালবাহানা ও গড়িয়মসি করে তাহলে তা তার নিজেরাই অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে তার সামনে সত্ত্বের সন্ধান দাতা নির্দশনাদি পেশ করতে আদৌ কোন অসম্পূর্ণতা রাখেনি।

চারি : মানুষের নিজের জীবনে, তার সমসাময়িক পৃথিবীতে এবং তার পূর্বের অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতায়, এমন অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং হয়ে থাকে যা প্রমাণ করে যে, একটি সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর শাসন-কর্তৃত্ব তার উপর এবং সমগ্র বিশ্ব-জাহানের উপর কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন যাঁর সামনে সে নিভাতই অসহায়। যাঁর ইচ্ছা সবকিছুর উপর

إِنَّ الْأَبْرَارَ يُشَرِّبُونَ مِنْ كَأسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورٌ<sup>①</sup> عَيْنًا يُشَرِّبُ  
بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفْجِرُونَهَا تَفْجِيرًا<sup>②</sup> يُوفُونَ بِالنَّدْرَ وَيُخَافُونَ يَوْمًا  
كَانَ شَرًّا مُسْتَطِيرًا<sup>③</sup>

(বেহেশতে) নেক্কার লোকেরা<sup>৬</sup> পানপাত্র থেকে এমন শরাব পান করবে যাতে কর্পূর পানি সংশ্মিশ্রিত থাকবে। এটি হবে একটি বহমান ঝগুঁ<sup>৭</sup> আল্লাহর বাল্দারা<sup>৮</sup> যার পানির সাথে শরাব মিশিয়ে পান করবে এবং যেখানেই ইচ্ছা সহজেই তার শাখা-প্রশাখা বের করে নেবে।<sup>৯</sup> এরা হবে সেসব লোক যারা (দুনিয়াতে) মানত পূরণ করে<sup>১০</sup> সে দিনকে তয় করে যার বিপদ সবথানে ছাড়িয়ে থাকবে।

বিজয়ী এবং যাঁর সাহায্যের মে মুখাপেক্ষী। এসব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ বাহ্যিক ক্ষেত্রসমূহেই শুধু এ সত্যের প্রমাণ পেশ করে না। বরং মানুষের নিজের প্রকৃতির মধ্যেও সে সর্বোচ্চ শাসন-কর্তৃত্বের প্রমাণ বিদ্যমান যার কারণে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে খারাপ সময়ে নাত্তিকরাও আল্লাহর সামনে প্রার্থনার হাত প্রসারিত করে এবং কট্টর মুশার্রিকরাও সব মিথ্যা খোদাকে পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে।

পাঁচ : মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও প্রকৃতিগত জ্ঞানের অকাট্য ও চূড়ান্ত রায় হলো অপরাধের শাস্তি এবং উত্তম কার্যাবলীর প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া উচিত। এ উদ্দেশ্যে দুনিয়ার প্রত্যেক সমাজে কোন না কোন রূপে বিচার-ব্যবস্থা কার্যে করা হয় এবং যেসব কাজ-কর্ম প্রশংসনীয় বলে মনে করা হয় তার জন্য পূরক্ষার ও প্রতিদান দেয়ারও কোন না কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নৈতিকতা এবং প্রতিদান বা ক্ষতিপূরণ আইনের মধ্যে এমন একটি অবিছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান যা অঙ্গীকার করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। একথা যদি শীকার করা হয় যে, এ পৃথিবীতে এমন অসংখ্য অপরাধ আছে যার যথাযোগ্য শাস্তি তো দূরের কথা আদৌ কোন শাস্তি দেয়া যায় না এবং এমন অসংখ্য সেবামূলক ও কল্যাণকর কাজ আছে যার যথাযোগ্য প্রতিদান তো দূরের কথা কাজ সম্পাদনকারী আদৌ কোন প্রতিদান লাভ করতে পারে না তাহলে আবেরাতকে মনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। তবে কোন নির্বোধ যদি মনে করে অথবা কোন হঠকারী ব্যক্তি যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকে যে, ন্যায় ও ইনসাফের ধারণা পোষণকারী মানুষ এমন এক পৃথিবীতে জন্মান্ত করে ফেলেছে যেখানে ন্যায় ও ইনসাফের ধারণা একেবারেই অনুপস্থিত তবে সেটা আলাদা কথা, এরপর অবশ্য একটি প্রশ্নের জওয়াব দেয়া তার দায়িত্ব ও কর্তব্য ইয়ে পড়ে। তাহলো, এমন এক বিশে জন্মান্তকারী মানুষের মধ্যে ইনসাফের এ ধারণা এলো কোথা থেকে?

ছয় : এসব উপায়-উপকরণের সাহায্যে মানুষকে হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য আগ্রাহ তা'আলা পৃথিবীতে নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাখিল করেছেন। এসব কিতাবে পরিকল্পনা ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, শোকেরে পথ কোনুটি ও কুফরের পথ কোনুটি এবং এ দু'টি পথে চলার পরিণামই বা কি? নবী-রসূল এবং তাঁদের আনীত কিতাবসমূহের শিক্ষা জানা-অজানা, দৃশ্য-অদৃশ্য অসংখ্য উপায় ও পদ্ধায় এত ব্যাপকভাবে সমর্থ বিশেষ ছড়িয়ে পড়েছে যে, কোন জনপদই আগ্রাহ ও আবেদনের ধারণা, সৎ ও অসৎ কাজের পার্থক্য বোধ এবং তাঁদের পেশকৃত নৈতিক নীতিমালা ও আইন-বিধান সম্পর্কে অক্ষ নয়, নবী-রসূলের আনীত কিতাবসমূহের শিক্ষা থেকেই তারা এ জ্ঞান সাড় করেছে তা তাঁদের জানা থাক বা না থাক। বর্তমানে যেসব গোক নবী-রসূলগণ এবং আসমানী কিতাবসমূহকে অঙ্গীকার করে অথবা তাঁদের সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না তারাও এমন অনেক জিনিস অনুসরণ করে থাকে যা মূলত ঐ সব শিক্ষা থেকে উৎসাহিত ও উৎপন্ন হয়ে তাঁদের কাছে পৌছেছে। অথচ মূল উৎস কি সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না।

৬. মূল আয়াতে **أَبْرَار** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন সব মানুষ যারা পুরোপুরি তাঁদের রবের আনুগত্য করেছে, তাঁর পক্ষ থেকে অপৰ্যাপ্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করেছে এবং তাঁর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত রয়েছে।

৭. অর্থাৎ তা কর্মের মিথিত পানি হবে না বরং তা হবে এমন একটি প্রাকৃতিক অর্ণাধারা যার পানি হবে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন এবং শীতল আর তাঁর খোশবু হবে অনেকটা কর্মের মত।

৮. **عَبَادُ الرَّحْمَنِ** (আগ্রাহের বান্দারা) কিংবা **عَبَادُ الرَّحْمَنِ** (রাহমানের বান্দারা) শব্দগুলো আভিধানিক অর্থে সমস্ত মানুষের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ সবাই আগ্রাহের বান্দা। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআন মজীদে যেখানেই এ ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর দ্বারা আগ্রাহের নেককার বান্দাগণকেই বুঝানো হয়েছে। অসংখ্যে, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে আগ্রাহের বন্দেগী তথা দাসত্বের বাইরে রেখেছে, তারা যেন এর যোগ্য-ই নয় যে, আগ্রাহ তা'আলা তাঁদেরকে নিজের মহান নামের সাথে মৃক্ত করে **عَبَادُ الرَّحْمَنِ** এর মত সম্মানিত উপাধিতে ভূষিত করবেন।

৯. এর দ্বারা বুঝায় না যে, তাঁরা সেখানে কোদাল ও খস্তা নিয়ে নালা খনন করবে এবং এভাবে উক্ত ঝর্ণার পানি যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাবে। বরং এর অর্থ হলো, জাগ্রাতের মধ্যে যেখানেই তাঁরা চাইবে সেখানেই এ ঝর্ণা বইতে থাকবে। এ জন্য তাঁদের নির্দেশ বা ইংগিতই যথেষ্ট হবে। সহজেই বের করে নেবে কথাটি এ বিষয়টির প্রতিই ইংগিত করে।

১০. 'ন্যর' বা মানত পূরণ করার একটা অর্থ হলো, মানুষের ওপর যা কিছু ওয়াজিব করা হয়েছে তা তাঁরা পূরণ করবে। দ্বিতীয় অর্থ হলো, মানুষ তাঁর নিজের ওপর যা ওয়াজিব করে নিয়েছে কিংবা অন্য কথায় সে যে কাজ করার সংকল্প বা ওয়াদা করেছে তা পূরণ করবে। তৃতীয় অর্থ হলো, বাস্তিব ওপরে যা ওয়াজিব তা সে পূরণ করবে। তা তাঁর ওপর ওয়াজিব করা হয়ে থাকুক অথবা সে নিজেই তাঁর ওপর ওয়াজিব করে নিয়ে থাকুক। এ তিনটি অর্থের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থটি বেশী পরিচিত এবং 'ন্যর' শব্দ দ্বারা

সাধারণত এ অর্থটিই বুঝানো হয়ে থাকে। যাই হোক, এখানে এই সমস্ত লোকের প্রশংসা হয়তো এ জন্য করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত ওয়াজিবসমূহ পালন করে। অথবা এ জন্য তাদের প্রশংসা করা হয়েছে যে, তারা অত্যন্ত সৎ মানুষ। যেসব ওয়াজিব বা করণীয় আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন সেগুলো পালনের ব্যাপারে কোন রকম ত্রুটি করা তো দূরের কথা যেসব ভাল ও কল্যাণকর কাজ আল্লাহ তাদের জন্য ওয়াজিব বা করণীয় করে দেননি তারা যখন আল্লাহর কাছে সে কাজ করার ওয়াদা করে তখন সে ওয়াদাও পালন করে।

মানতের বিধি-বিধান ও হকুম-আহকাম তাফহীমুল কুরআনে সূরা বাকারার ৩১০ নং টীকায় আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। তবে এখানে তা আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যথার্থ বলে মনে করছি। যাতে এ ব্যাপারে মানুষ যেসব ভুল করে অথবা যেসব ভুল ধারণা মানুষের মধ্যে দেখা যায় তা থেকে আত্মরক্ষা করতে এবং এর সঠিক নিয়ম-কানুন অবহিত হতে পারে।

এক : ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মতে 'নয়র' বা মানত চার প্রকারের। এক, এক ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করলো যে, সে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অমুক নেক কাজ সম্পাদন করবে। দুই, সে মানত করলো যে, আল্লাহ যদি আমার অমুক প্রয়োজন পূরণ করেন তাহলে আমি শোকরিয়া হিসেবে অমুক নেক কাজ করবো। এ দুই প্রকারের মানতকে ফিকাহবিদদের পরিভাষায় 'নয়রে তাবাররুর' বা নেক কাজের মানত বলা হয় এবং এ ব্যাপারে তারা একই মত যে, এ নয়র পূরণ করা ওয়াজিব। তিন, কোন ব্যক্তির কোন নাজায়েজ কাজ করার কিংবা কোন ওয়াজিব কাজ না করার সংকল্প করা। চার, কোন ব্যক্তির কোন মূবাহ কাজ করা নিজের জন্য ওয়াজিব করে নেয়া অথবা কোন অবাঞ্ছিত কাজ করার সংকল্প করা। এ দু' প্রকারের মানতকে ফিকাহবিদদের পরিভাষায় 'নয়রে লাজাজ' (মূর্খতা, বাগড়াটেপনা ও হঠকারিতামূলক মানত) বলে। এর মধ্যে তৃতীয় প্রকারের মানত সম্পর্কে সব ফিকাহবিদের ঐকমত্য হলো, তা মানত হিসেবে পরিগণিত হয় না। চতুর্থ প্রকারের মানত সম্পর্কে ফিকাহবিদগণ তিনি তিনি মত পোষণ করেছেন। কোন কোন ফিকাহবিদ বলেছেন : এ মানত পূরণ করা কর্তব্য। কেউ কেউ বলেন : শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, ব্যক্তি ইচ্ছা করলে মানত পূরণ করতে পারে কিংবা কাফ্ফারা দিতে পারে। এ ব্যাপারে তার স্বাধীনতা রয়েছে। শাফেয়ী এবং মালেকীদের মতে এ প্রকারের মানতও আদৌ মানত হিসেবে গণ্য হয় না। আবার হানাফীদের মতে এ দু' প্রকারের মানতের জন্য কাফ্ফারা দেয়া আবশ্যিক হয়ে যায়। (উমদাতুল কারী)

দুই : কিছু সংখ্যক হাদীস থেকে জানা যায় যে, কেউ যদি মনে করে মানত দ্বারা 'তাকদীর' পরিবর্তিত হয়ে যাবে অথবা যে মানতে কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শোকরিয়া হিসেবে নেক কাজ করার পরিবর্তে আল্লাহকে বিনিয়য় হিসেবে কিছু দেয়ার জন্য এভাবে চিন্তা করে যে, তিনি যদি আমার কাজটি করে দেন তাহলে আমি তাঁর জন্য অমুক নেক কাজটি করে দেব। তবে এ ধরনের মারত নিষিদ্ধ। হাদীসে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَا عَنِ النَّذْرِ وَيَقُولُ إِنَّهُ  
لَا يَرِدُ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ -

“একবার সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানত মানতে নিষেধ করতে সাগলেন। তিনি বলছিলেন, মানত কোন কিছু প্রতিরোধ করতে পারে না। তবে এভাবে কৃপণ ব্যক্তির দ্বারা তার কিছু অর্থ ব্যায় করানো হয়। (মুসলিম-আবু দাউদ)

হাদীসের শেষ অংশের অর্থ হলো, কৃপণ ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার মত বান্দা নয়। মানতের মাধ্যমে সে এ সোতে কিছু খরচ করে যে, এ বিনিয়ম গ্রহণ করে আল্লাহ তা’আলা হয়তো তার তাকদীর পরিবর্তন করে দেবেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত আরেকটি হাদীস হলো, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

النَّذْرُ لَا يُقْدِمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ -

“মানত কোন কাজকে এগিয়ে আনতে কিংবা আশু সংঘটিতব্য কোন কাজকে পিছিয়ে দিতে পারে না। তবে এভাবে কৃপণ ব্যক্তির কিছু অর্থ-সম্পদ খরচ করানো হয়।”

(বুখারী ও মুসলিম)

আরো একটি হাদীসে তিনি বলেছেন : নবী (সা) মানত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন :

إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

“এভাবে কোন উপকার বা কল্যাণ হয় না। তবে বৈল কর্তৃক তার অর্থ-সম্পদ থেকে কিছু খরচ করানো হয়।” (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিম (রা) হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে প্রায় একশ বিষয়বস্তু সঞ্চিত কিছু সংখ্যাক হাদীস উন্নত করেছেন। বুখারী ও মুসলিম উভয়ে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে তারা বলেছেন যে, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقْرِبُ مِنْ إِبْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ قَدْرَهُ لَهُ وَلَكِنْ  
النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدْرَ فَيُخْرِجُ بِذَالِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنْ الْبَخِيلُ  
يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ -

“আল্লাহ তা’আলা কোন মানুষের তাকদীরে যা নির্ধারিত করেননি, মানত ঐ মানুষকে তার ব্যবস্থা করে দিতে পারে না। তবে মানত তাকদীর অনুসারেই হয়ে থাকে। আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর এভাবে বৈলের কাছ থেকে সেই বস্তু বের করে নেয় যা সে অন্য কোন কারণে বের করতো না।”

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের (রা) বর্ণিত একটি হাদীস এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। হাদীসটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتَغَىٰ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ

“যা ঘরা আল্লাহর স্মৃতি লাভ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয় প্রকৃত মানত সেটিই।”  
(তাহবী)

তিনি : মানতের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো একটি নিয়ম বা ফর্মুলা বলেছেন। তাহলো, যেসব মানত আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে হবে কেবল সে সব মানত পূরণ করতে হবে। আল্লাহর নাফরমানীমূলক কোন মানত কখনো পূরণ করা যাবে না। অনুরূপ কোন ব্যক্তি যে বস্তুর মালিক নয় সে বস্তু দিয়ে কোন মানত করা যায় না। অথবা মানুষের সাধ্যাতীত কোন কাজ দিয়েও মানত করা যায় না। হয়রত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلَيُطِيعَهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعِصِّي اللَّهَ فَلَا يَعِصِّيهِ

“কেউ যদি মানত করে, সে আল্লাহর আনুগত্য করবে তাহলে যেন সে তাঁর আনুগত্য করে। আর কেউ যদি মানত করে, সে আল্লাহর নাফরমানী করবে তাহলে যেন সে তা না করে।” (বুখারী, আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তাহবী)

সাবেত ইবনে ঘাস্তাক বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لَا وَقَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَغْصِبَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ أَبْنُ آدَمَ

“আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কোন বিষয়ে কিংবা যে বস্তু ব্যক্তির মালিকানাধীন নয় এমন বস্তুর ক্ষেত্রে মানত পূরণ করার কোন প্রয়োজন নেই না। (আবু দাউদ)

মুসলিম এ একই বিষয় সংবলিত হাদীস হয়রত ইমরান ইবনে হসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আবু দাউদে হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের (রা) বর্ণিত হাদীসটি এর চেয়েও ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ হাদীসে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য উন্নত করেছেন এভাবে :

لَا نَذَرٌ وَلَا يَمْلِنَ فِي مَا لَا يَمْلِكُ أَبْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَغْصِبَةِ اللَّهِ وَلَا  
فِي قَطِيْعَةِ رَحْمٍ -

“মানুষের আয়তৃধীন বা নাগালের মধ্যে নয় এমন কোন কাজে কোন মানত বা শপথ অচল। অনুরূপ আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কিংবা আত্মায়তার বস্তু হিন্ন করার ঘত কোন কাজেও মানত বা শপথ কার্যকর হবে না।”

চার় : যে কাজে মূলত কোন নেই এবং ব্যক্তি অথবা কোন অর্থহীন কাজ কিংবা অসহায়ী কঠোর পরিশৃঙ্খল অথবা আত্মাপূর্বকে নেক কাজ মনে করে তা নিজের জন্য আবশ্যিক করে নিয়েছে তার এরূপ মানত পূরণ না করা উচিত। এ ব্যাপারে নবী

সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্ট। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস বলেন : একবার নবী (সা) খুতবা পেশ করার সময় দেখলেন, এক ব্যক্তি রোদে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কে এবং কেনই বা সে রোদে দাঁড়িয়ে আছে? তাকে বলা হলো, লোকটির নাম আবু ইসরাইল। সে মানত করেছে যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কারো সাথে কথা বলবে না এবং রোয়া রাখবে। একথা শুনে নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

**مَرْوِهٌ فَلَيْكَلِمُ وَلَيَسْتَظِلُّ وَلَيَقْعُدُ وَلَيَتَمْ صَوْمَهُ**

“তাকে বলো, সে কথা বলুক, ছায়াতে আধ্য গ্রহণ করুক এবং বসুক। তবে রোয়া যেন পালন করো।” (বুখারী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুয়াত্তা)

হ্যরত উকবা ইবনে আমের জুহানী বলেন আমার বোন খালি পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করলো। সে আরো মানত করলো যে, ইজ্জের এ সফরে সে মাথায়ও কাপড় দেবে না। নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তাকে বলো, সে যেন বাহনে সওয়ার হয়ে হজ্জ যায় এবং মাথায় কাপড় দেয়। (আবু দাউদ ও মুসলিম এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন তবে তাতে কিছু শাব্দিক তারতম্য আছে) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা) উকবা ইবনে আমেরের বোনের এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে বক্তব্য উদ্ভৃত করেছেন তার ভাষা হলো,

**إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ عَنْ نَذِرِهِ مُرْهًا فَلَتَرْكَبْ**

“তার এ মানতের প্রয়োজন আল্লাহর নেই। তাকে বলো, সে যেন বাহনে সওয়ার হয়ে হজ্জ করতে যায়।” (আবু দাউদ)

আরো একটি হাদীস বর্ণনা প্রসংগে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস বলেন : এক ব্যক্তি বললো, আমার বোন পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছে। নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

**إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْنِعُ بِشِقَاءِ أَخْتَكَ شَيْئًا فَلَتَحْجُ رَاكِبَةً**

“তোমার বোনের কঠোর পরিদ্যমে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। তার উচিত সওয়ারীর পিঠে উঠে হজ্জ করা।” (আবু দাউদ)

হ্যরত আবাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সেউবত ইজ্জের সফরে) দেখলেন এক বয়োবৃদ্ধ দুর্বল ব্যক্তিকে তার দুই পুত্র ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? বলা হলো, সে পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছে। একথা শুনে তিনি বললেন :

**إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ ، وَأَمْرَهُ أَنْ يُرَكَبْ**

“এ ব্যক্তি নিজে নিজেকে কষ্ট দেবে, তাতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি তাকে বাহনে সওয়ার হতে নির্দেশ দিলেন। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, মুসলিমে হ্যরত আবু উরায়রা থেকেও এ একই বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে)

গাঁচ : কোন মানত পূরণ করা যদি কার্যত অসম্ভব হয় তাহলে তা অন্য কোন ভাবে পূরণ করা যেতে পারে। হ্যরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন : যাকা বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল, আমি এ মর্মে মানত করেছিলাম যে, আল্লাহ যদি আপনার হাতে যাকা বিজয় দান করেন তাহলে আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে দুই রাকআত নামায পড়বো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এখানেই পড়ে নাও। সে আবার জিজ্ঞেস করলো। তিনিও পুনরায় একই জবাব দিলেন। সে আবার জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : [আর্দ্ধ শান্কা] তাহলে এখন তোমার মর্জি। অন্য একটি হাদীসে আছে। নবী (সা) বলেছেন :

وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، لَوْ صَلَّيْتَ هُنَّا لَأْجِزَّ أَعْنَكَ صَلَاةً فِي  
بَيْتِ الْمَقْدَسِ -

“সে মহান সত্ত্বার শপথ, যিনি মুহাম্মাদকে ন্যায ও সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন; তুমি যদি এখানে নামায পড়ে নাও, তাহলে তা বায়তুল মাকদাসে নামায পড়ার বিকল্প হিসেবে যথেষ্ট হবে।” (আবু দাউদ)

ছয় : কেউ যদি তার সমস্ত অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য মানত করে তাহলে সে ক্ষেত্রে ফিকাহবিদগণ তির তির মত পোষণ করেছেন। ইমাম মালেক (র) বলেন : এ ক্ষেত্রে তাকে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দিয়ে দিতে হবে। মালেকীদের মধ্য থেকে ‘সাইনুনের’ বক্তব্য তাকে এতটা সম্পদ দিয়ে দিতে হবে যতটা দিলে সে কষ্টের মধ্যে পড়বে না। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন : এটা যদি তার ‘নয়রে তাবারুর’ (নেকীর উদ্দেশ্যে মানত) হয় তাহলে সমস্ত সম্পদ দিয়ে দিতে হবে। আর যদি ‘নয়রে লাজাজ’ (মূর্খতা ও হঠকারিতামূলক মানত) হয় তাহলে সে উক্ত মানত পূরণ করতে পারে কিংবা ‘কসম’ বা শপথের ‘কাফ্ফারা’ও দিতে পারে। এ ব্যাপারে তার স্বাধীনতা রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা বলেন : তাকে যেসব অর্থ-সম্পদের যাকাত দিতে হয় সেসব সম্পদ আল্লাহর পথে দিয়ে দেয়া কর্তব্য। কিন্তু যেসব সম্পদের যাকাত দিতে হয় না, যেমন, বসত বাড়ী এবং অনুরূপ অন্যান্য সম্পদ তার ওপর এ মানত প্রযোজ্য হবে না। হানাফীদের মধ্যে ইমাম যুফারের (র) বক্তব্য হলো, নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য দুই মাসের প্রয়োজনীয় খরচ রেখে অবশিষ্ট সমস্ত সম্পদ সাদকা করে দিতে হবে। (উমদাত্তুল কারী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ কৃত মুয়াজ্ঞার শরাহ) এ বিষয়টি সম্পর্কে হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তাহলো, হ্যরত কা’ব ইবনে মালেক বলেন, তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার কারণে যে তিরক্ষার ও অসঙ্গোষের শিকার আমি হয়েছিলাম তা মাফ হয়ে গেলে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আরয করলাম যে, আমার তাওবার মধ্যে এ বিষয়টিও অন্তরভুক্ত ছিল যে, আমি আমার সমস্ত সম্পদের মালিকানা স্বত্ব ত্যাগ করে তা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের পথে দান করে দেব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : না, এরূপ করো না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক সম্পদ? তিনি বললেন : না, তাও না। আমি আবার বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন : হী। (আবু দাউদ) অন্য একটি হাদীসে আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

তুমি তোমার কিছু সম্পদ যদি নিজের জন্য রেখে দাও তাহলে তা তোমার জন্য সর্বোক্ষম হবে। (বুখারী) ইমাম যুহুরী বলেন : আমি জানতে পেরেছি যে, হযরত আবু লুবাবা (রা) (তাবুক যুদ্ধের ব্যাপারে তিনিও তিরঙ্গার ও অসঙ্গোষের শিকার হয়েছিলেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন : আমি আমার সমস্ত সম্পদের মালিকানা ত্যাগ করে তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথে সাদক হিসেবে দিয়ে দিতে চাই। জবাবে নবী (সা) বললেন : সম্পদের এক-ত্রৈয়াংশ দিয়ে দেয়াই তোমার জন্য যথেষ্ট। (মুয়াত্তা)

সাত : ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কেউ যদি কোন নেক মানত করে তাহলে ইসলাম গ্রহণের পরে কি তা পূরণ করতে হবে? এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফতোয়া হলো, তা পূরণ করতে হবে। বুখারী, আবু দাউদ ও তাহাবীতে হযরত 'উমর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি জাহেলী যুগে মানত করেছিলেন যে, মসজিদে হারামে এক রাত (কারো কারো বর্ণনায় একদিন) ই'তিকাফ করবেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফতোয়া জিজেস করলে তিনি বললেন: اَوْفِبِنْدَرْكَ 'নিজের মানত পূরণ করো।' কোন কোন ফিকাহবিদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নির্দেশের অর্থ করেছেন যে, এরূপ করা ওয়াজিব। আবার কেউ কেউ অর্থ করেছেন যে, এরূপ করা মুন্তাহাব।

আট : মৃত ব্যক্তির কোন মানত থাকলে তা পূরণ করা কি ওয়ারিশদের জন্য ওয়াজিব? এ প্রশ্নে ফিকাহবিদগণ তিনি তিনি মত পোষণ করেছেন। ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইয়া, আবু সাওর এবং জাহেরিয়াদের মতে মৃতের দায়িত্বে যদি রোয়া বা নামায়ের মানত থেকে থাকে তাহলে ওয়ারিশদের জন্য তা পূরণ করা ওয়াজিব। হানাফীদের মতে মৃত ব্যক্তি যদি শারীরিক ইবাদাতের (নামায বা রোয়া) মানত করে থাকে তাহলে তা পূরণ করা ওয়ারিশদের জন্য ওয়াজিব নয়। আর যদি আর্থিক ইবাদাতের মানত করে থাকে এবং মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর আগে তার ওয়ারিশদের তা পূরণ করার অছিয়ত না করে থাকে তাহলে সে মানতও পূরণ করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু সে যদি অছিয়ত করে যায়, তাহলে তা পূরণ করা ওয়াজিব। তবে তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক-ত্রৈয়াংশের অধিক সম্পদ দিয়ে নয়। এর সাথে মালেকী মাযহাবের মতামতের অনেকটা মিল আছে। শাফেয়ী মাযহাবের মতে, মানত যদি আর্থিক ইবাদাতের না হয়ে অন্য কিছুর হয় কিংবা আর্থিক ইবাদাতেরই হয় আর মৃত ব্যক্তি যদি কোন সম্পদ রেখে না গিয়ে থাকে, তাহলে তার ওয়ারিশদের জন্য আর্থিক ইবাদাতের মানত পূরণ করা ওয়াজিব নয়। তবে মৃত ব্যক্তি যদি সম্পদ রেখে গিয়ে থাকে তাহলে সে অছিয়ত করে থাকুক বা না থাকুক এ ক্ষেত্রে তার ওয়ারিশদের জন্য আর্থিক ইবাদাতের মানত পূরণ করা ওয়াজিব। (শূরহে মুসলিম লিন নবী, বাযলুল মাজহুদ-শূরহে আবী দাউদ) এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কর্তৃক এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সাদ ইবনে উবাদা রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একটি ফতোয়া জিজেস করলেন। তিনি বললেন : আমার যা ইতিকাল করেছেন। তিনি একটি মানত করেছিলেন। কিন্তু তা পূরণ করতে পারেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বললেন : তুমি তার সে মানত পূরণ করে দাও। (আবু দাউদ, মুসলিম) ইবনে আব্বাস অন্য একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, এক মহিলা সমন্বয় যাত্রা করার সময় মানত করলো, আমি যদি সহী সালামতে জীবিত

ঘরে ফিরে আসতে পারি তাহলে একমাস রোয়া রাখবো। ফিরে আসার পরেই সে মারা গেল। তার বোন ও মেয়ে রসূলুল্লাহর (সা) কাছে এসে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন : তার পক্ষ থেকে তুমি রোয়া রাখো। (আবু দাউদ) আবু দাউদ বুরাইদা থেকে অনুরূপ আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ধরনের মাসযালা জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে সে একই জবাব দিলেন যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে নির্দেশ রয়েছে তা ওয়াজিব অর্থে না মৃত্যুহাব অর্থে তা যেহেতু পরিষ্কার নয় এবং হযরত সা'দ ইবনে উবাদার মায়ের মানত অধিক ইবাদাতের মানত ছিল না শারীরিক ইবাদাতের মানত ছিল তাও স্পষ্ট নয় তাই এ মাসযালার ব্যাপারে ফর্কীহদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নয় : ভাস্ত ও নাজায়েজ প্রকৃতির মানত সম্পর্কে একথা পরিষ্কার যে, তা পূরণ করা ঠিক নয়। তবে এ ধরনের মানতের ক্ষেত্রে কাফ্ফারা দিতে হবে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে হাদীসসমূহের বর্ণনাই যেহেতু তিনি তাই ফিকাহবিদগণও তিনি তিনি মত পোষণ করেছেন। এক শ্রেণীর বর্ণনায় আছে যে, এ অবস্থায় নবী (সা) কাফ্ফার। আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেন্ম হযরত আয়েশা (রা) বর্ণন্য করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : **نَثْرٌ فِي مَعْصِيَةٍ وَكُفَّارَتُهُ كَفَّارَةً يَمِينٌ** “গোনাহের কাজে কোন মানত করা যায় না। এ ধরনের মানতের কাফ্ফারা হলো শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারার মত।” (আবু দাউদ) উকবা ইবনে আমের ঝুহানীর বোনের ব্যাপারে (ওপরে ৪৮ এ যাই কথা উল্লেখ করা হয়েছে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, “সে যেন তার মানত ভঙ্গ করে এবং তিনি দিন রোয়া রাখো।” (মুসলিম, আবু দাউদ) আরেকজন মহিলা যে পায়ে হেঁটে হজ্জ করার মানত করেছিল তার ব্যাপারে নবী (সা) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, “সে যেন বাহনে সওয়ার ইয়ে হজ্জে যায় এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করে।” (আবু দাউদ) ইবনে আবাস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

**مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسْمِمْهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةً يَمِينٌ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةً يَمِينٌ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةً يَمِينٌ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَافَهُ فَلِيَفِبِ -**

“কেউ যদি মানত করে এবং কি মানত করলো তা নির্দিষ্ট না করে তাকে শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হবে। কেউ যদি কোন গোনাহের কাজের মানত করে, তবে তাকে শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হবে। কেউ যদি এমন বিষয়ের মানত করে যা পূরণ করার সাধ্য তার নেই তাকে শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হবে। আর কেউ যদি এমন জিনিসের মানত করে যা পূরণ করার সামর্থ তার আছে, তাহলে তাকে সে মানত পূরণ করতে হবে।” (আবু দাউদ)

অন্য দিকে আছে সেসব হাদীস যা থেকে জানা যায় যে, এসব অবস্থায় কাফ্ফারা দিতে হবে না। ওপরে ৪৮ এ যে ব্যক্তির উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে রোদে দাঁড়িয়ে থাকার

وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حِبَّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۚ إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلَا شُكُورًا ۚ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رِبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيًّا ۝

আর আল্লাহর মহবতে<sup>১</sup> মিসকীন, ইয়াতীম এবং বন্দীকে<sup>২</sup> খাবার দান করে<sup>৩</sup> এবং (তাদেরকে বলে) আমরা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তোমাদের খেতে দিছি। আমরা তোমাদের কাছে এর কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা<sup>৪</sup> পেতে চাই না। আমরা তো আমাদের রবের পক্ষ থেকে সেদিনের আয়াবের তরয়ে ভীত, যা হবে কঠিন বিপদ ভরা অতিশয় দীর্ঘ দিন।

এবৎ কারো সাথে কথা না বলার মানত করেছিল তার কাহিনী উল্লেখ করার পর ইমাম মালেক (র) তাঁর গভৰ্ণ মুয়াভায় লিখেছেন যে, নবী (সা) তাকে মানত তঙ্গ করার নির্দেশদানের সাথে সাথে কাফ্ফারা আদায় করার নির্দেশও দিয়েছিলেন বলে কোন সূত্র থেকেই আমি জানতে পারিনি। হ্যরত আবুদ্বাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَيَدْعُهَا وَلَيَأْتِ  
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنْ تَرَكَهَا كَفَارَتْهَا -

“কেউ কোন বিষয়ে মানত করার পর যদি দেখে যে, অন্য একটি জিনিস তার চেয়ে উত্তম তাহলে সে যেন তা পরিত্যগ করে এবং যেটি উত্তম সেটি গ্রহণ করে। আর এটি ছেড়ে দেয়াই হবে তার কাফ্ফারা।” (আবু দাউদ)

বায়হাকীর মতে এ হাদীসটি এবং হ্যরত আবু হরাইরার রেওয়ায়াতের ‘যে কাজটি উত্তম সেটি করবে আর এরপ করাই এর কাফ্ফারা’ এ অংশটুকু প্রমাণিত নয়। এসব হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম নববী (র) শরহে মুসলিমে লিখেছেন; “ইমাম মালেক (র) শাফেয়ী (র), আবু হানীফা (র), দাউদ যাহেরী এবং সংখ্যাগুরু আলেমদের মতে গোনাহর কাজের মানত বাতিল এবং তা পূরণ না করলে কাফ্ফারা দিতে হবে না। কিন্তু ইমাম আহমাদের (র) মতে কাফ্ফারা দিতে হবে।”

১১. মূল শব্দ হলো **حب** । **على حب** এর **o** শব্দটিকে খাদ্যের সর্বনাম হিসেবে নির্ধারিত করেছেন। তোরা এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, খাদ্য অত্যন্ত প্রিয় ও আকর্ষণীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং নিজেরাই খাদ্যের মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও নেক্কার লোকেরা তা অন্যদেরকে খাওয়ান। ইবনে আবুস ও মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ হলো **على حب الاطعام** অর্থাৎ গরীব ও দুষ্টদের খাওয়ানোর আকাংখা ও উক্সাহের

فَوَقْهُمْ أَلِلَّهِ شَرِذِلَكَ الْيَوْمَ وَلِقَهُمْ نَصْرَةٌ وَسُرُورًا وَجَزِّهُمْ بِمَا صَبَرُوا  
 جَنَّةٌ وَحِرِيرًا<sup>১৪</sup> مُتَكَبِّئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمَسًا وَلَا  
 زَمْهِرِيرًا<sup>১৫</sup> وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَّهَا وَذَلِكَ قُطْوَفَهَا تَلِيلًا<sup>১৬</sup> وَيَطَافُ  
 عَلَيْهِمْ بِأَنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٌ كَانَتْ قَوَارِيرًا<sup>১৭</sup> قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ  
 قَلْرُوهَا تَقِيلِيرًا<sup>১৮</sup> وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِرَاجِهَا زَنجِيلًا<sup>১৯</sup>

আগ্নাহ তা'আলা তাদেরকে সেদিনের অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ দান করবেন।<sup>১৫</sup> আর তাদের সবরের বিনিময়ে<sup>১৬</sup> তাদেরকে জামাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন। তারা সেখানে উচু আসনের ওপরে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রোদের উভারপ কিংবা শীতের তীব্রতা তাদের কষ্ট দেবে না। জামাতের বৃক্ষরাজির ছায়া তাদের ওপর ঝুকে পড়ে ছায়া দিতে থাকবে। আর তার ফুলরাজি সবসময় তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে (তারা যেভাবে ইচ্ছা চয়ন করতে পারবে)। তাদের সামনে রৌপ্য পাত্র<sup>১৭</sup> ও বৃছ কাঁচের পাত্রসমূহ পরিবেশিত হতে থাকবে। কাঁচ পাত্রও হবে রৌপ্য জাতীয় ধাতুর<sup>১৮</sup> যা (জামাতের ব্যবস্থাপকরা) যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করে রাখবে।<sup>১৯</sup> সেখানে তাদের এমন সূরা পাত্র পান করানো হবে যাতে শুকনো আদার সংমিশ্রণ থাকবে।

কারণে তারা এ কাজ করে থাকে। হ্যরত ফুদাইল ইবনে আয়াহ ও আবু সুলায়মান আদ-দারানী বলেন, তারা আগ্নাহ তা'আলার মহবতে একুশ করে। আমাদের মতে প্রবর্তী আয়াতাখ্য আমরা আগ্নাহের সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যেই তোমাদের র্যাওয়াচ্ছ। এ অর্থকেই সমর্থন করে।

১২. প্রাচীনকালে রীতি ছিল বন্দীদের হাতকড়া ও বেঢ়ী পরিয়ে প্রতিদিন বাইরে বের করে আনা হতো। তারপর তারা রাস্তায় রাস্তায় ও মহস্তায় মহস্তায় ভিক্ষা করে ক্ষুধা নিবারণ করতো। প্রবর্তীকালে ইসলামী সরকার এ কৃপথকে উচ্ছেদ করে। (কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা ১৫০, মুদ্রণ ১৩২ হিঃ) এ আয়াতে বন্দী বলতে কাফের হোক বা মুসলমান, যুদ্ধবন্দী হোক বা অপরাধের কারণে বন্দী হোক সব রকম বন্দীকে বুঝানো হয়েছে। বন্দী অবস্থায় তাদেরকে খাদ্য দেয়া হোক বা ভিক্ষা করানো হোক, সর্বাবস্থায় একজন অসহায় মানুষকে—যে তার খাবার সংগ্রহের জন্য নিজে কোন চেষ্টা করতে পারে না—খাবার দেয়া অতি বড় নেকী ও সওয়াবের কাজ।

১৩. কোন গরীবকে খেতে দেয়া যদিও বড় নেকীর কাজ, কিন্তু কোন অভাবী মানুষের অন্যান্য অভাব পূরণ করাও একজন শুধুত মানুষকে খেতে দেয়ার মতই নেক কাজ। যেমন কেউ কাপড়ের মুখাপেক্ষী, কেউ অসুস্থ তাই চিকিৎসার মুখাপেক্ষী অথবা কেউ ঝণঝণ্ট, পাওনাদার তাকে অস্থির ও অতিষ্ঠ করে তুলছে। এসব লোককে সাহায্য করা খাবার খাওয়ানোর চেয়ে কম নেকীর কাজ নয়। তাই এ আয়াতটিতে নেকীর একটি বিশেষ অবস্থা ও ক্ষেত্রকে তার গুরুত্বের কারণে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে মাত্র। অন্যথায় এর মূল উদ্দেশ্য অভাবীদের সাহায্য করা।

১৪. গরীবদের খাবার দেয়ার সময় মুখে একথা বলতে হবে এমনটা জরুরী নয়। মনে মনেও একথা বলা যেতে পারে। আল্লাহর কাছে মুখে বলার যে মর্যাদা এভাবে বলারও সে একই মর্যাদা। তবে একথা মুখে বলার উপরে করা হয়েছে এ জন্য যে, যাকে সাহায্য করা হবে তাকে যেন নিশ্চিত করা যায় যে, আমরা তার কাছে কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা অথবা বিনিয়ম চাই না, যাতে সে চিন্তামুক্ত হয়ে খাবার গ্রহণ করতে পারে।

১৫. অর্থাৎ চেহারার সজীবতা ও মনের আনন্দ। অন্য কথায় কিয়ামতের দিনের সমস্ত কঠোরতা ও ভয়াবহতা শুধু কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে। নেক্কার লোকেরা সেদিন কিয়ামতের সব রকম দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে এবং আনন্দিত ও উৎসুক হবে। একথাটিই সূরা আবিয়াতে এভাবে বলা হয়েছে; “চরম হতবুদ্ধিকর সে অবস্থা তাদেরকে অস্থির ও বিহুল করবে না। ফেরেশতারা অগ্রসর হয়ে অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাদের গ্রহণ করবে এবং বলবে এটা তোমাদের সেদিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হতো।” (আয়াত, ১০৩) এ বিষয়টিই সূরা নাম্মে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এভাবে: “যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে সে তার তুলনায় অধিক উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। এসব লোক সেদিনের ভয়াবহতা থেকেও নিরাপদ থাকবে।” (আয়াত, ৮৯)

১৬. এখানে ‘সবর’ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে সৎকর্মশীল ইমানদারদের গোটা পাথির জীবনকেই ‘সবর’ বা দৈর্ঘ্যের জীবন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জ্ঞান হওয়ার বা ইমান আনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন ব্যক্তির নিজের অবৈধ আশা আকাঙ্খাকে অবদমিত করা, আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ মেনে চলা, আল্লাহর নির্ধারিত ফরয়সমূহ পালন করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের সময়, নিজের অর্থ-সম্পদ, নিজের শ্রম, নিজের শক্তি ও যোগ্যতা এমনকি প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রাণ পর্যন্ত কুরবানী করা, আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং সমস্ত লোভ-লালসা ও আকর্ষণকে পদাঘাত করা, সত্য ও সঠিক পথে চলতে যেসব বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট আসে তা সহ্য করা, হারাম পছ্চায় লাভ করা যায় এবং প্রতিটি স্বার্থ ও তোগের উপকরণ পরিত্যাগ করা, ন্যায় ও সত্যপ্রীতির কারণে যে ক্ষতি, মর্মবেদনা ও দুঃখ-কষ্ট এসে থারে তা বরদাশত করা—এসবই আল্লাহর এ ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে করা যে, এ সদাচরণের সূফল এ পৃথিবীতে নয় বরং মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবনে পাওয়া যাবে। এটা এমন একটা কর্মপূর্বা যা মু'মিনের গোটা জীবনকেই সবরের জীবনে রূপান্তরিত করে। এটা সার্বক্ষণিক সবর, স্থায়ী সবর, সর্বাত্মক সবর এবং জীবনব্যাপী সবর। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ৬০; আলে ইমরান, টীকা ১৩, ১০৭, ১৩১; আল আন'আম, টীকা ২৩; আল আনফাল, টীকা ৩৭, ৪৭; ইউনুস, টীকা ৯; হৃদ,

عَيْنَا فِيهَا تَسْمَى سَلَسِيلًا وَيُطَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانْ مَخْلُونَ إِذَا  
رَأَيْتُمْ حَسِبَتُمْ لَؤْلَؤًا مُنْتَهَرًا وَإِذَا رَأَيْتُمْ رَأْيَتْ نَعِيمًا وَمَلَكًا  
كَبِيرًا عَلَيْهِمْ نِيَابٌ سَنَلٌ خَضْرٌ وَاسْبِرْقٌ وَحَلْوَا أَسَاوِرٌ مِنْ  
فَضْلٍ وَسَقِيمٌ رَبْمَرْ شَرَابًا طَهُورًا إِنْ هُنَّ أَكَانَ لَكَمْ جَاءَ وَكَانَ  
سَعِيكَمْ شَكُورًا



এটি জানাতের একটি ঝর্ণা যা সালসাবীল নামে অভিহিত।<sup>২০</sup> তাদের সেবার জন্য এমন সব কিশোর বালক সদা তৎপর থাকবে যারা চিরদিনই কিশোর থাকবে। তুমি তাদের দেখলে মনে করবে যেন ছড়ানো ছিটানো মুক্তা।<sup>২১</sup> তুমি সেখানে যে দিকেই তাকাবে সেদিকেই শুধু নিয়ামত আর ভোগের উপকরণের সমাহার দেখতে পাবে এবং বিশাল সাম্রাজ্যের সাজ-সরঞ্জাম তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে।<sup>২২</sup> তাদের পরিধানে থাকবে মিহি রেশমের সবুজ পোশাক এবং মথমল ও সোনালী কিংখাবের বন্দরাজি।<sup>২৩</sup> আর তাদেরকে রৌপ্যের কঙ্কন পরানো হবে।<sup>২৪</sup> আর তাদের রব তাদেরকে অতি পবিত্র শরাব পান করাবেন।<sup>২৫</sup> এ হচ্ছে তোমাদের জন্য প্রতিদান। কারণ, তোমাদের কাজ কর্ম মূল্যবান প্রয়োগিত হয়েছে।<sup>২৬</sup>

টীকা ১১; আর রাদ, টীকা ৩৯; আল নাহল, টীকা ৯৮; মারযাম, টীকা ৪০; আল ফুরকান, টীকা ৯৪; আল কাসাস, টীকা ৭৫, ১০০; আল আনকাবুত, টীকা ৯৭; লোকমান, টীকা ২৯, ৫৬; আস সাজদা, টীকা ৩৭; আল আহ্যাব, টীকা ৫৮; আয় মুমার, টীকা ৩২; হা-মীম আস সাজদা, টীকা ৩৮; আশ শুরা, টীকা ৫৩।)

১৭. সূরা যুখরুফের ৭১ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের সামনে সবসময় স্বর্ণপাত্রসমূহ পরিবেশিত হতে থাকবে। এ থেকে জানা গেল যে, সেখানে কোন সময় স্বর্ণপাত্র এবং কোন সময় রৌপ্য পাত্র ব্যবহার করা হবে।

১৮. অর্থাৎ তা হবে রৌপ্যের তৈরী কিন্তু কাঁচের মত স্বচ্ছ। এ ধরনের রৌপ্য এ পৃথিবীতে নেই। এটা জানাতের একটা বৈশিষ্ট যে, সেখানে কাঁচের মত স্বচ্ছ রৌপ্যপাত্র জানাতবাসীদের দণ্ডরখানে পরিবেশন করা হবে।

১৯. অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার চাহিদা অনুপাতে পানপাত্র তরে তরে দেয়া হবে। তা তাদের চাহিদার চেয়ে কমও হবে না আবার বেশীও হবে না। অন্য কথায়, জানাতের খাদেমরা এত সতর্ক এবং সুবিবেচক হবে যে, যাকে তারা পানপাত্র পরিবেশন করবে সে কি পরিমাণ শরাব পান করতে চায় সে সম্পর্কে তারা পুরোপুরি আন্দাজ করতে পারবে।

(জামাতের শরাবের বৈশিষ্ট সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আসু সাফফাত, ৪৫ থেকে ৪৭ আয়াত, টীকা ২৪ থেকে ২৭; সূরা মুহায়াদ, আয়াত ১৫, টীকা ২২; আত্ তুর, আয়াত ২৩, টীকা ১৮; আল উয়াকিয়া, আয়াত ১৯, টীকা ১০।)

২০. আরবরা শরাবের সাথে শুকনো আদা মেশানো পানির সংমিশ্রণ খুব পছন্দ করতো। তাই বলা হয়েছে, সেখানেও তাদের এমন শরাব পরিবেশন করা হবে যাতে শুকনো আদার সংমিশ্রণ থাকবে। কিন্তু তা এমন সংমিশ্রণ হবে না যে, তার মধ্যে শুকনো আদা মিশিয়ে তারপর পানি দেয়া হবে। বরং তা হবে একটা প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারা যার মধ্যে আদার বোশ্বু থাকবে কিন্তু তিক্ততা থাকবে না। সে জন্য তার নাম হবে ‘সালসাবীল’। ‘সালসাবীল’ অর্থ এমন পানি যা মিঠা, মৃদু ও সুস্থান্ত হওয়ার কারণে সহজেই গলার নীচে নেমে যায়। অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে ‘সালসাবীল’ শব্দটি এখানে উক্ত ঝর্ণাধারার বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষ হিসেবে নয়।

২১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আস সাফফাত, টীকা ২৬; আত্ তুর, টীকা ১৯; আল উয়াকিয়া, টীকা ৯।

২২. অর্থাৎ দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি যত দরিদ্র ও নিসরলই হোক না কেন সে যখন তার নেক কাজের কারণে জামাতে যাবে তখন সেখানে এমন শানশওকত ও মর্যাদার সাথে থাকবে যেন সে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিগতি।

২৩. এই একই বিষয় সূরা আল কাহফের ৩১ আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

وَلَبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكَبِّئِينَ فِيهَا عَلَىٰ  
الْأَزْرَاكِ -

“তারা (অর্থাৎ জামাতবাসীরা) যিহি রেশম এবং মখমল ও কিংখাবের সবুজ পোশাক পরিধান করবে। সুউচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসবে।”

এ কারণে সেসব মুফাস্সিরদের মতামত সঠিক বলে মনে হয় না যারা বলেন, এর অর্থ এমন কাপড় যা তাদের আসন ও পালংকের ওপর ঝুলত অবস্থায় থাকবে অথবা সেসব কিশোর বালকদের পোশাক-পরিচ্ছদ যারা তাদের সেবা ও খেদমতের জন্য সদা তৎপর থাকবে।

২৪. সূরা আল কাহফের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে, **بِحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَارِ مَنْ ذَهَبَ** “তাদের সেখানে স্বর্ণের কংকন বা চুড়ি দ্বারা সজ্জিত ও শোভিত করা হবে।” এ একই বিষয় সূরা ইজ্জের ২৩ আয়াত এবং সূরা ফাতেরের ৩৩ আয়াতেও বলা হয়েছে। এসব আয়াত একত্রে মিলিয়ে দেখলে তিনটি অবস্থা হওয়া সম্ভব বলে মনে হয়। এক, তারা ইচ্ছা করলে কোন সময় সোনার কংকন পরবে আবার ইচ্ছা করলে কোন সময় রূপার কংকন পরবে। তাদের ইচ্ছা অনুসারে দু’টি জিনিসই প্রস্তুত থাকবে। দুই, তারা সোনা ও রূপার কংকন এক সাথে পরবে। কারণ দু’টি একত্র করলে সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি পায়। তিন, যার ইচ্ছা সোনার কংকন পরিধান করবে এবং যার ইচ্ছা রূপার কংকন ব্যবহার করবে। এখানে প্রশ্ন হলো, অলংকার পরিধান করে যেয়েরা, কিন্তু পুরুষদের অলংকার পরানোর অর্থ ও তাৎপর্য কি হতে পারে? এর জবাব হলো, প্রাচীনকালে রাজা-বাদশাহ এবং নেতা

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا١٠ فَاصْبِرْ لِحَكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ  
مِنْهُمْ أَثْمًا١١ وَكُفُورًا١٢ وَإِذْ كَرِأْ سِرِّ رَبِّكَ بَكْرَةً وَأَصِيلًا١٣ وَمِنَ الْيَلِ  
فَاسْجُلْ لَهُ وَسِبِّحْهُ لِيَلَّا طُوِيلًا١٤ إِنْ هُوَ لَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَنْدِرُونَ  
وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا١٥ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَلَّ دَنَا سَرْهُرٌ وَإِذَا شَئْنَا  
بَدَلَ لَنَا أَمْتَالَهُمْ تَبَدِّلُ يَلَّا١٦ إِنْ هُنْ هُنٌْ قَلْ كِرَّةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى  
رَبِّهِ سَبِيلًا١٧ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا  
حِكْمَيَا١٨ يَنْخِلُ مِنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۖ وَالظَّالِمِينَ أَعْدَلَهُمْ  
عَنْ أَبَابِ الْيَمَّا١٩

## ২ ঝংকু'

হে নবী, আমিই তোমার ওপরে এ কুরআন অঞ্জ করে নাযিল করেছি।<sup>২৭</sup>  
 তাই তুমি ধৈর্যের সাথে তোমার রবের হৃকুম পালন করতে থাকো।<sup>২৮</sup> এবং এদের  
 মধ্যকার কোন দুষ্কর্মশীল এবং সত্য অমান্যকারীর কথা শুনবে না।<sup>২৯</sup> সকাল  
 সঙ্গ্যায় তোমার রবের নাম শ্রবণ করো। রাতের বেলায়ও তার সামনে সিজ্দায়  
 অবনত হও। রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর তাসবীহ অর্ধাং পবিত্রতা বর্ণনা করতে  
 থাকো।<sup>৩০</sup> এসব লোক তো দ্রুত লাভ করা যায় এমন জিনিসকে (দুনিয়াকে)  
 ভালবাসে এবং ভবিষ্যতে যে কঠিন দিন আসছে তাকে উপেক্ষা করে চলছে।<sup>৩১</sup>  
 আমিই এদের সৃষ্টি করেছি এবং এদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সংজ্ঞাহল মজবুত  
 করেছি। আর যখনই চাইবো তাদের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে দেব।<sup>৩২</sup> এটি  
 একটি উপদেশ বাণী। এখন কেউ চাইলে তার রবের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন  
 করতে পারে। তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না যদি আল্লাহ না চান।<sup>৩৩</sup> আল্লাহ  
 সর্বজ্ঞ ও সুবিজ্ঞ। যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তাঁর রহমতের মধ্যে শামিল করেন। আর  
 জালেমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি।<sup>৩৪</sup>

ও সমাজপতিদের রীতি ছিল তারা হাত, গলা ও মাথার মুকুটে নানা রকমের অলংকার  
 ব্যবহার করতো। আমাদের এ যুগেও বৃটিশ ভারতের রাজা ও নবাবদের মধ্যে পর্যন্ত এ

বীতি প্রচলিত ছিল। সূরা যুখরফে বলা হয়েছে, হয়রত মূসা (আ) যখন সাদাসিধে পোশাকে শুধু একখনা নাটি হাতে নিয়ে ফেরাউনের রাজ দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন যে, তিনি বিশ-জাহানের রব আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রসূল তখন ফেরাউন তার সভাসদদের বললো : সে এ অবস্থায় আমার সামনে এসেছে। দৃঢ় বটে।

**فَلَوْلَا أَقْرَى عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكَةُ مُقْتَرِنَّينَ**

“সে যদি যমীন ও আসমানের বাদশাহৰ পক্ষ থেকেই প্রেরিত হয়ে থাকতো তাহলে তার সোনার কংকন নাই কেন? কিংবা ফেরেশতাদের একটি বাহিনী অস্তত তার আরদালী হয়ে আসতো।” (আয় যুখরফ, ৫৩ আয়াত)

২৫. ইতিপূর্বে দু’ প্রকার শরাবের কথা বলা হয়েছে। এর এক প্রকার শরাবের মধ্যে কর্পূরের সুগঞ্জি যুক্ত ঝর্ণার পানির সংযোগ থাকবে। অন্য প্রকারের শরাবের মধ্যে ‘ঘানজাবীল’ ঝর্ণার পানির সংযোগ থাকবে। এ দু’ প্রকার শরাবের কথা বলার পর এখানে আবার আর একটি শরাবের উল্লেখ করা এবং সাথে সাথে একথা বলা যে, তাদের রব তাদেরকে অত্যন্ত পবিত্র শরাব পান করাবেন এর অর্থ এই যে, এটা অন্য কোন প্রকার উৎকৃষ্টতর শরাব হবে যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে তাদের পান করানো হবে।

২৬. মূল বাক্য হলো, **كَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا** অর্থাৎ তোমাদের কাজ-কর্ম মূল্যবান প্রমাণিত হয়েছে। **سَعْيٍ** অর্থ বান্দা সারা জীবন দুনিয়াতে যেসব কাজ-কর্ম আঙ্গাম দিয়েছে বা দেয় তা সবই। যেসব কাজে সে তার শর্ম দিয়েছে এবং যেসব লক্ষে সে চেষ্টা-সাধনা করেছে তার সমষ্টি হলো তার **سَعْيٍ** আর তা মূল্যবান প্রমাণিত হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার কাছে তা মূল্যবান বলে স্বীকৃত হয়েছে। শোকরিয়া কৃথাটি যখন বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর জন্য হয় তখন অর্থ হয় তাঁর নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। আর যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য হয় তখন তার অর্থ হয় আল্লাহ তা'আলা তার কাজ-কর্মের মূল্য দিয়েছেন। এটি মনিব বা প্রভুর একটি বড় মেহেরবানী যে, বান্দা যখন তাঁর মর্জি অনুসারে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য আঙ্গাম দেয় মনিব তখন তার মূল্য দেন বা স্বীকৃতি দেন।

২৭. এখানে বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংযোগ করা হলেও বক্তব্যের মূল লক্ষ কাফেররা। মক্কার কাফেররা বলতো, এ কুরআন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে চিন্তা-ভাবনা করে রচনা করছেন। অন্যথায়, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন ফরমান এলে তা একবারেই এসে যেতো। কুরআনে কোন কোন যায়গায় তাদের এ অভিযোগ উদ্ভূত করে তার জবাব দেয়া হয়েছে। (উদাহরণসংক্রান্ত দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নাহল, টীকা ১০২, ১০৪, ১০৫, ১০৬; বনী ইসরাইল, টীকা, ১১৯।) এখানে তাদের অভিযোগ উদ্ভূত না করেই আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেছেন যে, কুরআনের নাযিলকারী আমি নিজেই। অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রচয়িতা নন। আমি নিজেই তা ক্রমান্বয়ে নাযিল করছি। অর্থাৎ আমার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার দাবী হলো, আমার বাণীকে একই সাথে একটি গ্রন্থের আকারে নাযিল না করে অল্প অল্প করে নাযিল করা।

২৮. অর্থাৎ তোমার 'রব' তোমাকে যে বিরাট কাজ আজ্ঞাম দেয়ার আদেশ দিয়েছেন তা আজ্ঞাম দেয়ার পথে যে দৃঢ়-গাতনা ও বিপদ-মুসিবত আসবে তার জন্য 'সবর' করো। যাই ঘটুক না কেন সাহস ও দৃঢ়তার সাথে তা বরদাশত করতে থাকো এবং এ দৃঢ়তা ও সাহসিকতায় যেন কোন বিচুতি আসতে না পারে।

২৯. অর্থাৎ তাদের কারো চাপে পড়ে দীনে হকের প্রচার ও প্রসারের কাজ থেকে বিরত হয়ো না এবং কোন দুর্ভৰ্ষালীর কারণে দীনের নৈতিক শিক্ষায় কিংবা সত্য অঙ্গীকারকারীর কারণে দীনের আকীদা-বিশ্বাসে বিলুপ্তি পরিবর্তন করতেও প্রস্তুত হয়ো না। যা হারাম ও নাজায়ে তাকে খোলাখুলি হারাম ও নাজায়ে বলো, এর সমালোচনার ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় হওয়ার জন্য কোন দুর্ভৰ্ষালী যতই চাপ দিক না কেন। যেসব আকীদা-বিশ্বাস বাতিল তাকে খোলাখুলি বাতিল বলে ঘোষণা করো। আর যা হক তাকে প্রকাশ্যে হক বলে ঘোষণা করো, এ ক্ষেত্রে কাফেররা তোমার মুখ বক্ষ করার জন্য কিংবা এ ব্যাপারে কিছুটা নমনীয়তা দেখানোর জন্য তোমার উপর যত চাপই প্রয়োগ করুক না কেন।

৩০. কুরআনের প্রতিষ্ঠিত রীতি হলো যেখানেই কাফেরদের মোকাবিলায় দৈর্ঘ ও দৃঢ়তা দেখানোর উপদেশ দেয়া হয়েছে সেখানে এর পরপরই আল্লাহকে ঝরণ করার ও নামায়ের হৃকুম দেয়া হয়েছে। এ থেকে আপনা আপনি প্রকাশ পায় যে, সত্য দীনের পথে সত্যের দুশ্মনদের বাধার মোকাবিলা করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা এভাবেই অর্জিত হয়। সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহকে ঝরণ করার অর্থ সবসময় আল্লাহকে ঝরণ করাও হতে পারে। তবে সময় নির্দিষ্ট করে যখন আল্লাহকে ঝরণ করার হৃকুম দেয়া হয় তখন তার অর্থ হয় নামায়। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম বলেছেন : **وَإِنَّكَ رَأْسُمْ رِبِّكَ أَصْلَأْتَ بُكْرَةً وَأَصْلَأْتَ آرَبَيْ** অর্থাৎ আরবী ভাষায় শব্দের অর্থ সকাল। আর অস্তীল শব্দটি সূর্য মাধ্যার উপর থেকে হেলে পড়ার সময় হতে সূর্যস্ত পর্যন্ত সময় বুঝাতে ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে যোহর এবং আসরের সময়ও শামিল। এরপরে বলেছেন : **عَمَّنِ الْبَلْ مَفَاسِدُ** । রাত শুরু হয় সূর্যাস্তের পরে। তাই রাতের বেলা সিজ্দা করার নির্দেশের মধ্যে মার্গারিব এবং 'ঈশার দু' ওয়াকের নামায়ই অত্রভুক্ত হয়ে যায়। এর পরের কথাটি "রাতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা কর" তাহাজুদ নামায়ের প্রতি স্পষ্টভাবে ইঠিগত করে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, বনী ইসরাইল, চীকা ৯২ থেকে ৯৭; আল মুয়াম্বিল, চীকা ২।) এ থেকে একথাও জানা গেল যে, ইসলামে প্রথম থেকে এগুলোই ছিল নামায়ের সময়। তবে সময় ও রাক'আত নির্দিষ্ট করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার হৃকুম দেয়া হয়েছে মেরাজের সময়।

৩১. অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রের এসব কাফেররা যে কারণে আখলাক ও আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে গোমরাহীকে আঁকড়ে ধরে থাকতে আগ্রহী এবং তাদের কান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'দাওয়াতে হক' বা সত্যের আহবানের প্রতি অমনযোগী, প্রকৃতপক্ষে সে কারণ হলো, তাদের দুনিয়া পূজা, আধেরাত সম্পর্কে নিরন্দিষ্টতা, উদাসীনতা ও বেপরোয়া ভাব। তাই একজন সত্যিকার আল্লাহভীক্ষণ মানুষের পথ এবং এদের পথ এতটা তিন যে, এ দুটি পথের মধ্যে সমরোতার কোন 'প্রশঁই' উঠতে পারে না।

৩২. মূল বাক্য হলো, **إِذَا شَئْنَا بَدْلًا أَمْتَاهُمْ تَبْدِيلًا** । এ আয়াতাশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হতে পারে, যখনই ইচ্ছা আমি তাদের ধর্ম করে তাদের স্থলে অন্য মানুষদের নিয়ে আসতে পারি, যারা তাদের কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণে এদের থেকে তির প্রকৃতির হবে। এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, যখনই ইচ্ছা আমি এদের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে দিতে পারি। অর্থাৎ আমি যেমন কাউকে সৃষ্টি ও নির্মূল অংগ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী করে সৃষ্টি করতে সক্ষম তেমনি কাউকে পুরোপরি পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিতে এবং কাউকে আঁশিক পক্ষাঘাতের দ্বারা মৃত্যু বৈকা করে দিতে আবার কাউকে কোন রোগ বা দুর্ঘটনার শিকার বানিয়ে পংশু করে দিতেও সক্ষম। তৃতীয় অর্থ হলো, যখনই ইচ্ছা মৃত্যুর পর আমি এদেরকে পুনরায় অন্য কোন আকার আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারি।

৩৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল মুদ্দাস্সির, টীকা ৪১ (তাছাড়াও দেখুন, সূরা আদ দাহরের ১ নং পরিশিষ্ট)।

৩৪. এ সূরার ভূমিকাতে আমরা এর ব্যাখ্যা করেছি। (তাছাড়াও সূরা আদ দাহরের ২ নং পরিশিষ্ট দেখুন।)

## পরিশিষ্ট—১

### ৩৩নং টীকার সাথে সংশ্লিষ্ট

এ আয়াতগুলোতে তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, কেউ চাইলে তার রবের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারে। দুই, যদি আল্লাহ না চান তাহলে শুধু তোমদের চাওয়ায় কিছুই হয় না। তিনি, আল্লাহ অত্যন্ত কুশলী, সূক্ষ্মদর্শী ও মহাজ্ঞানী। এ তিনটি কথা সম্পর্কে যদি ভালভাবে চিন্তা করা যায় তাহলে মানুষের বাছাই বা পছন্দ করার স্বাধীনতা এবং আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যকার সম্পর্ক খুব ভালভাবেই বুঝা যায় এবং তাকদীর সম্পর্কে মানুষের মনে যেসব জটিলতা দেখা যায় তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রথম আরাত থেকে জানা যায় যে, এ পৃথিবীতে মানুষকে যে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে তা শুধু এতটুকু যে, এখানে জীবন যাপনের জন্য যেসব তির পথ তার সামনে আসে সে তার মধ্য থেকে কোন একটি পথ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেবে। গ্রহণ বা বাছাই করার এরপ অনেক স্বাধীনতা (Freedom of Choice) আল্লাহ তা'আলা তাকে দিয়েছেন। যেমন, এক ব্যক্তির সামনে যখন তার জীবিকা উপার্জনের প্রশ্ন দেখা দেয় তখন তার সামনে অনেকগুলো পথ থাকে। এসব পথের মধ্যে কিছু সংখ্যক থাকে হালাল পথ। যেমন, সবরকম বৈধ ধর্মকর্ম, চাকুরি-বাকুরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, অথবা শির ও কারিগরী কিংবা কৃষি। আবার কিছু সংখ্যক থাকে হারাম পথ। যেমন, চুরি-ডাকাতি, রাহজানি, পকেট মারা, ব্যতিচার, সুদবোরী, জুয়া, ঘূষ এবং হারাম প্রকৃতির সবরকম চাকুরি-বাকুরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি। এসব পথের মধ্য থেকে কোনু পথটি সে বেছে নেবে এবং কিভাবে সে তার জীবিকা উপার্জন করতে চায় সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইখতিয়ার মানুষকেই দেয়া হয়েছে। অনুরূপ নৈতিক চরিত্রেরও বিভিন্ন ঢং বা প্রকৃতি

আছে। এক দিকে আছে দীনদারী, আমানতদারী, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, ইনসাফ, দয়ামায়া, সমবেদনা এবং সতীত্ব ও পবিত্রতার মত উন্নত স্বত্ত্বাব ও গুণাবলী। অন্যদিকে আছে বদমাইশী, নীচতা, জুনুম-অত্যাচার, বেসমানী, বখাটেপেনা, বেহদাপনা ও অভদ্রতার মত ইন স্বত্ত্বাবসমূহ। এর মধ্য থেকে যে ঢং ও প্রকৃতির নৈতিক চরিত্রের পথ বা দোষ-গুণ সে অবলম্বন করতে চায় তা করার পূর্ণ স্বাধীনতা তার আছে। আদর্শ ও ধর্মের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এ ক্ষেত্রেও মানুষের সামনে বহু পথ খোলা আছে। নাস্তিকতা তথা আল্লাহকে অবীকার করা, শিরক ও মৃত্তিপূজা, শিরক ও তাওহীদের বিভিন্ন স্বর্যমূল্য এবং আল্লাহর আনুগত্যের একমাত্র নিখাদ ধর্ম কুরআন যার শিক্ষা দেয়। এর মধ্যেও মানুষ কোনটিকে গ্রহণ করতে চায় সে সিদ্ধান্ত নেয়ার ইখতিয়ারও মানুষের হাতেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জোর করে তার ওপরে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন না যে, সে নিজে হালাল রঞ্জি থেতে চায় কিন্তু আল্লাহ তাকে হারামখোর হতে বাধ্য করছেন অথবা সে কুরআনের অনুসরণ করতে চায় কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে জোরপূর্বক নাস্তিক, মুশরিক অথবা কাফের বানিয়ে দিচ্ছেন। অথবা সে চায় সৎ মানুষ হতে কিন্তু আল্লাহ খামকা তাকে অসৎ বানিয়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু পছন্দ ও নির্বাচনের এ স্বাধীনতার পরেও মানুষের যা ইচ্ছা তাই করতে পারা আল্লাহর ইচ্ছা, তার অনুমোদন ও তাওফীক দানের ওপর নির্ভর করে। মানুষ যে কাজ করার আকাংখা, ইচ্ছা বা সংকলন করেছে তা মানুষকে করতে দেয়ার ইচ্ছা যদি আল্লাহর থাকে তবেই সে তা করতে পারে। অন্যথায় সে যত চেষ্টাই করুক না কেন আল্লাহর অনুমোদন ও তার ইচ্ছা ছাড়া সে কিছুই করতে সক্ষম নয়। দ্বিতীয় আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। এ ব্যাপারটিকে এভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন যে, দুনিয়ার সব মানুষকে যদি সব ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দিয়ে দেয়া হতো আর এ বিষয়টিও তার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া হতো যে, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে তাহলে সারা দুনিয়ার সব ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা ধ্রংস এবং ছির ভির হয়ে যেতো। যাকে ইচ্ছা হত্যা করার অবাধ স্বাধীনতা পেলে একজন হত্যাকারীই সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করার জন্য যথেষ্ট ছিল। একজন পকেটমারের যদি এ ক্ষমতা থাকতো যে, যার পকেট ইচ্ছা সে মারতে পারবে তাহলের পৃথিবীর কোন মানুষের পকেটই তার হাত থেকে রক্ষা পেতো না। কোন চোরের হাত থেকে কারো সম্পদ রক্ষা পেতো না, কোন ব্যতিচারীর হাত থেকে কোন নারীর সতীত্ব ও সত্ত্ব রক্ষা পেতো না এবং কোন ডাকাতের হাত থেকে কারো বাড়ি-ঘর রক্ষা পেতো না, যদি এদের সবারই যথেষ্ঠাচারের পূর্ণ ইখতিয়ার বা ক্ষমতা থাকতো। তাই মানুষ ন্যায় বা অন্যায় যে পথেই চলতে ইচ্ছা করুক না কেন সে পথে চলতে দেয়া না দেয়ার বিষয়টি আল্লাহ নিজের হাতেই রেখে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি গোমরাহীর পথ বর্জন করে সত্ত্বের পথ অবলম্বন করতে চায় আল্লাহর ইচ্ছা এবং তাওফীক লাভ করেই কেবল সে সত্য পথে চলার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, গোমরাহীকে বর্জন করে হিদায়াতকে বাছাই ও গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত খোদ মানুষকেই নিতে হবে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা জোরপূর্বক যেমন কাউকে চোর, খুনী, নাস্তিক বা মুশরিক বানান না তেমনি জোরপূর্বক তাকে ইমানদারও বানান না।

অতগর তৃতীয় আয়াতে এ ভাস্ত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার এ ইচ্ছা আবার নিয়ম-বিধি মুক্ত স্বেচ্ছারম্ভনক (Arbitrury) ব্যাপার কিনা এ ভাস্ত ধারণা

দূর করার জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এবং حكيم علیم অর্থাৎ তিনি যেমন সর্বজ্ঞ ও মহাজানী, তেমনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী কৃশলী ও প্রজ্ঞাময়। তিনি যা কিছু করেন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাথেই করেন। তাই তাঁর সিদ্ধান্তে ভূল-ক্রটি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কাকে কি 'তাওফীক' দিতে হবে এবং কি দিতে হবে না, কাকে কি কাজ করতে দেয়া উচিত আর কাকে দেয়া উচিত নয় সে সিদ্ধান্ত তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং যুক্তি ও কৌশলের ভিত্তিতে গ্রহণ করেন। মানুষকে তিনি যতটা অবকাশ দেন এবং উপায়-উপকরণকেও যতটা তাঁর অনুকূল করে দেন তাল হোক বা মল হোক মানুষ নিজের ইচ্ছানুসারে ঠিক ততটা কাজই করতে পারে। হিদায়াতলাতের ব্যাপারটাও এ নিয়মের বাইরে নয়। কে হিদায়াতের উপযুক্ত আর কে নয় নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলাই তা জানেন এবং নিজের যুক্তি ও কৌশলের ভিত্তিতে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণও তিনিই করে থাকেন।

## পরিশিষ্ট—২

### ৩৪নং ঢিকার সাথে সম্পর্কিত

এ আয়াতে জালেম বলে সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে যাদের কাছে আল্লাহর বাণী এবং তাঁর নবীর শিক্ষা আসার পর তাঁরা অনেক চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, তাঁর আনুগত্য তাঁরা করবে না। এর মধ্যে সেসব জালেমও আছে যারা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে আমরা এ বাণীকে আল্লাহর বাণী এবং এ নবীকে আল্লাহর নবী বলে মানি না। অথবা আল্লাহকেই আদৌ মানি না। আবার সেসব জালেমও আছে যারা আল্লাহ, নবী ও কুরআনকে মানতে অব্যাকার করে না বটে কিন্তু সিদ্ধান্ত তাদের এটাই থাকে যে, তাঁরা তাঁর আনুগত্য করবে না। প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি গোষ্ঠীই জালেম। প্রথম গোষ্ঠীর ব্যাপারটা তো স্পষ্ট। কিন্তু দ্বিতীয় গোষ্ঠীও তাদের চেয়ে কোন অংশে কম জালেম নয়। বরং জালেম হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা মুনাফিক এবং প্রতারকও। তাঁরা মুখে বলে, আমরা আল্লাহকে মানি, কুরআনকে মানি। কিন্তু তাদের মন ও মগজের ফায়সালা হলো, তাঁর অনুসরণ তাঁরা করবে না। আর তাঁরা কাজও করে এর পরিপন্থী। এ দু' শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হলো, আমি তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। দুনিয়াতে তাঁরা যতই নির্ভীক ও বেপরোয়া চলুক, আরামআয়েশে বিভোর থাকুক এবং নিজের বাহাদুরীর ডংকা বাজাক না কেন অবশ্যে তাদের পরিণাম কঠোর শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করা তাদের ভাগ্যলিপিতেই নেই।

# আল মুরসালাত

৭৭

## নামকরণ

প্রথম আয়াতের **وَالمرسلت** শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

## নাথিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার পুরো বিষয়বস্তু থেকে প্রকাশ পায় যে, এটি যাকী যুগের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছিল। এর আগের দু'টি সূরা অর্থাৎ সূরা কিয়ামাহ ও সূরা দাহুর এবং পরের দু'টি সূরা অর্থাৎ সূরা আননবা ও নাথিদাত যদি এর সাথে যিনিয়ে পড়া যায় তাহলে পরিকার বুখা যায় যে, এ সূরাগুলো সব একই যুগে অবতীর্ণ। আর এর বিষয়বস্তুও একই যা বিভিন্ন তৎপৃষ্ঠিতে উপস্থাপন করে মকাবাসীদের মন-মগজে বন্ধূল করা হয়েছে।

## বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য

এর বিষয়বস্তু কিয়ামত ও আখেরাতকে প্রমাণ করা এবং এ সত্যকে অঙ্গীকার করলে কিংবা মেনে নিলে পরিণামে যেসব ফলাফল প্রকাশ পাবে সে বিষয়ে মকাবাসীদের সচেতন করে দেয়।

কুরআন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার যে খবর দিচ্ছেন তা যে অবশ্যই হবে প্রথম সাতটি আয়াতে বাতাসের ব্যবস্থাপনাকে তার সত্যতা ও বাস্তবতার সপক্ষে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এতে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যে, যে অসীম ক্ষমতাশালী সত্তা পৃথিবীতে এ বিশ্বকর ব্যবস্থাপনা কায়েম করেছেন তাঁর শক্তি কিয়ামত সংঘটিত করতে অক্ষম হতে পারে না। আর যে স্পষ্ট যুক্তি ও কৌশল এ ব্যবস্থাপনার পেছনে কাজ করছে তাও প্রমাণ করে যে, আখেরাত অবশ্যই সংঘটিত হওয়া উচিত। কারণ পরম কুশলী মুষ্টার কোন কাজই নির্ধারিত ও উদ্দেশ্যাবীন হতে পারে না। আখেরাত যদি না থাকে তাহলে এর অর্থ হলো, এ গোটা বিশ্ব-জাহান একেবারেই উদ্দেশ্যাবীন।

মকাবাসীরা বারবার বলতো যে, তুমি আমাদের যে কিয়ামতের তয় দেখাচ্ছে তা এনে দেখাও। তাহলে আমরা তা মেনে নেব। ৮ থেকে ১৫ আয়তে তাদের এ দাবীর উল্লেখ না করে এ বলে তার জবাব দেয়া হয়েছে যে, তা কোন খেলা বা তামাশার বস্তু নয় যে, যখনই কোন ঠাট্টাবাজ বা ভাড় তা দেখানোর দাবী করবে তখনই তা দেখিয়ে দেয়া হবে। সেটা তো মানব জাতি ও তার প্রতিটি সদস্যের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফায়সালার দিন। সে জন্য

আল্লাহ তা'আলা একটা বিশেষ সময় ঠিক করে রেখেছেন। ঠিক সে সময়ই তা সংঘটিত হবে। আর যখন তা আসবে তখন এমন ভয়ানক ঝর্ণ নিয়ে আসবে যে, আজ যারা ঠাট্টা-বিদ্বপের ভঙ্গিতে তার দাবী করছে সে সময় তারা দিশেহারা ও অস্থির হয়ে পড়বে। তখন এসব রসূলগণের সাক্ষ অনুসারেই এদের মোকদ্দমার ফায়সালা হবে, যাদের দেয়া খবরকে এসব আল্লাহদ্বোধী আজ অত্যন্ত নিঃশাস্কচিতে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছে। অতপর তারা নিজেরাই জানতে পারবে যে, কিভাবে তারা নিজেদের ধর্ষনের আয়োজন করেছে।

১৬ থেকে ১৮ আয়াত পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে কিয়ামত ও আখেরাত সংঘটিত হওয়া এবং তার অনিবার্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের নিজের ইতিহাস, তার জন্ম এবং যে পৃথিবীতে সে জীবন যাপন করছে তার গঠন, আকৃতি ও বিন্যাস সাক্ষ পেশ করছে যে, কিয়ামতের আসা এবং আখেরাত অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব এবং আল্লাহ তা'আলার প্রাঞ্জলা ও বিচক্ষণতার দাবীও বটে। মানুষের ইতিহাস বলছে, যেসব জাতিই আখেরাত অস্থীকার করেছে পরিণামে তারা বিপর্যাপ্তি হয়েছে এবং ধৰ্ম হয়ে গিয়েছে। এর অর্থ হলো, আখেরাত এমন একটি সত্য যে, যে জাতিরই আচার-আচরণ ও বৈশ্ব-নীতি এর বিপরীত হবে তার পরিণাম হবে সেই অঙ্গের মত যে সামনের দিক থেকে দ্রুত এগিয়ে আসা গাড়ীর দিকে বলাহারার মত এগিয়ে যাচ্ছে। এর আরো একটি অর্থ হলো, বিশ্ব-সাম্রাজ্যের মধ্যে শুধু প্রাকৃতিক আইন (Physical Law) কার্যকর নয়, বরং একটি নৈতিক আইনও (Moral Law) এখানে কার্যকর রয়েছে। আর এ বিধান অনুসারে এ পৃথিবীতেও কাজের প্রতিদান দেয়ার সিলসিলা বা ধারা চালু আছে। কিন্তু দুনিয়ার এ জীবনে প্রতিদানের এ বিধান যেহেতু পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে পারছে না, তাই বিশ্ব-জাহানের নৈতিক বিধান অনিবার্যভাবেই দাবী করে যে, এমন একটি সময় আসা উচিত যখন তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে এবং সেসব ভাল ও মন্দের যথোপযুক্ত প্রতিদান বা শাস্তি দেয়া হবে যা এখানে উপর্যুক্ত প্রতিদান বা পূর্ণস্তর থেকে বঞ্চিত হয়েছিল বা শাস্তি থেকে বেঁচে গিয়েছিল। এর জন্য মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন হওয়া অপরিহার্য। মানুষ দুনিয়ায় ফেডাবে জন্মালাত করে সে বিষয়ে যদি সে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে তার বিবেক-বুদ্ধি—অবশ্য যদি স্বীকৃত বিবেক-বুদ্ধি থাকে—এ বিষয়টি অস্থীকার করতে পারে না যে, যে আল্লাহ নগণ্য বীর্য দ্বারা মানুষ সৃষ্টির সূচনা করে তাকে পূর্ণজ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন সে আল্লাহর পক্ষে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা নিশ্চিতভাবেই সম্ভব। মানুষ সারা জীবন যে পৃথিবীতে বাস করে মৃত্যুর পর তার শরীরের বিভিন্ন অংশ সেখান থেকে উৎপাদ হয়ে যায় না। বরং তার দেহের এক একটি অণু পরমাণু এ পৃথিবীতেই বিদ্যমান থাকে। পৃথিবীর এ মাটির ভাগার থেকেই সে সৃষ্টি হয়, বেড়ে উঠে ও লালিত-গালিত হয় এবং পুনরায় সে পৃথিবীর মাটির ভাগারেই গচ্ছিত হয়। যে আল্লাহ মাটির এ ভাগার থেকে প্রথমবার তাকে বের করেছিলেন তাতে যিশে যাওয়ার পর তিনি তাকে পুনরায় বের করে আনতে সক্ষম। তাঁর যুক্তি ও কৌশল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে তোমরা এ বিষয়টিও অস্থীকার করতে পারবে না যে, পৃথিবীতে যে ক্ষমতা ও ইখতিয়ার তিনি তোমাদের দিয়েছেন তার সঠিক ও ভুল প্রয়োগের হিসেব-নিকেশ নেয়াও নিশ্চিতভাবেই তাঁর বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতার দাবী এবং বিনা হিসেবে ছেড়ে দেয়াও তার যুক্তি ও কৌশলের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এরপর ২৮ থেকে ৪০ পর্যন্ত আয়াতে আখেরাত

অস্থীকারকারীদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। ৪১ থেকে ৪৫ আয়ত পর্যন্ত সেসব লোকের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে, যারা আখেরাতের ওপর ঈমান এমে দুনিয়ায় থেকেই নিজেদের পরিণাম গুচ্ছে নেয়ার চেষ্টা করেছে। তারা আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা, নৈতিক চরিত্র ও কাজ-কর্ম এবং নিজের জীবন ও কর্মের সমস্ত মন্দ দিক থেকে দূরে অবস্থান করেছে যা মানুষের দুনিয়ার আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করলেও পরিণামকে ধ্রংস করে।

সবশেষে যারা আখেরাতকে অস্থীকার করে এবং আল্লাহর বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে যত আয়োদ-ফুর্তি করতে চাও, করে নাও। শেষ অবধি তোমাদের পরিণাম হবে অভ্যন্ত ধ্রংসকর। বজ্বের সমাপ্তি টানা হয়েছে এই বলে যে, এ কুরআনের মাধ্যমেও যে ব্যক্তি হিদায়াত লাভ করতে পারে না তাকে দুনিয়ার কোনো জিনিসই হিদায়াত দান করতে সক্ষম নয়।

আয়াত ৫০

রুক্ত ২

## সূরা আল মুরসালাত-মঙ্গী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالْمُرْسَلِتْ عَرْفًا فَالْعَصْفَتْ عَصْفًا وَالنَّشْرَتْ نَشْرًا  
فَالْفَرِقَتْ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَتْ ذَكْرًا أَوْنَذْرًا أَنْمَا<sup>١</sup>  
تَوْعِلُونَ لَوَاقِعٍ<sup>٢</sup>

শপথ সে (বাতাসের) যা একের পর এক প্রেরিত হয়। তারপর বাড়ের গতিতে প্রবাহিত হয় এবং (মেঘমালাকে) বহন করে নিয়ে ছাড়িয়ে দেয়। তারপর তাকে ফেঁড়ে বিছিন করে। অতপর (মনে আল্লাহর) শরণ জাগিয়ে দেয়, ওজর হিসেবে অথবা ভীতি হিসেবে।<sup>৩</sup> যে জিনিসের প্রতিষ্ঠতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে<sup>৪</sup> তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।<sup>৫</sup>

১. অর্থাৎ কখনো বাতাস বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং দুর্ভিক্ষের আশংকা দেখা দেয়ায় যন্ত্রন হয়ে যায় এবং মানুষ তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। কখনো রহমত স্বরূপ বৃষ্টি বয়ে আনার কারণে মানুষ আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে। আবার কখনো ঝড়-ঝঞ্চার প্রচণ্ডতা মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করে এবং ধৰ্মসের ভয়ে মানুষ আল্লাহর দিকে রঞ্জু করে। (আরো দেখুন, পরিশিষ্ট-৩, ১৭৯ পৃষ্ঠায়)

২. এর আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, তোমাদেরকে যে জিনিসের ভয় দেখানো হচ্ছে। অর্থাৎ কিয়ামত এবং আখেরাত।

৩. কিয়ামত যে অবশ্যই সংঘটিত হবে, তা বুঝানোর জন্য এখানে পৌঁছাই জিনিসের শপথ করা হয়েছে। “الْمُرْسَلِتْ عَرْفًا” একের পর এক বা কল্পাণ হিসেবে প্রেরিতসমূহ। দুই, অত্যন্ত দ্রুত এবং প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিতসমূহ। তিনি, ভাস্তরাবে বিক্ষিক্তকারী বা, ছাড়িয়ে দেনেওয়ালাসমূহ। চার, বিছিনকারীসমূহ। ‘الْفَرِقَتْ فَرْقًا’ একই বিশেষণকে জাগ্রতকারীসমূহ।<sup>৬</sup> এ শব্দসমূহে শুধু শুণ বা বিশেষণ বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো কিসের বিশেষণ বা শুণ তা উল্লেখ করা হয়নি। তাই এগুলো একই বস্তুর বিশেষণ না তিনি তিনি বস্তুর বিশেষণ এ বিষয়ে মুফাস্সিরগণ তিনি তিনি যত পোষণ করেছেন। একদল বলেন, এ পৌঁছাই বিশেষণ দ্বারা বাতাসকে বুঝানো হয়েছে। অপর এক দল বলেন যে, এ পৌঁছাই বিশেষণ দ্বারা

ফেরেশতাদের বুঝানো হয়েছে। তৃতীয় দল বলেন : প্রথম তিনটি দ্বারা বাতাস এবং পরের দু'টি দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। চতুর্থ দল বলেন : প্রথম দু'টি দ্বারা বাতাস এবং পরের তিনটি দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। একদল এক্সপ মতও পোষণ করেছেন যে, প্রথমটি দ্বারা রহমতের ফেরেশতা, দ্বিতীয়টি দ্বারা আয়াবের ফেরেশতা এবং অবশিষ্ট তিনটি দ্বারা কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ বুঝানো হয়েছে।

আমাদের কাছে প্রথম বিষয় হলো, যখন একই কথার মধ্যে একের পর এক পাঁচটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর মধ্যে এমন কোন ইংগিতও পাওয়া যাচ্ছে না যা দিয়ে বুঝা যেতে পারে যে, কোনু পর্যন্ত একটি জিনিসের শুণ-পরিচয়ের উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোথায় থেকে আরেকটি জিনিসের শুণ পরিচয়ের বর্ণনা প্রক হয়েছে তখন অযৌক্তিকভাবে শুধু অনুমানের শুণের ভিত্তি করে একথা বলা কতটা সঠিক ও মুক্তিযুক্ত হতে পারে যে, এখানে শুধু দু'টি বা তিনটি জিনিসের শপথ করা হয়েছে? বরং এ ক্ষেত্রে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা দাবী করে যে, সম্পূর্ণ বাক্যকে কোন একটি জিনিসের শুণ বা পরিচিতির সাথে সম্পর্কিত বলে মনে নেয়া উচিত। দ্বিতীয় কথা হলো, কুরআন মজীদে যেখানেই সন্দেহ পোষণকারী বা অঙ্গীকৃতি জাপনকারীকে কোন অতীন্দ্রিয় বা গায়েবী সত্যকে বিশাস করানোর জন্য কোন জিনিস বা বস্তু বিশেষের শপথ করা হয়েছে, সেখানেই শপথ প্রমাণ উপস্থাপনের সমার্থক হয়েছে অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য হয় একথা বুঝানো যে, এ বস্তুটি বা বস্তু সকল সে সত্যটির যথার্থতা প্রমাণ করছে। এটা তো স্পষ্ট যে, এ উদ্দেশ্যে একটি অতীন্দ্রিয় বা গায়েবী বস্তুর পক্ষে আরেকটি অতীন্দ্রিয় বা গায়েবী বস্তুকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা ঠিক নয়। বরং অতীন্দ্রিয় বস্তুর প্রমাণ হিসেবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রমাণ পেশ করাই যথার্থ এবং যথোপযুক্ত হতে পারে। সূতরাং আমাদের মতে এর সঠিক তাফসীর হলো এই যে, এর অর্থ বাতাস। যারা বলেছেন যে, এ পাঁচটি জিনিসের অর্থ ফেরেশতা, আমার মতে তাদের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ফেরেশতাও কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার মতই অতীন্দ্রিয় বিষয়।

এবার চিন্তা করে দেখুন, বাতাসের এ ভির ভির অবস্থা কিয়ামতের বাস্তবতা কিভাবে প্রমাণ করছে। যেসব উপকরণের জন্য পৃথিবীর শুণের জীব-জন্ম ও উদ্ভিদের জীবন সংস্কৰণ হয়েছে তার মধ্যে একটি শুন-ত্বপূর্ণ উপকরণ হলো বাতাস। সব প্রজাতির জীবনের সাথে বাতাসের বর্ণিত গুণাবলীর যে সম্পর্ক আছে তা এ কথারই সাক্ষ দিচ্ছে যে, কোন একজন যদি শক্তিমান সুনিপুণ স্মষ্টি আছেন যিনি মাটির এ গ্রহে জীবন সৃষ্টির ইচ্ছা করেছেন এবং এ উদ্দেশ্যে এখানে এমন একটি জিনিস সৃষ্টি করলেন যার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য জীবন্ত মাখলুকাতের বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন তার সাথে হ্রব্ধ সামজ্ঞ্যশীল। তা সন্তোষ তিনি শুধু এতটুকুই করেননি যে, পৃথিবীটার গায়ে বাতাসের একটি চাদর জড়িয়ে রেখে দিয়েছেন। বরং নিজের কুদরত ও জ্ঞান দ্বারা তিনি এ বাতাসের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ অসংখ্য অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। লক্ষ কোটি বছর ধরে তার ব্যবস্থাপনা এভাবে হয়ে আসছে যে, সে বৈচিত্র্যপূর্ণ অবস্থার কারণে ভির ভির খত্তুর সৃষ্টি হচ্ছে। কখনো বাতাস বৰু হয়ে শুমট অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। আবার কখনো নিষ্ক শীতল বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। কখনো গরম পড়ে আবার কখনো ঠাণ্ডা পড়ে। কখনো যেমনের ঘনঘটায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায় আবার কখনো বাতাসে মেঘ তেসে যায়। কখনো আরামদায়ক বাতাস বয়ে যায় আবার কখনো

فَإِذَا النَّجْوَ أَطْمِسَتُ<sup>٦</sup> وَإِذَا السَّمَاءُ فَرِجَتُ<sup>٧</sup> وَإِذَا الْجَبَلُ  
 نُسِفَتُ<sup>٨</sup> وَإِذَا الرَّسُلُ أُقْتَتُ<sup>٩</sup> لَا يَوْمَ أَجْلَتُ<sup>١٠</sup> لِيَوْمًا  
 الْقُصْلِ<sup>١١</sup> وَمَا أَدْرِكَ مَا يَوْمًا الْفَصْلِ<sup>١٢</sup> وَلِيَوْمِئِنِ اللَّمْكَنِ بَيْنَ<sup>١٣</sup>  
 الْأَنْهَلِكَ الْأَوْلَيْنِ<sup>١٤</sup> تَمْرِنْتِعْمَرُ الْآخِرَيْنِ<sup>١٥</sup> كَنْ لَكَ نَفْعَلُ  
 بِالْمَجْرِيْمِينَ<sup>١٦</sup> وَلِيَوْمِئِنِ اللَّمْكَنِ بَيْنَ<sup>١٧</sup>

অতপর তারকাসমূহ যখন নিষ্পত্ত হয়ে যাবে<sup>৮</sup> এবং আসমান ফেঁড়ে দেয়া হবে<sup>৯</sup> আর পাহাড় ধূনিত করা হবে এবং রস্তাদের ইজির ইওয়ার সময় এসে পড়বে<sup>১০</sup> (সেদিন এই ঘটনাটি সংঘটিত হবে)। কোন দিনের জন্য একাজ বিলাসিত করা হয়েছে? ফায়সালার দিনের জন্য। তুমি কি জান সে ফায়সালার দিনটি কি? সেদিন ধৰ্মস অপেক্ষা করছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।<sup>১১</sup>

আমি কি পূর্ববর্তীদের ধৰ্মস করিনি<sup>১২</sup> আবার পরবর্তী লোকদের তাদের অনুগামী করে দেবো<sup>১৩</sup>। অপরাধীদের সাথে আমরা এরপই করে থাকি। সেদিন ধৰ্মস অপেক্ষা করছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।<sup>১৪</sup>

প্রলয়কর্তী ঝাড়-ঝঞ্চার আবির্ভাব ঘটে। কখনো অত্যন্ত উপকারী বৃষ্টিপাত হয় আবার কখনো বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মোট কথা এক রকম বাতাস নয়, বরং বিভিন্ন সময়ে নানা রকমের বাতাস প্রবাহিত হয় এবং প্রত্যেক প্রকারের বাতাস কোন না কোন উদ্দেশ্য পূরণ করে। এ ব্যবস্থা একটি অজ্ঞেয় ও পরাক্রমশালী শক্তির প্রমাণ, যার পক্ষে জীবন সৃষ্টি করা যেমন অসম্ভব নয় তেমনি তাকে ধৰ্মস করে পুনরায় সৃষ্টি করাও অসম্ভব নয়। অনুরূপভাবে এ ব্যবস্থাপনা পূর্ণমাত্রার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তারও প্রমাণ। কোন অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকই কেবল একথা মনে করতে পারে যে, এসব কাজ-কারবার শুধু খেলাছলে করা হচ্ছে। এর পেছনে কোন মহান লক্ষ ও উদ্দেশ্য নেই। এ বিশ্বকর ব্যবস্থার সামনে মানুষ এত অসহায় যে, সে নিজের প্রয়োজনেও কোন সময় উপকারী বাতাস প্রবাহিত করতে পারে না। আবার ধৰ্মসাত্ত্বক তুফানের আগমনকে ঠেকাতেও পারে না। সে যতই উদ্ধৃত্য, অসচেতনতা এক শোয়েয়ি ও হঠকারিতা দেখাক না কেন কোন না কোন সময় এ বাতাসই তাকে শরণ করিয়ে দেয় যে, সর্বোপরি এক মহাশক্তি তৎপর আছেন যিনি জীবনের এ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপকরণকে যখন ইচ্ছা তার জন্য রহমত এবং যখন ইচ্ছা তার জন্য ধৰ্মসের কারণ বানিয়ে দিতে পারেন। মানুষ তার কোন সিদ্ধান্তকেই ব্রাহ্ম করার ক্ষমতা রাখে না। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল জাসিয়া, টাকা ৭, আয় যারিয়াত, টাকা ১ থেকে ৪।)

৪. অর্থাৎ নিষ্পত্তি হয়ে যাবে এবং তার আলো নিঃশেষ হয়ে যাবে।

৫. অর্থাৎ যে সুদৃঢ় ব্যবস্থার কারণে উর্ধজগতের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ তার কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যে কারণে মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু নিজ নিজ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ আছে সে ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটানো হবে এবং তার সমস্ত বক্রন শিথিল করে দেয়া হবে।

৬. কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাশরের ময়দানে যখন মানব জাতির মামলা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে তখন প্রত্যেক জাতির রসলকে সাক্ষাদানের জন্য হাজির করা হবে। উদ্দেশ্য, তাঁরা যে মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পেছিয়ে দিয়েছিলেন তার সাক্ষ্য দেবেন। বিপর্যাস্য ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে এটা হবে আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এর দ্বারা প্রমাণ করা হবে যে, তার ভাস্ত আচরণের জন্য সে নিজেই দায়ী। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাকে সাবধান করার ব্যাপারে কোন ক্রটি করা হয়নি। এ বিষয়ে জানতে হলে নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহ দেখুন। তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, আয়াত ১৭২, ১৭৩, চীকা ১৩৪, ১৩৫; আয় যুমার, আয়াত ৬৯, চীকা ৮০; আল মুলক, আয়াত ৮, চীকা ১৪।

৭. অর্থাৎ সেসব লোকের জন্য যারা সেদিনের আগমনের খবরকে যিথ্যা বলে মনে করেছিল এবং এ ভেবে পৃথিবীতে জীবন যাপন করে চলেছিল যে, এমন সময় কখনো আসবে না যখন প্রভুর সামনে হাজির হয়ে নিজের কাজ-কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

৮. এটা আখেরাতের সপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ। এর অর্থ হলো, এ দুনিয়াতেই তোমরা নিজেদের ইতিহাসের প্রতি একবার তাকিয়ে দেখো। যেসব জাতি আখেরাতকে অঙ্গীকার করে এ দুনিয়ার জীবনকেই প্রকৃত জীবন মনে করেছে এবং এ দুনিয়াতে প্রকাশিত ফলাফলকে তাল ও মন্দের মাপকাঠি ধরে নিয়ে সে অনুসারে নিজেদের নৈতিক আচরণ নিরূপণ করেছে স্থান-কাল নির্বিশেষ তারা সবাই শেষ পর্যন্ত ধর্মস হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে আখেরাত এক বাস্তব সত্য। যারা একে উপেক্ষা করে কাজ করে তারা ঠিক তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে ব্যক্তি যে চোখ বক করে বাস্তবকে অঙ্গীকার করে চলে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউনুস, চীকা ১২; আল নামল, চীকা ৮৬; আর রুম, চীকা ৮; সাবা, চীকা ২৫।)

৯. অর্থাৎ এটা আমার স্থায়ী নীতি ও বিধান। আখেরাতের অঙ্গীকৃতি অতীত জাতিগুলোর জন্য যেভাবে ধর্মসাত্ত্বক প্রমাণিত হয়েছে অনুরূপ অনাগত জাতিগুলোর জন্যও তা ধর্মসাত্ত্বক প্রমাণিত হবে। পূর্বেও কোন জাতি এ ধর্মসের হাত থেকে রক্ষা পায়নি, তবিষ্যতেও পাবে না।

১০. এখানে এ আয়াতটির অর্থ হলো, দুনিয়াতে তাদের যে পরিণতি হয়েছে কিংবা তবিষ্যতে হবে তা তাদের আসল শাস্তি নয়। তাদের ওপর আসল ধর্ম নেমে আসবে চূড়ান্ত ফায়সালার দিনে। এ পৃথিবীতে যে শাস্তি দেয়া হয় তার অবস্থা হলো, যখন কোন ব্যক্তি একের পর এক অপরাধ করতে থাকে এবং কোন ভাবেই সে তার ভষ্ট ও বিকৃত আচরণ থেকে বিরত হয় না তখন শেষ অবধি তাকে ছেফতার করা হয়। যে আদালতে তার

الْمَرْ نَخْلَقُكُمْ مِّنْ مَاءٍ مَّهِينٍ ۝ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ إِلَى قَدْرٍ  
 مَعْلُومٍ ۝ فَقَدْ رَنَّا ۝ فَنِعْمَ الْقَدْرُونَ ۝ وَيَلِّ يَوْمَئِنْ لِلْمَكْنَ بَيْنَ  
 الْمَرْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ۝ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَأْسَ  
 شِيفَتٍ وَأَسْقِينَكُمْ مَاءً فَرَأَتَا ۝ وَيَلِّ يَوْمَئِنْ لِلْمَكْنَ بَيْنَ ۝

আমি কি তোমাদেরকে এক নগণ্য পানি থেকে সৃষ্টি করিনি এবং একটি নিদিষ্ট সময়ের জন্য।<sup>১১</sup> একটি নিদিষ্ট জায়গায় তা স্থাপন করেছিলাম না।<sup>১২</sup> তাহলে দেখো, আমি তা করতে পেরেছি। অতএব আমি অত্যন্ত নিপুণ ক্ষমতাধর।<sup>১৩</sup> সেদিন ধৰ্মস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।<sup>১৪</sup>

আমি কি যমীনকে ধারণ ক্ষমতার অধিকারী বানাইনি, জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্য? আর আমি তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা আর পান করিয়েছি তোমাদেরকে সুপেয় পানি।<sup>১৫</sup> সেদিন ধৰ্মস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।<sup>১৬</sup>

মামলার ছৃঙ্গাত ফায়সালা হবে এবং তার সমস্ত কৃতকর্মের শাস্তি দেয়া হবে তা এ দুনিয়ায় না আখেরাতে কায়েম হবে এবং সেটাই হবে তার ধৰ্মসের আসল দিন। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৫-৬; হৃদ, টীকা ১০৫।)

১১. মূল আয়াতের বাক্যাংশ হলো ফَدْرٌ مَعْلُومٌ । এর অর্থ শুধু নিদিষ্ট সময় নয়। বরং এর সময়-কাল একমাত্র আল্লাহই জানেন এ অর্থও এর মধ্যে শামিল। কোন বাচ্চা সম্পর্কে কোন উপায়েই মানুষ একথা জানতে পারে না যে, সে কত মাস, কত দিন, কত ঘন্টা, কত মিনিট এবং কত সেকেণ্ড মায়ের পেটে অবস্থান করবে এবং তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার নির্ভুল সময়টি কি? প্রত্যেক শিশুর জন্য আল্লাহ একটা বিশেষ সময় নিদিষ্ট করে রেখেছেন আর সে সময়টি কেবল তিনিই জানেন।

১২. অর্থাৎ মায়ের গর্ত থলি। গর্ত সূচনা হওয়ার সাথে সাথে ভূগকে এর মধ্যে এত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা হয় এবং তার হিফায়ত, প্রতিপালন এবং বৃদ্ধিসাধন এমন নিখৃত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে করা হয় যে, কোন মারাত্তিক দুর্ঘটনা ছাড়া গর্তপাত হতে পারে না। কৃত্রিম গর্তপাতের জন্য অস্বাভাবিক ধরনের কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় যা চিকিৎসা বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক উন্নতি সত্ত্বেও ক্ষতি ও আশংকা মুক্ত নয়।

১৩. এটা মৃত্যুর পরের জীবনের সঙ্গব্যতার স্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অর্থ হলো, যখন আমি নগণ্য এক ফোটা বীর্য থেকে সূচনা করে তোমাকে পূর্ণাঙ্গ একজন মানুষ বানাতে সক্ষম হয়েছি তখন পুনরায় তোমাদের অন্য কোনভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম

হবো না কেন? আমার যে সৃষ্টি কর্মের ফলশ্রুতিতে তুমি আজ জীবিত ও বর্তমান তা একথা প্রমাণ করে যে, আমি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। আমি এমন অক্ষম নই যে, একবার সৃষ্টি করার পর তোমাদেরকে পুনরায় আর সৃষ্টি করতে পারবো না।

১৪. এখানে এ আয়াতাংশ যে অর্থ প্রকাশ করছে তাহলো, মৃত্যুর পরের জীবনের সম্ভাব্যতার এ স্পষ্ট প্রমাণ সামনে থাকা সত্ত্বেও যারা তা অধীকার করছে তারা এ নিয়ে যত ইচ্ছা হাসি-তামাসা ও ঠট্টা-বিদ্যুৎ করুক এবং এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকদের তারা যত ইচ্ছা 'সেকেলে' অঙ্গবিশ্বাসী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলতে থাক। যে দিনকে এরা মিথ্যা বলছে যখন সেদিনটি আসবে তখন তারা জানতে পারবে, সেটিই তাদের জন্য ধর্মসের দিন।

১৫. এটা আখেরাতের সম্ভাব্যতা ও যুক্তিসংগত হওয়ার আরো একটি প্রমাণ। পৃথিবী নামক এ একটি শহুর যা শত শত কোটি বছর ধরে অসংখ্য মাখলুকাতকে তার কোলে স্থান দিয়ে রেখেছে। নানা প্রকারের উদ্ভিদরাঙ্গি, নানা রকমের জীবজন্ম এবং মানুষ এর উপরে জীবন ধারণ করছে। আর সবার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য এর অভ্যন্তর থেকে নানা প্রকার জিনিসের অফুরন্ত ভাগুর বেরিয়ে আসছে। তাছাড়া এ পৃথিবীতে, যেখানে এসব জীবজন্মুর বিপুল সংখ্যক প্রতিনিয়ত মৃত্যুবরণ করছে—এমন নজীর বিহীন ব্যবহাপনা রাখা হয়েছে যে, সবার মৃত্যুদেহ এ মাটির মধ্যেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তারপর প্রত্যেকটি সৃষ্টির নবীন সদস্যদের বেঁচে থাকার ও বসবাসের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে এ পৃথিবীকে বলের মত সমতল করেও সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এর স্থানে স্থানে পর্বতশ্রেণী এবং আকাশচূর্ণী পাহাড় তৈরী করে রাখা হয়েছে ঋতুসম্মূহের পরিবর্তনে, বৃষ্টিপাত ঘটানোতে, নদ-নদীর উৎপন্নির ক্ষেত্রে, উর্বর উপত্যকা সৃষ্টিতে, কড়িকাঠ নির্মাণের মত বড় বড় বৃক্ষ উৎপন্ননে, নানা রকমের খনিজ দ্রব্য এবং বিভিন্ন প্রকার পাথর সরবরাহের ক্ষেত্রে যার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া এ পৃথিবীর অভ্যন্তরে সুপেয় পানি সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পৃষ্ঠাদেশের উপরেও সুপেয় পানির নদী ও খাল প্রবাহিত করা হয়েছে এবং সমুদ্রের লবণাক্ত পানি থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাষ্প উত্থিত করে আসমান থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব কি একথা প্রমাণ করে না যে, সর্বশক্তিমান এক সন্তাই এসব তৈরী করেছেন। আর তিনি শুধু সর্বশক্তিমানই নন বরং জ্ঞানী এবং মহাবিজ্ঞানীও বটে? অতএব, তাঁর শক্তিমন্ত্রা ও জ্ঞানের সাহায্যেই যদি এ পৃথিবী এতসব সাজ-সরঞ্জামসহ এ জ্ঞান ও কৌশলের সাথে তৈরী হয়ে থাকে তাহলে একজন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের জন্য একথাটা বুঝা এত কঠিন হবে কেন যে, এ দুনিয়ার বিলোপ ঘটিয়ে পুনরায় নতুনভাবে আরেকটি দুনিয়া তিনি বানাতে সক্ষম আর তাঁর কর্মকৌশলের দাবীও এটাই যে, তিনি আরেকটি দুনিয়া তিনি বানাবেন যাতে মানুষ এ দুনিয়ায় যেসব কাজ-কর্ম করেছে তার হিসেব নেয়া যায়।

১৬. এখানে এ আয়াতাংশ এ অর্থে বলা হয়েছে যে, যেসব লোক আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও কর্মকৌশলের এ বিশ্বকর নমুনা দেখেও আখেরাতের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা অধীকার করছে এবং এ দুনিয়ার ধর্মসের পর আল্লাহ তা'আলা আরো একটি দুনিয়া সৃষ্টি করবেন এবং সেখানে মানুষের কাছ থেকে তার কাজের হিসেব গ্রহণ করবেন এ বিষয়টিকেও যারা মিথ্যা মনে করছে, তারা তাদের এ খামখেয়ালীতে মগ্ন থাকতে চাইলে

إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكْنِبُونَ ۝ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثٍ  
 شَعَبٌ ۝ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهِ بِإِنَّهَا تَرِمِي بِشَرِّ الْقَصْرِ  
 كَانَهُ جِلْمَتْ صَفْرٌ ۝ وَلِلْيَوْمِئِنِ لِلْمَكَنِ بَيْنَ هَذَا يَوْمًا لَا يَنْطِقُونَ  
 وَلَا يَؤْذِنُ لَهُمْ فِي عِتْرَوْنَ ۝ وَلِلْيَوْمِئِنِ لِلْمَكَنِ بَيْنَ هَذَا يَوْمًا الْفَصْلِ  
 جَمْعُنَكُمْ وَالْأَوْلَيْنَ ۝ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْلٌ فِكِيلُوْنِ ۝ وَلِلْيَوْمِئِنِ  
 لِلْمَكَنِ بَيْنَ ۝

চলো<sup>১</sup> এখন সে জিনিসের কাছে যাকে তোমরা মিথ্যা বলে মনে করতে। চলো সে ছায়ার কাছে যার আছে তিনটি শাখা<sup>২</sup> যে ছায়া ঠাণ্ডা নয় আবার আগুনের শিখা থেকে রক্ষাও করে না। সে আগুন প্রাসাদের মত বড় বড় ঝুলিঙ্গ নিষ্কেপ করবে। (উৎক্ষেপণের সময় যা দেখে মনে হবে) তা যেন ইলুদ বর্ণের উট<sup>৩</sup> সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। এটি সেদিন যেদিন তারা না কিছু বলবে এবং না তাদেরকে ওজর পেশ করার সুযোগ দেয়া হবে।<sup>৪</sup> সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

এটা ছৃঙ্খল ফায়সালার দিন। আমি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের একত্রিত করেছি। তোমাদের যদি কোন অপকোশল থেকে থাকে তাহলে আমার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করে দেখো।<sup>৫</sup> সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

থাকুক। তাদের ধারণা ও বিশাসের সম্পূর্ণ বিপরীত এসব কিছু যেদিন বাস্তব হয়ে দেখা দেবে, সেদিন তারা বুঝতে পারবে যে, এ বোকাখির মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছে মাত্র।

১৭. আব্যেরাতের সপক্ষে প্রমাণাদি পেশ করার পর যখন তা বাস্তবে সংঘটিত হবে তখন সেখানে এসব অঙ্গীকারকারীদের পরিণাম কি হবে তা বলা হচ্ছে।

১৮. এখানে ছায়া অর্থ ধোঁয়ার ছায়া। তিনটি শাখার অর্থ হলো, যখন অনেক বেশী ধোঁয়া উথিত হয় তখন তা ওপরে গিয়ে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়।

১৯. অর্থাৎ প্রত্যেকটি ঝুলিঙ্গ প্রাসাদের মত বড় হবে। আর যখন এসব বড় বড় ঝুলিঙ্গ উথিত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে এবং চারদিকে উড়তে থাকবে তখন মনে হবে যেন ইলুদ বর্ণের উটসমূহ লক্ষ বাঞ্ছ করছে।

إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي ظَلَلٍ وَعَيْوَنٍ<sup>৪৪</sup> وَفَوَاكِهَ مَا يَشْتَهُونَ<sup>৪৫</sup> كُلُوا  
وَاشربوا هَنِيئًا بِمَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ<sup>৪৬</sup> إِنَّا كَلَّ لِكَ نَجْزِي  
الْمُحْسِنِينَ<sup>৪৭</sup> وَيَلَّ يَوْمَئِنِ لِلْمَكْنَبِينَ<sup>৪৮</sup> كُلُوا وَتَمْتَعُوا فَلِيَلَا إِنْكَرْ  
مَجْرِمُونَ<sup>৪৯</sup> وَيَلَّ يَوْمَئِنِ لِلْمَكْنَبِينَ<sup>৫০</sup> وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَرْكَعُوا  
لَا يَرْكَعُونَ<sup>৫১</sup> وَيَلَّ يَوْمَئِنِ لِلْمَكْنَبِينَ<sup>৫২</sup> فَبِأَيِّ حَلِّ يَثِّ بَعْدَ  
يَوْمِنُونَ<sup>৫৩</sup>

## ২য় রূপু

মুভাকীরা<sup>২২</sup> আজ সুশীতল ছায়া ও ঝর্ণাধারার মধ্যে অবস্থান করছে। আর যে ফল তারা কামনা করে (তা তাদের জন্য প্রস্তুত)। যে কাজ তোমরা করে এসেছো তার পুরস্কার স্বরূপ আজ তোমরা মজা করে খাও এবং পান করো। আমি নেক্কার লোকদের একপ পুরস্কারই দিয়ে থাকি। সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপ কারীদের জন্য।<sup>২৩</sup>

খেয়ে নাও<sup>২৪</sup> এবং ফুর্তি কর। কিছুদিনের জন্য<sup>২৫</sup> আসলে তো তোমরা অপরাধী। সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহর সামনে অবনত হও, তখন তারা অবনত হয় না।<sup>২৬</sup> সেদিন ধ্বংস রয়েছে মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। এখন এ কুরআন ছাড়া আর কোন বাণী এমন হতে পারে যার উপর এরা ঈমান আনবে?<sup>২৭</sup>

২০. এটা হবে তাদের শেষ অবস্থা। এ অবস্থা হবে জাহানামে প্রবেশ করার সময়। এর আগে হাশের ময়দানে তারা অনেক কিছুই বলবে। অনেক ওজর আপত্তি পেশ করবে, একজন আরেকজনের ওপর নিজের কৃত অপরাধের দোষ চাপিয়ে নিজে নিরপরাধ হওয়ার চেষ্টা করবে। যেসব নেতারা তাদেরকে বিপথে পরিচালনা করেছে তাদের গালি দেবে। এমনকি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানের বক্তব্য অনুসারে, অনেকে উদ্ধত্যের সাথে নিজের অপরাধ অবীকার পর্যন্ত করবে। কিন্তু সব রকম সাক্ষ-প্রমাণের দ্বারা তাদের অংশীকার হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দেয়া হবে এবং তাদের নিজেদের হাত, পা এবং সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে : এভাবে অপরাধ প্রমাণে যখন কোন দ্রষ্টি থাকবে না এবং অত্যন্ত সংগত ও যুক্তিযুক্ত প্রমাণ ন্যায় ও ইনসাফের সমন্ত দাবী প্রৱণ করে তাদেরকে শাস্তির সিদ্ধান্ত শুনানো হবে তখন তারা একেবারে নিশ্চুল হয়ে যাবে এবং

০ "আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ওজর হিসেবে কোন কিছু বলার সুযোগও তাদের জন্য থাকবে না। ওজর পেশ করার সুযোগ না দেয়া কিংবা তার অনুমতি না দেয়ার অর্থ এই নয় যে, সাফাই পেশ করার সুযোগ না দিয়েই তাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়ে দেয়া হবে। বরং এর অর্থ হলো, এমন অকাট্য ও অনশ্঵ীকার্যভাবে তাদের অপরাধ প্রমাণ করে দেয়া হবে যে, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে ওজর হিসেবে কিছু বলতেই পারবে না। এটা ঠিক তেমনি যেমন আমরা বলে থাকি যে, আমি তাকে বলতে দিইনি, কিংবা আমি তার মুখ বক্ষ করে দিয়েছি। একথার অর্থ এই যে, আমি এমনভাবে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছি যে, তার মুখ খোলার বা কিছু বলার কোন সুযোগ থাকেনি এবং সে লা-জবাব হয়ে গেছে।

২১. অর্থাৎ দুনিয়ায় তো তোমরা অনেক কৌশল ও চাতুরের আশ্রয় নিতে। এখন এখানে কোন কৌশল বা আশ্রয় নিয়ে আমার পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারলে তা একটু করে দেখাও।

২২. এখানে এ শব্দটি যেহেতু **مَكْبَرَة** (মিথ্যা আরোপকারীদের) বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে তাই মুস্তাকী শব্দ বলে এখানে সেসব সোকদের বুঝানো হয়েছে যারা আখেরাতকে মিথ্যা বলে অশ্বীকার করা থেকে বিরত থেকেছে এবং আখেরাতকে মেনে নিয়ে এ বিশ্বাসে জীবন যাপন করেছে যে, আখেরাতে আমাদেরকে নিজেদের কথাবার্তা, কাজ-কর্ম এবং স্বত্ত্বাব চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

২৩. এখানে যে অর্থে এ আয়াতাংশ বলা হয়েছে তাহলো, তাদের জন্য একটি বিপদ হবে তাই যা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা হাশরের ময়দানে অপরাধী হিসেবে উঠবে। তাদের অপরাধ প্রকাশ্যে ভাবাবে প্রমাণ করা হবে যে, তাদের জন্য মুখ খোলার সুযোগ পর্যন্ত থাকবে না এবং পরিণামে তারা জাহানামের ইক্কনে পরিণত হবে। দ্বিতীয়ত, তাদের জন্য মসিবতের ওপর মসিবত হবে এই যে, যেসব স্ট্যান্ডারদের সাথে তাদের সারা জীবন দন্ত-সংঘাত ও লড়াই হয়েছে, যাদের তারা নির্বোধ, সংকীর্ণযন্তা ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যায়িত করতো, যাদের নিয়ে তারা হাসি-তামাসা ও বিদ্রূপ করতো এবং যাদের তারা নিজেদের দৃষ্টিতে ইন, মীচ ও লাঞ্ছিত মনে করতো তাদেরকেই তারা জানাতের মধ্যে আরাম আয়েশের জীবন যাপন করে আমোদ ফূর্তি করতে দেখবে।

২৪. এখন বক্তব্যের সমাপ্তি টানতে গিয়ে শুধু মুকার কাফের নয় বরং সারা পৃথিবীর কাফেরদের সর্বোধন করে একথাণ্ডে বলা হয়েছে।

২৫. অর্থাৎ দুনিয়ার এ স্বল্পকাল স্থায়ী জীবনে।

২৬. আল্লাহর সামনে আনত হওয়ার অর্থ শুধু তাঁর ইবাদাত বন্দেগী করাই নয়, বরং তাঁর প্রেরিত রসূল এবং নাযিলকৃত কিভাবকে স্বীকার করা এবং তার বিধি-বিধানের আনুগত্যও এর মধ্যে অন্তরভুক্ত।

২৭. অর্থাৎ মানুষকে হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়ার এবং হিদায়াতের পথ দেখানোর জন্য সবচেয়ে বড় জিনিস যা হতে পারতো তা কুরআন আকারে নাফিল করা হয়েছে। এ কুরআন পড়ে বা শনেও যদি কেউ ইমান না আনে তাহলে একে বাদ দিয়ে আর কোন জিনিস এমন হতে পারে যা তাকে সত্য পথে আনতে সক্ষম?

## পরিশিষ্ট—৩

## ১নং টীকার সাথে সম্পর্কিত

এ আয়াতগুলোতে প্রথমত বৃষ্টি বহনকারী বাতাসসমূহের পরম্পরা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, প্রথমে ক্রমাগত বাতাস চলতে থাকে। পরে তা ঝঞ্চার রূপ ধারণ করে। তারপর মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে ছাড়িয়ে দেয়। অতপর তাকে বিনীর্ণ করে তাগ তাগ করে। এরপর বৃষ্টি নামার কথা উল্লেখ করার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, তা মনের মধ্যে আল্লাহর শরণকে জাগ্রত করে, ওজর হিসেবে কিংবা ভীতি হিসেবে। অর্থাৎ এমন এক সময়ে ঘটে, যখন মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয়, তাই সে আল্লাহকে শরণ করতে বাধ্য হয়। কিংবা মানুষ তার দোষ-ক্রটি ও অপরাধসমূহ স্বীকার করে দোয়া করতে থাকে, যেন আল্লাহ তাকে শরণের হাত থেকে রক্ষা করেন, তার প্রতি দয়া করে। যেন রহমত স্বরূপ বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যদি দীর্ঘদিন পর্যন্ত বৃষ্টি না হয়ে থাকে এবং এক ফৌটা পানির জন্য মানুষ কাতরাতে থাকে তাহলে সে অবশ্যই ঝঞ্চা প্রবাহিত হতে এবং বৃষ্টির মেঘ আসতে দেখে অনেক সময় কঁটুর কাফেরেও আল্লাহকে শরণ করতে থাকে। তবে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তীব্র বা হাঙ্গা হলে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ মানুষ যারা তারা সাধারণত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকে, তাই স্বাভাবিক দুর্ভিক্ষ হলেও তারা তাঁকে শরণ করবে। কিন্তু অন্যরা তখনও সাইসের বুলি কপচাতে থাকবে এবং বলবে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। অমুক অমুক কারণে বৃষ্টি হচ্ছে না। এতটুকু ব্যাপার নিয়ে দোয়া করতে শুরু করা দুর্বল আকীদা-বিশ্বাস ছাড়ি আর কিছুই না। তবে যদি দীর্ঘদিন পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ লেগে থাকে এবং গোটা দেশ ধৰ্মসের মুখোমুখি এসে দীড়ায় তাহলে বড় বড় কাফেরদেরও তখন আল্লাহকে মনে পড়তে থাকে। মুখে বলতে লজ্জাবোধ করলেও তারা নিজের গোনাহ ও পাপ এবং অকৃতজ্ঞতার জন্য লজ্জা অনুভব করে এবং আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করে যে, বাতাস বৃষ্টির যে মেঘ বহন করে আনছে তা থেকে যেন গোটা দেশে বৃষ্টিপাত হয়। এটাই হলো ওজর হিসেবে মনের মধ্যে আল্লাহর শরণ জাগিয়ে তোলা। এরপর ফ্লাউন্ড (ভীতি) হিসেবে মনের মধ্যে আল্লাহর শরণ জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারটা সংঘটিত হয় তখন যখন ঝড়ের বেগ বৃদ্ধি পেতে পেতে প্রচও বিভাষিকাময় রূপ ধারণ করে এবং জনপদের পর জনপদ বিধ্বন্ত করে ফেলে কিংবা মূলধারে এমন বৃষ্টি হতে থাকে যে, তা বিপদ সংকুল প্রাবন্নের রূপ ধারণ করে। এরপ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দৃঢ় মনোবলের কাফেরও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে প্রার্থনা করতে থাকে। তখন তার মস্তিষ্কের গোপন প্রদেশ থেকে ঝড় ও প্রাবন্নের সমস্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ব্যাখ্যা উভে যায়। বাতাস প্রবাহিত হওয়ার এ অনুক্রম বা পারম্পর্য বর্ণনা করার পর বলা হচ্ছে, এসব বাতাস ওজর কিংবা ভীতি হিসেবে মনের মধ্যে আল্লাহর শরণ জাগিয়ে দেয়। অন্য কথায় যেন বলা হচ্ছে, দুনিয়ায় যেসব ব্যবস্থা চলছে তা মানুষকে এ সত্যটাই জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ পৃথিবীর সবকিছু তার ইখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়নি। বরং সবকিছুর ওপরে এক মহাশক্তি আছেন যিনি মানুষের ভাগ্যের ওপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছেন। তাঁর ক্ষমতা এমন অপরাজেয় যে, যখন ইচ্ছ্য তিনি সমস্ত উপাদানকে মানুষের লালন ও প্রতিপালনের জন্য

ব্যবহার করতে পারেন। আবার যখন ইচ্ছা এ সব উপাদানকেই তার ক্ষেত্রে কাজে নিয়োজিত করতে পারেন।

এরপর বাতাসের এ ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তকে এ বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। এখন দেখার বিষয় হলো, বাতাসের এ ব্যবস্থাপনা এ ব্যাপারে কি সাক্ষ-প্রমাণ আমাদের সামনে উপস্থিপিত করছে।

কিয়ামত ও আখেরাতের ব্যাপারে মানুষ সাধারণত দু'টি প্রয়ে সংশয়-সন্দেহে নিপত্তি হয় এবং বিব্রত বোধ করে। এক, কিয়ামত হওয়া সম্ভব কিনা? দুই, এর প্রয়োজনই বা কি? এ প্রয়ের জটা জালে জড়িয়েই তার মধ্যে এ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হয় যে, কিয়ামত কি আদৌ সংঘটিত হবে? নাকি এটা একটা কাহিনী মাত্র? এ বিষয়ে কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বিশ-জাহানের ব্যবস্থাপনা থেকে প্রমাণ পেশ করে তার সভাব্যতা, অনিবার্যতা এবং সংঘটিত হওয়া প্রমাণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় প্রমাণ পেশ করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তাহলো, আগ্নাহ 'আ'আলার বিশাল সাম্রাজ্যের অসংখ্য নির্দশনের মধ্যে কোন কোনটার শপথ করে বলা হয়েছে যে, তা সংঘটিত হবে। এ প্রায় প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে তার সভাব্যতা, অনিবার্যতা এবং সংঘটিত হওয়ার প্রমাণাদিও এসে যায়।

এখানেও প্রমাণ পেশের এ পদ্ধাই গ্রহণ করা হয়েছে। এতে বায়ু প্রবাহের আবর্তন এবং বৃষ্টিপাত্রের ব্যবস্থাপনাকে এ বিষয়ে নির্দশন হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এটা একটা নিয়মিত ও স্থায়ী ব্যবস্থা যা একজন মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান সন্তার ব্যবস্থাপনায় কায়েম হয়েছে। এটা আকস্মিকভাবে সংঘটিত কোন ঘটনা নয় যে, তার প্রভাবে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে আপনা থেকেই এ পদ্ধা-পদ্ধতি চালু হয়ে গিয়েছে এবং আপনা আপনি সমুদ্র থেকে বাল্প উঠিত হয়েছে, বাতাস তা বহন করে নিয়ে গিয়েছে এবং তা একত্র করে বৃষ্টির মেঘ সৃষ্টি করেছে। অতপর সে মেঘকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পৌছে দিয়েছে এবং আপনা আপনি তা থেকে বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। কোন বিচার-বিবেচনা ও বৃক্ষ-বিবেকহীন প্রকৃতি কোন নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুন বিহীন রাজত্বে আকস্মিকভাবে এ ব্যবস্থাটি চালু করেনি। বরং এটা একটা সুচিত্তিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা যা একটি বিধান মোতাবেক যথারীতি চলছে। সুতরাং সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি থেকে বাল্প উঠিত হওয়ার পরিবর্তে তা জমে বরফে পরিণত হচ্ছে এমনটা কখনো দেখা যায় না। বরং সূর্যশীর উভাপে সমুদ্রের পানি থেকে সবসময় বাল্পই উঠিত হয়। মৌসুমী বায়ু প্রবাহ এমন উন্টো আচরণ কখনো করে না যে, বাল্পীভূত পানিকে হলভাগের দিকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে সমুদ্রেই তাকে নিঃশেষ করে দিল। বরং তা বাল্পকে সবসময় ওপরে উঠিয়ে নেয়। এমনও কখনো ঘটতে দেখা যায় না যে, মেঘমালা সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বাতাস এসব মেঘ বহন করে শুক ভূ-ভাগের দিকে প্রবাহিত হওয়া বন্ধ করেছে এবং শুক ভূ-ভাগের ওপরে বৃষ্টিপাত একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোটি কোটি বছর থেকে একই নিয়মে এ ব্যবস্থা লাগাতার চলে আসছে। এমনটি যদি না হতো, এ পৃথিবীর বৃক্ষে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর অস্তিত্বাত করা ও বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না।

এ ব্যবহার মধ্যে আপনি একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যমুখিতা এবং সুশঙ্খল বিধান কার্যকর দেখতে পাচ্ছেন। আপনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে, এ বাস্তুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের সাথে পৃথিবীর মানুষ, জীবজগত ও উদ্ভিদরাজির জীবনের একটা অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এ ব্যবস্থাপনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পানির এ সরবরাহ প্রাণীকূলকে সৃষ্টি করা ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য ঠিক তার প্রয়োজন অনুসারে একটি নিয়ম বিধান মোতাবেক করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যমুখিতা ও নিয়মতান্ত্রিকতা শুধু এ একটি ব্যাপারে নয়, বরং সমগ্র বিশ্ব-জাহানের গোটা ব্যবহাপনায়ই তা দেখা যায় এবং মানুষের সমস্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও অগ্রগতি এর ওপরই নির্ভরশীল। আপনি একেকটি জিনিস সম্পর্কে জেনে নেন যে, তা কি কাজে লাগে এবং কোনু নিয়ম অনুসারে কাজ করে। তারপর যে জিনিসগুলো সম্পর্কে আপনি যতটা জানতে পারেন তা কোনু কাজে লাগে এবং কোনু নিয়ম-বিধি অনুসারে কাজ করে তাকে কাজে লাগানোর ততটাই নতুন নতুন পথা-পদ্ধতি আপনি উদ্ভাবন করতে থাকেন এবং নতুন নতুন আবিষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের তামাদুন ও সভ্যতার অগ্রগতি সাধন করতে থাকেন। এ পৃথিবীর একটি নিস্তিষ্ঠ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে আর এখানকার প্রতিটি জিনিসই একটি অলংঘনীয় নিয়ম-বিধান ও শৃঙ্খলা অনুসারে কাজ করছে এ মর্মে একটি বৰ্জফূর্ত ও স্বাভাবিক ধারণা যদি আপনার মন-মন্তিকে না থাকতো তাহলে আপনার মগজে কোন জিনিস সম্পর্কে এ প্রশ্ন আদৌ জাগতো না যে, তা কি উদ্দেশ্যে কাজ করছে এবং তাকে কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

এখন এ পৃথিবী এবং এর প্রতিটি জিনিস যদি উদ্দেশ্যমূলক হয়ে থাকে, যদি এ পৃথিবী এবং এর প্রতিটি জিনিসের মধ্যে একটি নিয়ম ও শৃঙ্খলা কার্যকর থেকে থাকে আর যদি তা শত শত কোটি বছর ধরে একাদিক্রমে এ উদ্দেশ্য এবং নিয়ম-বিধি ও শৃঙ্খলা অনুসারে চলে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে একজন একগুর্বে ও হঠকারী মানুষই কেবল একথা অবীকার করতে পারে যে, একজন মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা সৃষ্টি করেছেন। সে আল্লাহ সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা নিতান্তই আহমকী যে, এ পৃথিবীকে তিনি বানাতে এবং পরিচালনা করতে পারেন ঠিকই, কিন্তু তা ক্ষেত্র করতে পারেন না এবং ক্ষেত্র করার পর ইচ্ছা করলে তা অন্য কোন আকৃতিতে পুনরায় বানাতেও পারেন না। প্রাচীনকালের অজ্ঞ নাস্তিকদের একটা বড় হাতিয়ার ছিল বস্তুর অবিনশ্র ও অবিনশ্রী হওয়ার ধারণা। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি তাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছে। এখন এটা স্তুনগতভাবে স্বীকৃত সত্য যে, বস্তু শক্তিতে (Energy) রূপান্তরিত হতে পারে এবং শক্তি ও বস্তুতে রূপান্তরিত হতে পারে। তাই একথা সম্পূর্ণরূপে বিবেক-বৃদ্ধিসম্মত যে, চিরঝীব ও চিরহায়ী আল্লাহ তা'আলা এ বস্তুজগতকে যতদিন পর্যন্ত কায়েম রাখবেন ততদিন পর্যন্ত তা কায়েম থাকবে। কিন্তু যখনিই তিনি একে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে চাইবেন শুধু একটি ইঞ্জিনেই তা করতে পারবেন। তাছাড়া এ শক্তিকে আবার অন্য একটি বস্তুর আকৃতিতে সৃষ্টি করার জন্যও তাঁর একটি ইশারাই যথেষ্ট।

এ হলো কিয়ামতের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কথা। কোন তাত্ত্বিক বা যৌক্তিক প্রমাণ দিয়ে এটাকে আর প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। এখন যে প্রশ্নটি থেকে যায় তাহলো, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হওয়া দরকার যাতে মানুষকে তার ভল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি দেয়া যায়। যে ব্যক্তি মানুষের নৈতিক দায় দায়িত্ব বীকার করে এবং

একথাও স্থীকার করে যে, উত্তম কাজের পুরস্কার লাভ এবং অপরাধের শাস্তি তোগ এ নৈতিক দায় দায়িত্বের অনিবার্য দাবী সে ব্যক্তির পক্ষে আখেরাতের অনিবার্যতা মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। পৃথিবীতে এমন কোন সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা নেই যা প্রতিটি অপরাধ ও দুর্ঘর্ষের শাস্তি এবং প্রতিটি ভাল কাজের পুরস্কার দিতে পারে। অপরাধীর জন্য তার বিবেকের দর্শন ও তিরঙ্গার এবং উপকার ও সুরক্ষিকারীর জন্য তার মনের তৃষ্ণি ও হস্তয়ের প্রশাস্তি যথোপযুক্ত শাস্তি বা পুরস্কার, একথা বলা একটি নিরথক দর্শন কপচানো ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রশ্ন হলো, যে ব্যক্তি কোন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করার পর কোন দূর্ঘটনায় নিহত হয়েছে তাকে তিরঙ্গার করার জন্য তার বিবেক এত সময় কোথায় পেল? আর সত্য ও ন্যায়ের জন্য লড়াই করতে গিয়ে অকস্মাত একটি বোমার আঘাতে যার শেটা দেহ ছির ভিন্ন হয়ে গেল সে যে একটি মহত্তম উদ্দেশ্যের জন্য নিজের জীবন কুরবানী করলো তার বিবেক এ তৃষ্ণি ও প্রশাস্তিলাভের সুযোগ পেল কখন? আসল কথা হলো, আখেরাত বিশ্বসকে এড়িয়ে চলার জন্য যত বাহানা ও ছল চাতুরীর আশ্রয় নেয়া হয় তা সবই অথইন। মানুষের বিবেক-বৃক্ষি ও স্বত্বাব-প্রকৃতি ইনসাফ কামনা করে। কিন্তু দুনিয়ার এ জীবনে ইনসাফ পাওয়া তাও আবার যথাযথ এবং পূর্ণাঙ্গভাবে কখনো সম্ভব নয়। এরপ ইনসাফ হলে তা আখেরাতেই হওয়া সম্ভব এবং সমস্ত জ্ঞানের আধার ও সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত আঞ্চলিক আ'আলার নির্দেশ ও ব্যবস্থাপনায়ই সম্ভব। আখেরাতের প্রয়োজনকে অস্থীকার করা প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও ইনসাফের প্রয়োজনকে অস্থীকার করারই নামাত্তর।

জ্ঞান ও যুক্তি-বৃক্ষি মানুষকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে যে, আখেরাত সম্ভব এবং তা হওয়া উচিত। কিন্তু তা অবশ্যই সংঘটিত হবে এ জ্ঞান কেবল অহীন মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে। আর অহী একথা বলে দিয়েছে যে, “যে বিষয়ের প্রতিপ্রতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।” যৌক্তিক প্রমাণের মাধ্যমে আমরা এ জ্ঞানের নাগাল পেতে পারি না। তবে তা সত্য ও ন্যায়ানুগ হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা এভাবে লাভ করতে পারি যে, অহী আমাদের যে বিষয়ের খবর দিচ্ছে তা হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি বাঞ্ছনীয়ও বটে।